অন্নপূর্ণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐহিক ঐশ্বর্য্য।

পাঁচ বৎসর অতীত হইল, অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, উমাশঙ্কর সস্ত্রীক আসিয়া সোণাপুরে স্বকীয় পিতৃ-ভবনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুবিচক্ষণ হরকুমার বাবু তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং বিষয়-কর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ উমাশঙ্করের বৈষয়িক ব্যাপারের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, অচিরে কাশীতে

ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। হরকুমার বাবুর সহিত সম্পর্ক-শূন্য হওয়ার পর হইতে, শ্যামলাল, বিধুমুখী ও হরিচরণ বিষয়-ব্যাপারের এতই বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিলেন যে, হরকুমার বাবুকে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া, সুদীর্ঘ কালে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইল। হরকুমার বাবুর ন্যায় সুদক্ষ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে সংলিপ্ত না থাকিলে, উমাশঙ্করের বিষয়-সম্পত্তির উদ্ধার-সাধন হইত কি না সন্দেহ। প্রায় সমস্ত মোকদ্দমাতেই উমাশঙ্কর জয়ী হইয়াছেন, সমস্ত সম্পত্তি সর্ব্বপ্রকার দায় হইতে মুক্ত হইয়াছে, বিস্তর নূতন সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে, তহবিলে বিস্তর নগদ টাকা মজুত হইয়াছে, ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ দ্রব্য-সামগ্রী বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র শোভা ও সমৃদ্ধির চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। শীঘ্র কাশীধামে প্রস্থান করিবেন সংকল্প থাকিলেও, পরিগৃহীত কর্ত্তব্যের বাঞ্ছনীয়রূপ সুসমাপ্তি না হওয়ায়, হরকুমার বাবু অদ্যাপি যাইতে পারেন নাই।

উমাশঙ্করের বিপুল ভূ-সম্পত্তি বঙ্গের বহু জেলায় বিস্তৃত। তাঁহার জমিদারীর প্রায় সকল গ্রামে ও নগরে বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে;

তত্ত্বাবতের ব্যয়-ভার তাঁহার কোষ নিয়মিতরূপে বহন করিতেছে। বহু স্থানেই সুবিস্তৃত জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, তথায় তদনুরূপ হিতানুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাসগ্রাম সোণাপুরে একটী কলেজ, সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়নার্থে একটী চতুষ্পাঠী, বাঙ্গালা বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, একটী সুবিস্তৃত চিকিৎসালয় প্রভৃতি বহুবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। সকল স্থানের সকল অনুষ্ঠানই সুদক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

বিগত নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা উমাশঙ্করকে রাজাবাহাদুর এবং হরকুমারকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আজন্ম সন্ন্যাসী বেশ-ধর, ভিক্ষোপজীবী, বিভূতি-বিলেপিত-কলেবর, চর্ম্মাসনাসীন উমাশঙ্কর, অধুনা সর্ব্ববিধ ভোগৈশ্বর্য্য পরিবৃত হইয়া, চিরাভ্যস্ত জীবন-প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পরিস্থাপিত হইয়াছেন। যে যে পদার্থ লোকে ঐহিক সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করে, তৎসমস্তই তাঁহার প্রচুর পরিমাণে কর-তল-গত হইয়াছে। সে পর্ণ-কুটীর নাই, সে ভিক্ষাবৃত্তি নাই, স্বয়ং কোন গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদনের প্রয়োজন নাই, সে মিতাহার নাই,

সে উপবাস ও আয়াস নাই। অগণ্য প্রকোষ্ঠ-মালা পরিবৃত সুরম্য হর্ম্ম্যে তাঁহার বাস, প্রয়োজনাধিক দাস-দাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত, দেব-ভোগ্য বিবিধ সুখাদ্য তাঁহার রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রস্তুত, নানাবিধ যান-বাহন তাঁহার ব্যবহারার্থ উপস্থিত, স্বর্ণ ও মণি-মুক্তা এবং নানাবিধ বহুমূল্য বসন তাঁহার দৈহিক শোভা-সম্পাদনে বিনিযুক্ত। সর্ব্বোপরি সুখ—তাঁহার অন্তঃপুরে স্বর্গবালার ন্যায় রূপসী ও একান্ত পতি-পরায়ণা পত্নী অন্নপূর্ণা। কেবল তাহাই নহে; দুই বৎসর অতীত হইল সেই দেবী এক সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত সুকুমার-কলেবর পুত্র প্রসব করিয়া উমাশঙ্করের সর্ব্ব-সুখময় সংসারকে পূর্ণানন্দের নিকেতন করিয়া দিয়াছেন। রাজা উমা-শঙ্কর বাহাদুর সর্ব্বপ্রকার লৌকিক সুখের অধিকারী হইয়াছেন।

উমাশঙ্কর পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, পুরাণ ও কাব্যাদি তিনি প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজি ভাষায় তাঁহার কোনই অধিকার ছিল না। জীবনের গতি বিভিন্ন পন্থা পরিগ্রহ করিলে, তিনি বুঝিলেন, বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞতা মনুষ্য

মাত্রেরই একান্ত আবশ্যক। পাঁচ বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজির আলোচনা করিয়া, তিনি তদ্বিষয়ে যথেষ্ঠ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। সাহিত্য ও ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র-ঘটিত বহুবিধ ইংরাজি গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিলেন। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার সুন্দর ব্যুৎপত্তি জন্মিল এবং সেই ভাষায় নির্দ্দোষ প্রবন্ধ রচনায় ও কথোপকথনে তাঁহার সক্ষমতা হইল। ইংরাজি ভাষার প্রভূত আলোচনায় তাঁহার জ্ঞানের প্রসার বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল এবং তজ্জন্য তিনি সাতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম ও সদাচার সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে যে বদ্ধ-মূল সংস্কার ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, প্রভূত ইংরাজির আলোচনাতেও তাহার তিলমাত্র বিচলিত বা স্থানভ্রষ্ট হইল না। আর্য্যধর্ম্মের প্রণালী এবং তল্লব্ধ শিক্ষা ও উপদেশ তাঁহার বিবেচনায় অতুলনীয় বলিয়াই স্থায়ীরূপে অবধারিত রহিল।

অধুনা রাজা উমাশঙ্করের বয়স পঞ্চবিংশ বর্ষ; সুতরাং তিনি এক্ষণে পূর্ণ যৌবনে অধিষ্ঠিত। তাঁহার দেহ সুপরিণত ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; বর্ণ সুগৌর ও জ্যোতির্ম্ময়; লোচন-যুগল সমুজ্জ্বল ও প্রতিভা-প্রদীপ্ত; মস্তকের ঘনকৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যস্থলে যথাস্থানে সুদীর্ঘ ও

স্থূল শিখা; বদন শ্মশ্রু-বিরহিত; ওষ্ঠোপরি ভ্রমর-কৃষ্ণ শোভাময় গুল্‌ফ।

বৈশাখ মাসে একদিন সন্ধ্যার পর, স্বকীয় প্রাসাদ মধ্যস্থ পুস্তকাগারে বসিয়া, রাজা মনোযোগ সহকারে Haggard প্রণীত "She" নামক উপন্যাস পাঠ করিতেছেন। নিকটে কোন লোক নাই; কিন্তু বাহিরের বারান্দায়, তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষায়, দুই জন সেবক অপেক্ষা করিতেছে। মকমল মণ্ডিত মনোহর চেয়ারে রাজা সমাসীন; তাঁহার সম্মুখে মারবেল প্রস্তর নির্ম্মিত একখানি সুন্দর টেবিল। গৃহের চতুর্দ্দিকে অনেক সুরম্য আলমারি; সকলগুলিই রাশি রাশি শোভাময় পুস্তকে পরিপূর্ণ। টেবিলের চারিদিকে চেয়ার সংস্থাপিত এবং তাহার উপরিস্থিত এক রমণীয় স্ফটিকাধার হইতে অত্যুজ্জ্বল আলোক নিঃসৃত হইতেছে। রাজার পরিধান জরির পাইড়যুক্ত এক সূক্ষ্ম ঢাকাই ধুতি, পায়ে বার্ণিস করা বিলাতী চটী, গায়ে জামা না থাকায়, বিশাল ও ও গৌর বক্ষের উপর শুভ্র যজ্ঞ-সূত্র বড়ই শোভাময় দেখাইতেছে। তাঁহার মাথার উপর একখানি সুদৃশ্য পাখা ধীরে ধীরে দুলিতেছে! রাজা অধ্যয়নে একান্ত নিবিষ্ট-চিত্ত।

এক পূর্ণবয়স্ক, পূর্ণায়ত-কলেবর পুরুষ সেই প্রকোষ্টে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মস্তকের কেশ, বহুদিন কৃষ্ণকায় থাকিয়া, সম্প্রতি লজ্জায় শ্বেত বর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাঁহার ললাট-প্রদেশ অনিচ্ছায় কালের অঙ্ক বুক পাতিয়া বহন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বয়সের আধিক্য হইলেও, আগন্তুক যুবার ন্যায় কর্ম্মঠ ও ক্ষিপ্রকারী এবং তাঁহার গতি-বিধি ও অঙ্গ-সঞ্চালনাদি যুবজনোচিত। ইনি রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। রায় বাহাদুরের পরিধান একখানি সামান্য থানের কাপড়, কাঁধে একখানি গামছা, পায়ে এক জোড়া ঠনঠনের চটী এবং বক্ষের উপর দিয়া সুস্থূল উপবীত বিলম্বিত।

রায় বাহাদুর গৃহাগত হইয়া বলিলেন,—"বাবাজি, একটা দরকারী কথার জন্য তোমাকে অসময়ে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র, রাজা সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন,—"নিশ্চয়ই আমি অজ্ঞানতঃ আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি; নচেৎ যে ব্যক্তি আজ্ঞার পাত্র তাহার সহিত আপনি কুণ্ঠিত ভাবে কথা

কহিতেছেন কেন? আপনার আগমনের সময় অসময় নাই—থাকিতেও পারে না। আর যে দিন আপনাকে দেখিয়া, বা আপনার কথা শুনিয়া বিরক্তি জন্মিবে সে দিন অধম উমাশঙ্কর মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া পশুত্ব অবলম্বন করিবে।"

রায় বাহাদুর তত্রত্য একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন এবং একবার মাথার চুলগুলা উভয় হস্তে নাড়িয়া বলিলেন,—"বড় গরম। কে আছ বাহিরে? পাখাটা একটু জোরে টানিতে বলিয়া দেও তো।"

বাহির হইতে উত্তর হইল,—"যে আজ্ঞা।"

তাহার পর রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হরকুমার, বলিলেন,—"বইস বাবাজি; একটু দরকারী কথা আছে; তোমাকে শুনিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর আসন গ্রহণ করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"তোমার তহবিলে এখন নগদ টাকা কত মজুত আছে জান?"

রাজা বলিলেন,—"বোধ হয় পাঁচ লক্ষ।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"পাঁচ লক্ষ ছিল বটে; কিন্তু আজি ছয় লক্ষ হইয়াছে। কোম্পানির কাগজে তোমার কত টাকা আছে জান?"

রাজা বলিলেন,—"চারি লক্ষ।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"সাড়ে চারি লক্ষ হইয়াছে। তোমার জমিদারীর আয় কত টাকা জান?"

রাজা উত্তর দিলেন,—"সাত লক্ষ টাকা।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"ঐরূপই হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"কিন্তু আপনি এখন এ সকল কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আমি কালি হইতে আর কোন বিষয়-কর্ম্ম দেখিব না স্থির করিয়াছি। অতঃপর তোমার কার্য্য তোমাকে স্বয়ং করিতে হইবে।"

রাজা একটু উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন;—"কেন এরূপ কঠোর কথা বলিতেছেন?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ পুরুষ। তোমার কার্য্য যখন তোমাকেই করিতে হইবে, তখন আর অনর্থক সময় নষ্ট না করাই শ্রেয়ঃ। বিষয়-কার্য্যে বড়ই গোলযোগ ঘটিয়াছিল এবং তুমিও এ সকল কার্য্য জানিতে না; এজন্যই আমি এতদিন তোমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। অতঃপর তোমার কার্য্য তুমি কর, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা

কহিতে, বা আপনার সহিত কোনরূপ বাদানুবাদ করিতে আমার সাধ্য নাই। যাহা আপনার ইচ্ছা তাহাই পালন করিতে আমি বাধ্য।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“বেশ কথা। আমি তোমার কার্য্য সম্পাদন না করিলেও, এ স্থান এখনই ত্যাগ করিব না, আবশ্যক হইলে তুমি আমার পরামর্শ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইবে।”

রাজা বলিলেন,—“তাহার পর আপনি কি করিবেন মনে করিয়াছেন?”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“যখন বুঝিব তুমি কাহারও উপদেশ না লইয়াও, বিষয়-ব্যাপার সুনির্ব্বাহিত করিতেছ, তখন আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া কাশী যাইব।”

উমাশঙ্কর কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“আপনি যে বিষয়ে যাহা ব্যবস্থা করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন, আপনার সহায়তা-শূন্য হইয়াও, আমি সাংসারিক ব্যাপার চালাইতে পারিব?”

হরকুমার একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—“তুমি যদি না পার তবে কে পারিবে? এখানে উপস্থিত থাকিলেও, তোমার কার্য্য ও ব্যবহারাদির কোন বিষয়ে

আমি কোনই পরামর্শ বা উপদেশ প্রদান করিব না। তুমি যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং যে প্রণালীতে তোমার জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার কার্য্য ও ব্যবহার আমাদের দর্শন এবং আলোচনা করিবার বিষয় হইবে। যে বিষয়ে তোমার অনভিজ্ঞতা ছিল, সে সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত তোমার সহায়তা করিয়াছি। এক্ষণে বিষয়-কর্ম্মে তুমি সম্পূর্ণরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং নির্লিপ্তভাবে দূরে দাঁড়াইয়া তোমার কার্য্য সন্দর্শন করা ব্যতীত অতঃপর আমার আর কর্ত্তব্য নাই।”

রাজা বলিলেন,—“এ সংসার কর্ম্মক্ষেত্র এবং মানবের পরীক্ষাস্থল। কর্ম্ম-সাধন করিয়া পরীক্ষা প্রদান করিতে আমরা বাধ্য। পরীক্ষার ফল কিরূপ হইবে তাহার আলোচনা এক্ষণে নিস্প্রয়োজন। আপনার আজ্ঞাই অমার নিয়ামক।”

তদনন্তর অন্যান্য নানা বিষয়ক কথা-বার্ত্তার পর রায় বাহাদুর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা বহুক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া একাকী নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুর।

মধ্যাহ্ন কালে, রাজা উমাশঙ্করের অন্তঃপুর মধ্যে, একটী সুবিস্তৃত কক্ষে, দুই অতুলনীয়া সুন্দরী মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত এক আসনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। গৃহে কোনই শোভন পদার্থ নাই! প্রশস্ত প্রকোষ্ঠের সীমাস্থলে স্থানে স্থানে শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত আসন নিপতিত রহিয়াছে এবং এক খানি প্রশস্ত আসনের উপর কয়েক খানি রজত ও স্বর্ণময় ভোজন ও পান-পাত্র রহিয়াছে; আর এক দিকে পাষাণ আধারে, পানীয় জল সংরক্ষিত হইয়াছে।

গৃহের তলদেশ, উর্দ্ধভাগ ও পার্শ্বসমূহ সর্ব্বাংশে শ্বেত প্রস্তর-সমাচ্ছন্ন।

আমরা উপবিষ্টা নারীদ্বয়কে অতুলনীয়া সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিকই উভয়েই তুলনা-রহিত। উভয়েই প্রায় সমবয়স্কা; এক জনের বয়স প্রায় দ্বাবিংশ বর্ষ এবং অপরের প্রায় অষ্টাদশবর্ষ। উভয়েই পূর্ণ-যৌবনের প্রদীপ্ত জ্যোতিতে শোভাময়ী, উভয়েই লাবণ্য-স্নাতা এবং পরিণতাবয়বা। বয়োধিকা রাজার ভগ্নী—সুহাসিনী; অপরা রাজার পত্নী—অন্নপূর্ণা।

উভয়েই অচির-পূর্ব্ব-স্নাতা; সুতরাং উভয়েরই কেশ-রাশি অবেণী-সংবদ্ধ; সুহাসিনীর পরিধানে একখানি সুন্দর কৌষেয় বসন, হাতে সোণার বালা, কণ্ঠে সোণার হার এবং কর্ণে মনোহর দুল। অন্নপূর্ণার পরিধানে অতি পরিষ্কার দেশী কার্পাস সাটী; হাতে হীরক খচিত বালা এবং তাঁহার মস্তক বেষ্টন করিয়া সমা-নাকার, সুবর্ত্তুল, সুস্থূল দুই গুচ্ছ মুক্তামালা বিজড়িত। দেহের আর কোথায়ও কোন ভূষণ নাই।

এস্থলে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে দুই বর্ষ পূর্ব্বে সুহাসিনীর শ্বশুর সার্ব্বভৌম মহাশয় স্বর্গ লাভ করিয়া-ছেন। সুতরাং তাঁহাদের সংসারে দাস-দাসীর কথা

ছাড়িয়া দিলে, সুহাসিনী ও তাঁহার স্বামী ভিন্ন অন্য কোন আপনার লোক নাই। রাজা ইচ্ছা করিলে নবীনকৃষ্ণকে রাজসভার পণ্ডিত অথবা চতুষ্পাঠীর অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেও করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই; কেন না তাঁহার বিশ্বাস, ভগ্নীপতি অতীব সম্মানের পাত্র; নিয়মিত বেতনে কর্ম্ম-বিশেষে নিযুক্ত করিয়া, অশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেও, একটা প্রভু-ভৃত্য-ভাব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। এরূপ স্থলে সেরূপ ভাব উভয় পক্ষেরই নিতান্ত অগৌরবের বিষয়। সুতরাং নবীনকৃষ্ণ রাজবাটীর কোন নিয়মিত কর্ম্মচারী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি উমাশঙ্করের একজন প্রধান সহায়, প্রকৃষ্ট মন্ত্রী এবং রাজবাটীর সকল ব্যাপারেই একজন প্রধান অধ্যক্ষ। নবীনকৃষ্ণের সংসারে আর্থিক অস্বচ্ছলতা নাই। স্বর্গীয় সার্ব্বভৌম মহাশয় যথেষ্ট বিত্তশালী পুরুষ ছিলেন; তাঁহার সেই ধন অপচিত হয় নাই; নবীনকৃষ্ণও উপার্জ্জন-ক্ষম ব্যক্তি। অদ্য বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে নবীনকৃষ্ণ গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্থানের পর, সুহাসিনী ভ্রাতৃ-ভবনে আগমন করিয়াছেন। বহু দাস-দাসী ও পাচক-পাচিকা থাকিলেও,

অন্নপূর্ণা প্রতিদিন স্বহস্তে রাজার ভোজ্য পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। অদ্য সুহাসিনী আসিয়া ভ্রাতৃ-জায়ার সেই প্রিয়কার্য্য কাড়িয়া লইয়াছেন এবং স্বয়ং অশেষ যত্নে ভ্রাতার নিমিত্ত বিবিধ খাদ্য পাক করিয়াছেন। ভোজ্য পদার্থ সমূহ পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। রাজার আগমন প্রতীক্ষায় ভ্রাতৃজায়া ও ননন্দা এই ভোজনাগারে অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজার আগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, সুহাসিনী বলিলেন,—"রাণী, দাদার আসিতে বড় দেরী হইতেছে; লোক পাঠাইলে হয় না?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তুমি ভাই রাজার আপনার লোক; তুমি যা ইচ্ছা তাই করিতে পার। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ কি ঠাকুর-ঝি?"

সুহাসিনী বলিলেন,—"জিনিস-পত্রগুলা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। খাওয়ার কষ্ট হইবে। কোন্ সময়ে তিনি খাইয়া থাকেন, তাহার কি ঠিক নাই?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"না—দু' ঘণ্টা কি তিন ঘণ্টা এদিক ওদিক অনেক দিনই হয়। খাওয়ার কষ্ট কেন হইবে? রাজা হইলেও তিনি ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী, তাঁহার মূল অভ্যাস ঘুচিয়া যাইবে কেন? একটু ঠাণ্ডা

হইলেই কি একেবারে অখাদ্য হইয়া যাইবে? অন্য দিন যাহা হউক, আজি তো খাদ্য সামগ্রী পচিয়া-গলিয়া যাইলেও খারাপ হইবে না। আজি হাতের গুণে সকলই অপূর্ব্ব—চমৎকার থাকিবে।”

একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা আসিতেছেন। দাসী চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ অন্নপূর্ণা একখানি কারচোপের কাজে ঢাকা পাখা এবং বারি-পূর্ণ স্বর্ণ-ভৃঙ্গার হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; সুহাসিনী আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্নপূর্ণা, একজন দাসীকে ডাকিয়া, খোকা রাজাকে আনিতে আদেশ করিলেন।

রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধান এক অতি মহার্হ বেনারসী ধুতি এবং বক্ষের উপর যজ্ঞ-সূত্রাকারে তাহারই এক উত্তরীয় বিলম্বিত। চরণে মুক্তামালা-বিজড়িত, চর্ম্মমাত্র-বিবর্জ্জিত মকমলের জুতা। তিনি গৃহাগত হইয়া বলিলেন,—“একি সুহাস, তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ দিদি?”

সুহাসিনী ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—“ভোরবেলা আসিয়াছি দাদা।”

রাজা কহিলেন,—"আমাকে সংবাদ দাও নাই কেন? আমি আসিয়া তোমার সহিত আগেই দেখা করিতাম।"

অন্নপূর্ণা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজার দেহে বাতাস দিতে-ছিলেন। এক্ষণে বলিলেন,—"আগে আসিতে যখন পার নাই, তখন না হয় পরে আরও একটু থাকিয়া, ভগ্নীর সহিত আলাপ করিও।"

অন্নপূর্ণার দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজা একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তিন চারি দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আজি তুমি না আসিলে, নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে যাইতাম।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তাহা হইলে ভাল হইত। কেন না, ঠাকুর-জামাই মহাশয় আজ বাটীতে নাই; বড়ই নির্ব্বিঘ্নে আজি তোমাদের দেখা-শুনা হইত।"

রাজা আবার অন্নপূর্ণার প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"আজি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটী থাকিবেন না শুনিয়াছিলাম। তোমার শরীর ভাল আছে, সুহাসিনি?"

অবনত মস্তকে সুহাসিনী বলিলেন,—"হাঁ।"

একজন দাসী খোকা রাজাকে কোলে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সুহাসিনী, বেগে সেই দিকে ধাবিতা হইয়া, আদরে খোকাকে কোলে লইতে অগ্রসর হইলেন। খোকা তাঁহাকে দর্শনমাত্র "পিটি মা, পিটি মা" বলিতে বলিতে লাফাইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়া পড়িল এবং উভয় বাহুদ্বারা তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। সুহাসিনী বার বার তাহার বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন।

রাজা তত্রত্য আসন বিশেষে উপবেশন করিলেন, অন্নপূর্ণা ত্বরিত একখানি প্রকাণ্ড সোণার থালা আনয়ন করিলেন এবং রাজার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার চরণ সমীপে উপবেশন করিলেন। তাহার পর বস্ত্রাঞ্চলে স্বকীয় গল-দেশ বেষ্টন করিয়া, ভূতলে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর সযত্নে স্বহস্তে রাজার পাদুকা মোচন করিয়া তাঁহার চরণ-যুগল সেই স্বর্ণ-পাত্রের উপর সংস্থাপন করিলেন। তাহার পর সেই ভৃঙ্গার বাম হস্তে নত করিয়া তন্নিস্সৃতজলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা রাজার চরণদ্বয় সাবধানে ধৌত করিতে লাগিলেন। পাদ-প্রক্ষা-লন সমাপ্ত হইলে, অন্নপূর্ণা ভক্তি সহকারে রাজার পদ-দ্বয় আপনার উরুদেশে স্থাপন করিলেন। স্বকীয় পৃষ্ঠদেশ

অতিক্রম করিয়া যে কেশরাশি ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল, তাহার দ্বারা রাজার চরণ ভক্তি সহকারে বারি-মুক্ত করিলেন। তদনন্তর স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পদদ্বয় উত্তম রূপে জল-শূন্য করিয়া তিনি একে একে তাহা পাদুকা মধ্যে বিন্যস্ত করিলেন। তাহার পর সেই পাত্রস্থ চরণ-প্রক্ষালন-বারির কিয়দংশ অঞ্জলি মধ্যে গ্রহণ করিয়া আগ্রহ সহকারে পান করিলেন এবং পীতাবশেষ মস্তকে ও বক্ষে প্রলিপ্ত করিয়া, পুনরায় গললগ্নী-কৃত-বাসে স্বামী দেবতাকে প্রণাম করিলেন।

প্রেমপূর্ণ ঈষৎ হাস্যের সহিত রাজা বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা, তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। তোমার এই নিত্য ক্রিয়ার নূতন নূতন আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিতে আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অশক্ত।"

যে দাসী খোকাকে লইয়া আসিয়াছিল সে দাঁড়াইয়াছিল। অন্নপূর্ণা তাহাকে চরণ-মার্জ্জন-বারি-পূর্ণ পাত্র স্থানান্তরিত করিতে আদেশ করিলে, সে তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। অন্নপূর্ণা তখন ব্যজনী হস্তে লইয়া রাজাকে ব্যজনে নিযুক্তা। তিনি উত্তর করিলেন,—"নূতন আশীর্ব্বাদে আমার আবশ্যক নাই; একই আশীর্ব্বাদ

আমি প্রার্থনা করি। যেন অক্ষয় স্বর্গ-ভোগের লোভে বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাতেও ঐ সর্ব্ব-সিদ্ধি-ফল-প্রদ চরণ হইতে আমার চিত্ত একটুও বিচ্যুত না হয়, ইহাই আমার একমাত্র কামনা।"

রাজা বলিলেন,—"ভগবান্ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

সুহাসিনীর তখন চক্ষুতে জল। তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন,—"আহারের স্থান করিব কি দাদা?"

রাজা বলিলেন,—"করিতে পার।"

খোকা রাজা বলিয়া উঠিল,—"বাবা যাব।"

সুহাসিনী তাহাকে রাজার অঙ্কে দিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজা স্নেহ-কণ্টকিত-কলেবরে সেই ভুবন-মোহন শিশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং অশেষ আদরে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। খোকা কিয়ৎকাল পিতার অঙ্কে ক্রীড়া করিয়া বলিল,—"মা যাব।"

রাজা বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা, পাখা আমাকে দেও, খোকাকে লও।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তোমার কষ্ট হইবে।"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"সময়ে সময়ে তোমার বড় ভুল হয়। আমার ভয় হয়, যাহার এত ভোলামন

সে হয় তো কোন দিন আমাকেই বা ভুলিয়া যাইবে। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, আমি ভিক্ষুক-সন্ন্যাসী এবং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশে অভ্যস্ত। আমার এ রাজাগিরি কেবল জাগ্রত স্বপ্ন মাত্র।”

অন্নপূর্ণা, রাজার হাতে পাখা দিয়া, সাদরে খোকাকে কোলে লইলেন।

এদিকে সুহাসিনী স্বহস্তে স্থান মার্জ্জনা করিয়া অতি শোভাময় আসন বিস্তৃত করিলেন এবং তৎসম্মুখে বিবিধ অত্যুপাদেয় ভোজ্য-পানীয়-পূর্ণ অনেক প্রকার স্বর্ণ ও স্ফাটিক পাত্র স্থাপন করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কোমল স্বরে বলিলেন,—“দাদা, উঠিয়া আইস।”

রাজা আসনে উপবেশন করিলে, সুহাসিনী, তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যজনী লইয়া, তাঁহাকে বাতাস দিতে লাগিলেন। রাজা যথারীতি শ্রীবিষ্ণু দেবতাকে ভক্ষ্য পদার্থ সমূহ নিবেদন করিয়া দিয়া, যথারীতি গণ্ডূষাদির পর, আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। খোকাও জোর করিয়া মাতৃ-অঙ্ক হইতে অবতরণ করিল এবং পিতার নিকটস্থ হইয়া, তাঁহার অঙ্কে বসিল। অনাহূত হইলেও, সেই সুপরিণত-কলেবর শিশু পিতার ভোজ্যের কিয়দংশ

স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া নিজ বদনে প্রদান করিল। পুত্রের এই ব্যবহার দেখিয়া রাণী বলিলেন,—“উহাকে ছাড়িয়া দেও, আমি স্বতন্ত্র পাত্রে খাবার আনিয়া উহাকে খাওয়াইয়া দিতেছি। এখনই সব নষ্ট করিয়া দিবে।”

রাজা বলিলেন,—“না, আমার সঙ্গেই খোকা নিত্য খায় ; আজিও খাইবে।”

পিতা-পুত্রে পরমানন্দে অতি উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—“আজিকার সকল দ্রব্যই বড় সুমিষ্ট লাগিতেছে।”

রাণী বলিলেন,—“অন্য দিন যাহা খাও, সে সকল কি তিক্ত লাগে ?”

রাজা বলিলেন,—“অন্য দিনও খুব ভাল হয় ; আজি যেন আরও ভাল লাগিতেছে।”

রাণী বলিলেন,—“লাগিবার কথা বটে, অন্য দিনের অপেক্ষা আজি আরও খুব ভাল হাতের গুণে সকলই আরও খুব অতিশয় ভাল হইয়াছে। আজিকার সমস্ত দ্রব্যই তোমার ঐ সুন্দরী-শিরোমণি ভগ্নী স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন,—“বটে! কেন সুহাস তুমি এ বাটীতে আসিয়া এত পরিশ্রম কর ?”

সুহাসিনী বলিলেন,—"ভাইয়ের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা কি ভগ্নীর পক্ষে পরিশ্রমের কাজ দাদা? তোমার মত দেবতা দাদার খাদ্য প্রস্তুত করা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। পরিশ্রম তো আমি নিত্যই করি; বিশেষ পাক করা তো নারীজাতির প্রধান কাজ। আর আদরের বউ যদি রোজ এ কাজ করিতে পারেন, আমি একদিন কেন তাহা না পারিব?"

রাজা বলিলেন,—"বড়ই উত্তম খাদ্য তুমি আজি প্রস্তুত করিয়াছ। অনেক প্রকার নূতন জিনিষ খাইয়া আমি আজি বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি।"

খোকা বলিয়া উঠিল,—"পিটি মা যাব—হাম।"

তৎক্ষণাৎ সুহাসিনী, ব্যজনী রাণীর হস্তে প্রদান করিয়া, সাদরে খোকা-রাজাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং বলিলেন,—"আর খায় না দুষ্ট ছেলে; অনেক খাইলে অসুখ হইবে।"

কিন্তু খোকা সে উপদেশ শুনিল না। সে দুষ্ট অপবাদ বহন করিয়াও, আহার-ত্যাগে স্বীকৃত হইল না। বলিতে লাগিল,—"ঐ কাব—ঐ হাম—পিটি মা কাব।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"দাদা, ঐ থালি বাটীটায় একটু পায়স দেও, আমি খোকাকে খাওয়াইয়া দিই।"

রাজা তাহাই করিলেন। খোকা পিসিমার হস্তে সানন্দে পায়স খাইতে লাগিল।

ভোজন সমাপ্ত হইলে রাজা গৃহের এক সীমান্তস্থিত পয়ঃপ্রণালীর সন্নিধানে গমন করিলেন। অন্নপূর্ণা তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি ময়দা ও বেশম দ্বারা উত্তমরূপে হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুভ্র শুষ্ক বসনে বদন-মার্জ্জন করিলেন। অন্নপূর্ণা, ব্যস্ততাসহ হস্ত ধৌত করিয়া, তাম্বুলপাত্র হস্তে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিলেন,—"সুহাস, আজি বোধ হয় তোমার বাটী না যাইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আজ আর গিয়া কাজ নাই।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"আজি যাইব না। খোকাকে লইয়া আমি এ বাটীতেই আজি থাকিব।"

তাহার পর রাণীকে লক্ষ্য করিয়া রাজা বলিলেন,—"যাহাকে রাজাগিরি করিতে হয়, তাহার ভগ্নী বা স্ত্রীর সহিত আলাপ করিবার সময় না থাকাই উচিত। আমি এখন যাই। তোমাদের সহিত আবার ওবেলা সাক্ষাৎ হইবে।"

রাজা প্রস্থান করিলেন।
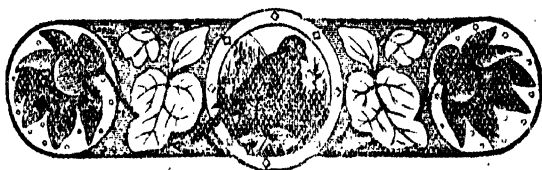
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমবেদনা।

বেলা প্রায় তিনটা। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে রাজার নামের যাবতীয় পত্রাদি ডাকঘর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পত্রগুলি পাঠ করিয়া, যাহার সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ বা উপদেশ দেওয়া বিধেয় তাহা প্রদান করিয়া, এবং সেগুলি যথাযথ ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিয়া, রাজা এক্ষণে সংবাদ পত্র পাঠে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট কয়েকখানি সংবাদ পত্র ও একটী দোয়াত-কলম মাত্র পতিত রহিয়াছে।

যে কক্ষে রাজা এক্ষণে উপবেশন করিয়া আছেন, তাহা অন্তঃপুর সংলগ্ন। ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক

হইলে অন্তঃপুরিকারা তথায় আসিতে পারেন। ঘর কার্পেট দ্বারা আচ্ছাদিত। এক প্রান্তে একটী মকমলের গদী। তাহার উপর একখানি অতি সূক্ষ্ম মছলন্দ বিস্তৃত। তাহার উপর কয়েকটি মকমলের বালিস। রাজা সেই শয্যায় উপবিষ্ট।

সেই বর্ষে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল এবং রাজপুরুষেরা ও অন্যান্য মহাত্মারা তাহার নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টাশীল হইয়াছিলেন। কলিকাতার দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডার সংস্থাপনার্থ এক সভা হইয়াছিল এবং এক জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সেই সভার সম্পাদক হইয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে, কলিকাতায় টাউন হলে, সেই সভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বঙ্গদেশের এক প্রভূত ধনশালী মহারাজা বাহাদুর সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুরকে সেই সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সম্পাদক মহাশয় যথাসময়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা এরূপ সভায় উপস্থিত থাকিয়া অনর্থক বক্তৃতা-স্রোত প্রবর্দ্ধিত করিতে বাসনা করেন না বলিয়া, সভায় যোগ দেন নাই। এ সম্বন্ধে যে কোন অনুষ্ঠান তাঁহার

বিবেচনায় সুসঙ্গত ও সাধ্যায়ত্ত হইবে, তাহাই তিনি বিনানুরোধে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে সম্পাদন করিবেন। রাজা এই মর্ম্মে সেই উচ্চপদাভিষিক্ত রাজ-কর্ম্মচারী মহোদয়ের নিমন্ত্রণ-লিপির উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্য যে সকল ইংরাজী দৈনিক সংবাদ পত্র আসিয়াছে, তাহাতে সেই সভার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজা এক্ষণে আগ্রহ সহকারে সেই বিবরণ পাঠ করিতেছেন। সময়ে সময়ে কোন কোন উক্তি ও বর্ণনা পাঠ করিয়া তিনি চিন্তাকুল হইতেছেন; তখন তাঁহার ললাটে চিন্তার রেখা স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইতেছে; আবার কখন কখন অন্তঃসারশূন্য গৌরব-লোলুপ মহাত্মা বিশেষের উক্তি পাঠে তিনি হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না।

নিঃশব্দে সেই প্রকোষ্ঠের অপর এক দ্বার দিয়া এক ভুবন-মোহিনী যুবতী তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের যথাযথ স্থানে মণি-মুক্তা-খচিত নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার শোভা পাইতেছে। স্বর্ণসূত্র খচিত সূক্ষ্মবস্ত্র তাঁহার দেহ আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নিঃশব্দে সেই সুন্দরী পশ্চাদ্দিক হইতে উভয় হস্তে রাজার নেত্রদ্বয় আবরণ করিয়া ধরিলেন।

রাজা বলিলেন,—"রাণী, ছাড়িয়া দেও ; মন যাহাকে নিয়ত দর্শন করে, বাহ্ চক্ষুকে সে সুখ ভোগের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছ কেন ?"

সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ঠিক করিয়া না বলিতে পারিলে আমি চক্ষু ছাড়িয়া দিব না।"

রাজা বলিলেন,—"যাঁহার অঙ্গের বায়ু গায়ে লাগিলে প্রাণ নাচিয়া উঠে, তাঁহার অঙ্গ দেহের সহিত সম্মিলিত হইলেও চিনিতে পারিব না, ইহাও কি সম্ভব ? তুমি যে রাণী তাহার আর সন্দেহ কি ?"

সুন্দরী বলিলেন,—"এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারিলে না ! ছিঃ !"

রাজা বলিলেন,—"ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না ? বল কি ? আমি কি তবে পাগল হইয়াছি ?"

সুন্দরী রাজার চক্ষু হইতে হস্ত অপসারিত করিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় পাগলই হইয়াছ, নহিলে রাজার দাসীকে তুমি রাণী বলিতেছ কেন ?"

উমাশঙ্কর প্রেম-পূর্ণ নয়নে সেই সুন্দরীর বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—"বাস্তবিকই অন্নপূর্ণা, প্রেমে মানুষকে কতকটা পাগলই করে বটে। এইরূপ মত্ততা ঘটে বলিয়াই যিনি সর্ব্বেশ্বরী তিনিও কখন কখন আপ-

নাকে দাসী বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেবি, এ ক্ষেত্রে কে কাহার দাস তাহা সহজে নির্ণয় করা ভার! এ অধম আপনাকে এই দেবীর ক্রীতদাস ভাবিয়াই পরম সুখ সম্ভোগ করে।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“এটা বড়ই দয়ার কথা—নিতান্তই আদরের বাক্য। বস্তুতঃ আমিই লোকতঃ ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ ঐ চরণের চিরদাসী। তুমি সোহাগ করিয়া যাহা বল না কেন, আমার দাসত্ব আমার ভাগ্য লব্ধ পরম ধন।”

রাজা বলিলেন,—“লোকতঃ তুমি দাসী স্বীকার করিলেও, দাসত্বে আমাদেরই চিরন্তন অধিকার। পরমেশ্বর জগতের স্রষ্টা, পাতা, রক্ষক ইত্যাদি বহু বিশেষণে পরিচিত হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তির সহায়তা ভিন্ন তাঁহার কোন কার্য্যই হয় না এবং তখন তিনি নির্গুণ ভাবে বিদ্যমান থাকেন মাত্র। সুতরাং বলিতে গেলে তাঁহাকে শক্তির অধীন বলিয়াই নির্দ্দেশ করাই সুসঙ্গত। যে দেবতা সগুণ ভাবে বিষ্ণুরূপে পরিচিত, সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী এবং সকল বিদ্যার উৎস-স্বরূপা সরস্বতী দেবী তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য। যে পরম যোগী

জরা-মরণাতীত মহেশ্বর নামে কীর্ত্তিত, তাঁহার নর্ত্তনশীলা নায়িকা তাঁহার বক্ষ-প্রদেশে বিরাজমানা; অথবা ভ্রমরীরূপে তদীয় শিরোদেশে বিচরণ-শীলা। যে পূর্ণাদর্শ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রেমের অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার দাসরূপে তিনি আপনাকে পরিচিত করিয়াছেন এবং সেই দেবীর পদ-পঙ্কজ মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। বাস্তবিকই অন্নপূর্ণা, আমরা তোমাদের দাস; এ দাসত্বে আমাদের সনাতন স্বত্ব।"

রাণী অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তোমাদের ভালবাসাই সার্থক; তোমারাই যথার্থ ভাল বাসিতে জান, তাই যাহারা চরণ-ধূলারও যোগ্য নহে, তাহাদিগকে তোমরা আদর করিয়া মাথায় তুলিয়াছ। সে কথা যাউক, তুমি এ সময়ে আজি একলা বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছ কেন? এমন সময় তো তুমি পুস্তকালয়ে বসিয়া কেবল ইংরাজি পুস্তকই পাঠ করিয়া থাক আজি তাহার অন্যথা কেন?"

রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন,—"জান তো তুমি, আমি সন্ন্যাসীর শিষ্য, আশ্রম-পালিত; সুতরাং ইংরাজি শিখিবার কোনই সুযোগ আমার হয় নাই। বিষয়

ব্যপারে প্রবেশ করিয়াই বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান কালে ইংরাজি শিক্ষা, নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্যই প্রতিদিন অনন্য মনে চারি পাঁচ ঘন্টা ইংরাজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি। পাঁচ বৎসর এইরূপ পরিশ্রম করিয়া, ইংরাজি ভাষায় যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে পরম সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছে। আমি ইংরাজিতে কাব্য, প্রবন্ধ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি বহুতর বিষয়ের অনেক গ্রন্থ সাগ্রহে অধ্যয়ন করিয়াছি। অতঃপর ইংরাজি শিক্ষার জন্য বিশেষ পরিশ্রম না করিলেও, কোন কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে না। স্থির করিয়াছি, সেই সময় অন্য কোন হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিব।”

রাণী জিজ্ঞাসিলেন,—“প্রাতের সেই সময়ে অতঃপর কি করিবে, স্থির করিতেছ?”

রাজা বলিলেন,—“আমি মনে করিতেছি, প্রতিদিন সেই সময়ের মধ্যে একবার করিয়া আমাদের স্কুল, টোল, চিকিৎসালয়, অতিথি-শালা, অনাথাশ্রম প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিব। অতীব যোগ্য ব্যক্তিগণের হস্তেই তত্ত্বাবতের ভার অর্পিত আছে; তথাপি অনেক সময়েই আমার মনে হয়, স্বয়ং সে

সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান না করিলে, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সম্পাদন করা হয় না। মনের এই অসন্তোষ আমি অতঃপর নিবৃত্ত করিব।”

রাণী বলিলেন,—“আর আমি প্রতিদিন যে অনাথা, বৃদ্ধা, রুগ্নাদিগকে স্বহস্তে ভোজন করাই, তাহাদের অবস্থাটা একবার করিয়া দেখিবার সময় হইবে না বুঝি ?”

রাজা বলিলেন,—“না ; কেন না তাহা স্বয়ং দেখিবার প্রয়োজন নাই। যাহা তুমি স্বয়ং সম্পাদন কর, সে কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া থাকে, এবং আমার কৃত কার্য্যের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অতএব তাহা দেখিয়া সময় নষ্ট করিব কেন ?”

রাণী বলিলেন,—“বইস তুমি, আমি এখন আসি।”

রাজা বলিলেন,—“এত শীঘ্র কেন ?”

রাণী বলিলেন,—“ভোজনের সময় মধ্যাহ্নে কিয়ৎ-কাল, আর গভীর রাত্রিতে কিয়ৎকাল তোমার চরণ-দর্শনে এ দাসীর অধিকার। যে মহাপুরুষ কৃপা করিয়া দাসীর প্রিয়কার্য্য দেখিতে হইলেও সময় নষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন, অসময়ে আসিয়া তাঁহার

মহামূল্য সময় নষ্ট করিতে দাসীর সাহসে কুলায় কেন ?"

রাজা বলিলেন,—"ঠিক কথা। তোমার ন্যায় গুণবতী মহিলার মুখে এইরূপ গভীর ভাবপূর্ণ পরিহাস বাক্যই শোভা পায় বটে। বাস্তবিকই তুমিও আছ, আমিও আছি; প্রেমও আছে, অনুরাগও আছে; কিন্তু সময় ও কার্য্য তো নিরন্তর সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। যেটী ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সেটী তো আর পাওয়া যায় না। মানব কর্ত্তব্য-সম্পাদনের গুরুভার মস্তকে লইয়া কর্ম্মাধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সে কর্ত্তব্য-পালনে অবহেলা করিলে, কর্ম্ম-সম্পাদনে ঔদাস্য করিলে তাহার আর গতি কি ? এ সংসারে কর্ম্মই একমাত্র আকর্ষণ, কর্ত্তব্য-পালনই একমাত্র আনন্দ। আমরা ভাগ্যক্রমে জীবন-সূত্রকে একই গ্রন্থিতে নিবদ্ধ করিয়া উভয়ে এক হইয়াছি। এখন কর্ম্মই আমাদের উভয়ের একমাত্র প্রিয়ব্রত হইয়াছে। অতএব সময় নষ্ট করিতেছি বুঝিয়া, তুমি আমাকে প্রকারান্তরে তাহা স্মরণ করাইয়া, যথার্থ সহধর্ম্মিণীর কার্য্যই করিয়াছ। কিন্তু তুমি আর একটু অপেক্ষা কর। বিশেষ প্রয়োজন-হেতু আমি তোমাকেই এখন ভাবিতেছিলাম। তাই

সকল দয়া করিয়া এ সময়ে আমাকে দর্শন দিয়াছ। তুমি শুনিয়াছ কি অন্নপূর্ণা, এবার ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত?"

রাণী বলিলেন,—"অনেক কথা শুনিয়াছি। সেদিন কয়েকখানা ছবি দেখিয়া প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"এক্ষণে তাহার প্রতিকারের জন্য তুমি কি করিতে চাহ?"

রাণী বলিলেন,—"যাহা চাহি তাহা হইবার নহে।"

রাজা বলিলেন,—"কি, বল না।"

রাণী বলিলেন,—"প্রত্যহ অন্নহীনের দ্বারে গিয়া অন্ন বিলাইতে চাহি?"

উমাশঙ্কর কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"অন্ন-পূর্ণার অনুরূপ বাসনাই বটে; কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে। তাহা হইলে কি করিবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তুমি কি স্থির করিয়াছ বল।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"না, তুমি আগে বল।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"যে সম্পত্তি ভগবান আমাদের হাতে দিয়াছেন, তাহা ব্যয় করিলে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের অন্নহীন ব্যক্তিগণ ছয় মাস গ্রাসাচ্ছাদন

পাইতে পারে। সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া এই দুঃখী-গণকে রক্ষা করাই আমার বাসনা।"

তখন সাশ্রুনয়নে উমাশঙ্কর সেই সুরসুন্দরীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমপূর্ণ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন,—"আমি ধন্য। এমন দেবী যাহার চিরসঙ্গিনী সে ব্যক্তি ভাগ্যবান্‌গণের অগ্রগণ্য। তাহাই হইবে। তোমার বাসনামত কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাই আমি করিব।"

রাণী বলিলেন,—"আমি এখন যাই। খোকা হয় তো এতক্ষণে ফিরিয়াছে।"

উমাশঙ্কর বাহুমধ্য হইতে অন্নপূর্ণাকে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"খোকা এতক্ষণ কোথায় ছিল?"

অন্নপূর্ণা দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"ঝি ও দ্বারবানের সঙ্গে ঠেলা গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে গিয়াছিল। এতক্ষণে আসিয়া থাকিবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আচ্ছা, এখন আইস। যেরূপ স্থির হয় তাহা তোমাকে পরে জানাইব।"

অন্নপূর্ণা গলায় কাপড় দিয়া উমাশঙ্করের চরণে মস্তক বিন্যস্ত করিলেন এবং উভয় হস্তে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে ও বক্ষে স্থাপন

করিলেন। তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

অন্নপূর্ণা ।

দ্বিতীয় খণ্ড—কঠোর ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সতর্কতা।

হুগলী জেলায় রামনগরে কায়স্থ-কন্যা ভবসুন্দরীর বাটীর পার্শ্বে, একখানি ক্ষুদ্র বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এ বাটী পূর্ব্বে ছিল না; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। একটী একতলা প্রশস্ত কুঠারী, তাহার পার্শ্বে রন্ধনের নিমিত্ত একখানি ক্ষুদ্র ঘর, সম্মুখে একটী বারান্দা, তাহার পর প্রশস্ত অঙ্গন, তন্মধ্যে একটী সুন্দর তুলসী-বেদী, কিয়দ্দূরে একটী কূপ, এবং তাহার পার্শ্বে প্রাচীর বেষ্টিত প্রচ্ছন্ন স্থান, তাহার

পর চারিদিকে করবী, কলিকা, সেফালিকা, স্থলপদ্ম, চম্পক প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের নাতি বৃহৎ বৃক্ষ ধারাবাহিক-রূপে সজ্জিত। তাহার পর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর ও ঘরের ভিতর বাহির সকল স্থানই চুণ-বালির দ্বারা আবৃত। ভবনের সকল অংশই সুপরিষ্কৃত। অঙ্গনের কোথাও একটা শুষ্ক পত্র নাই, কোথাও একটু আবর্জ্জনা নাই, সকল স্থানই পরিচ্ছন্ন। বাটীর মধ্যে প্রবেশের নিমিত্ত দক্ষিণ দিকে একটী প্রশস্ত দ্বার আছে; কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা প্রায় চারিটা, তথাপি উত্তাপের প্রকোপ একটুও কমে নাই। একটী পরমা সুন্দরী নারী এই বাটীর বারান্দায় একটী মাদুরের উপর বসিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার বাম হস্তে একখানি তাল-বৃন্ত এবং দক্ষিণ হস্তে পাঠ্যগ্রন্থ। সেই অলসিত ও অবসিত-কলেবরা ধীরে ধীরে পাখা নাড়িতেছেন এবং মনে মনে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। এই সুন্দরী বিধুমুখী। বিধুমুখীর বয়স এক্ষণে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ হইবে। দেহ পূর্ণায়ত ও প্রদীপ্ত যৌবন-শ্রীতে উদ্ভাসিত। যে বিলাস-সাগরে তিনি নিয়ত ভাসমানা ছিলেন, তাহা এখন শুকাইয়া গিয়াছে; স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ

করিবার উপযোগী সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই এক্ষণে তাঁহার আয়ত্ত নাই। যে ঘৃণিত ভোগ ও লিপ্সাকে তিনি জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া জানিতেন, তাহাতে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। বিলাস ও ভোগ-বিবর্জ্জিতা বিধুমুখীর স্বভাব-সুন্দর রূপ এখন যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। তাঁহার দেহে কোন অলঙ্কার নাই। হাতে বেলওয়ারি চুড়ি, বাম-হস্তে তদ্ব্যতীত একগাছি লোহা, সীমন্তে সিন্দুর-বিন্দু, এবং পরিধান লাল পেড়ে সাটী, সেই সর্ব্ব ভোগৈশ্বর্য্য-সংবৃতা নারীর বর্ত্তমান বেশ-ভূষা সমাধান করিয়াছে।

বিধুমুখী এই বাটীতে একাকিনী থাকেন না। বিন্দুর মা নামে পরিচিতা, অথচ পুত্র-কন্যা-বিহীনা এক প্রৌঢ়া নারী বিধুমুখীর কাজ-কর্ম্ম করে ও সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে। এখন সে বাটীতে নাই; বিধুমুখী কোন প্রয়োজনে তাহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়াছেন। বিন্দুর মা ছাড়া বিধুমুখীর আর একজন প্রধান সহায় ও আত্মীয় আছেন। তিনি হরকুমার বাহাদুরের পরিচিতা, চণ্ডী গুলিখোরের কায়েত মাসী ভবসুন্দরী। ভব সর্ব্বপ্রকারেই বিধুমুখীর হিতৈষিণী। সে তাঁহার সকল কার্য্যে সৎপরামর্শ প্রদান করে, গৃহ-কর্ম্মে সহায়তা করে, যখন যে পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহার

সংকুলান করে, সতত তাঁহার সংবাদ লয় এবং অনেক সময় তাঁহার নিকটে থাকে।

সংসারিক কোন বিষয়েই বিধুমুখীর কোন অভাব নাই। নিয়মিতরূপে ও যথা সময়ে তিনি প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ও দ্রব্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রকার সুখ-বিধায়ক পদার্থ-পরিশূন্য হইয়া, নিতান্ত দীন-ভাবে পর্ণ-কুটীরাশ্রয়ে কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া, জীবনপাত করাই বিধু-মুখীর একান্ত বাসনা। কিন্তু যে সুহৃদ্‌গণ তাঁহার তত্ত্বাব-ধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বর্ত্ত-মান অবস্থান স্থানাদির অপেক্ষা হীনতর ব্যবস্থা করিতে অশক্ত ও অনিচ্ছুক। সুতরাং বিধুমুখীকে এই ভাবে এই স্থানেই থাকিতে হইয়াছে।

বহুক্ষণ রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে বিধুমুখীর মনে হইল, যে জাতির মধ্যে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির দৃষ্টান্ত প্রচারিত আছে, তাহাদের কোন কোন হতভাগিনী নারী পতি-দেবতাকে অবজ্ঞা করিয়া পাপের স্রোতে দেহ ভাসাইতে পারে কিরূপে? যাহারা স্বামীর রূপ, যৌবন, অনুরাগ অন্বেষণ করে, সে নারীরা, কার্য্যতঃ না হইলেও, বস্তুতঃ ব্যভিচারিণী; তাহারা নারী নামের কলঙ্ক। আর যে নারী পতির প্রতি বিমুখ হইয়া

পাপে মজিয়া নরকের আমোদ ভোগ করিতে মত্ত হয়, তাহার তো কোথাও ক্ষমা নাই ; সে যাতনার ভীষণ অনলে চিরদিন—অনন্তকাল পুড়িতে থাকিবে। তাহাই তাহার পক্ষে সমুচিত ব্যবস্থা। মনুষ্য বড়ই দয়াবান্, বড়ই সহৃদয়। মনুষ্য তাহাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারে ; ভগবান্ করুণাসিন্ধু ; তিনিও তাহাকে ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন ; কিন্তু সে আপনাকে আপনি কখনই ক্ষমা করিতে পারে না। তাহার শাস্তি সে স্বয়ং প্রদান করে ও ভোগ করে।

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, একদিন—বহুকাল অতীত হইল একদিন, আমার পরম দেবতা, আমার এই তুচ্ছ রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন ; এই পাপ-পঙ্কিল কলেবর আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার চরণ স্থাপনের অযোগ্য এই শরীরে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অধিকার থাকিলেও, এ পাপীয়সী তাঁহার বাসনা বিনিবৃত্তির প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই ; তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া দূর করিবার কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। তথাপি তাহার এ মুখ এখনও খসিয়া যায় নাই। তাহার এ ঘৃণিত রূপ এখনও অপগত হয় নাই ; ভীষণ

কুষ্ঠরোগে তাহার দেহ এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই। এখনও সে সুস্থ শরীরে রূপের বোঝা মাথায় করিয়া বসিয়া আছে। বোধ হয় এ সংসারে বিচার নাই; বোধ হয় বিধাতার ন্যায়-দণ্ড যথাস্থানে উপস্থিত হইতে কখন কখন ভুলিয়া যায়।

সহসা বাহিরের দ্বারে শিকল নাড়ার শব্দ হইল। বিধুমুখী পুস্তক রাখিয়া দ্বার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে?"

দ্বারের অপর দিক হইতে উত্তর হইল,—"আমি বিস্তুর মা।"

বিধুমুখী দ্বার খুলিয়া দিলেন। বিস্তুর মা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিধুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু সন্ধান পাইয়াছ কি?"

বিস্তুর মা বলিল,—"বিশেষ কিছু নয়; ঘরে চল বলিতেছি।"

বিস্তুর মা বাল্‌তি হইতে ঘটি করিয়া জল তুলিয়া হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিল। বিধুমুখী তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর বিস্তুর মা অগ্রসর হইয়া বারান্দায় উঠিল। বিধুমুখী তাহার পশ্চাতে গমন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কি সন্ধান পাইলে, বিস্তুর মা?"

বিন্দুর মা বলিল,—"আর সংবাদের জন্য আমাদের ভাবনা চিন্তার দরকার নাই। সকল সংবাদের যিনি মূল তোমার সেই বাবা আসিয়াছেন। তিনি ভব দিদির চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া রহিয়াছেন। এখনই এখানে আসিবেন।"

রায় হরকুমার বাহাদুর বিধুমুখীর পিতা নাম পাইয়াছেন। বিধুমুখী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বাবা আসিয়াছেন! কতক্ষণ আসিয়াছেন? কেন আসিয়াছেন? কেমন আছেন দেখিলে?"

বিন্দুর মা সম্পর্কে বিধুমুখীর কন্যা; সুতরাং মাতার পিতা তাহার তামাসার জিনিষ। সে সেই জন্য বলিল,—"তা আছেন তো মন্দ নয়: পাকা গোঁফ সমানই পাকা, কথায় সমান রস, আমাকে কত তামাসাই করিলেন। শুনিলাম, তোমাদের দেখিবার জন্য তোমার সুবিধা-অসুবিধার কথা নিজে জানিয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছেন। এক ঘণ্টা হইল আসিয়াছেন।"

বিধুমুখী মনে মনে ভাবিলেন, বাবা আসিয়াছেন, কর্ম্ম-কাজ ক্ষতি করিয়া কত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করিয়া, আমার খবর লইতে নিজে আসিয়াছেন! যাহাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করা উচিত, যাহার নাম

শুনিলে রাগ হওয়া উচিত, যাহার ছায়াও স্পর্শ করা উচিত নহে, তাহার প্রতি এরূপ দয়া! বড়ই লজ্জার কথা! এ পোড়ামুখ তাঁহাকে আবার দেখাইব কিরূপে?

আবার সেই প্রবেশ-দ্বারে শিকল নাড়ার শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বামা কণ্ঠে-শব্দ হইল,—"দিদি! দিদি।"

কণ্ঠস্বর ভবসুন্দরীর। বিধুমুখী বেগে দ্বার খুলিয়া দিতে ধাবিত হইলেন। দ্বার খুলিবামাত্র প্রথমে ভবসুন্দরীর, পশ্চাতে হরকুমার বাহাদুরের মূর্ত্তি বিধুমুখীর চক্ষুতে পড়িল। বিধুমুখী মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া সঙ্কোচ সহকারে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে ভব পরে হরকুমার বাহাদুর, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিধুমুখী ভক্তি সহকারে হরকুমারকে প্রণাম করিলেন। হরকুমার বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।"

রায় বাহাদুরের মাথায় এক বিলাতী উড়ানী জড়ান; এক থেলো লাংক্লথের লম্বা জামা গায়ে, পরিধান এক থানের কাপড়, পায়ে দেড়টাকা দামের এক জুতা, হাতে বিলক্ষণ স্থূল এক পিচের লাঠি। তাঁহার জন্য সরঞ্জামের মধ্যে এক প্রকাণ্ড কেম্বিসের ব্যাগ

ছিল ; তাহা এক্ষণে ভবর বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছেন সে তিনি একাকী আইসেন নাই ; তাঁহার সঙ্গে শ্রীমান চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি এখন ভবসুন্দরীর চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

হরকুমার বারান্দায় উঠিলেন। বিন্দুর মা ঘরের মধ্য হইতে এক খানি জল-চৌকি বাহির করিয়া আনিল এবং তাহার উপর এক খানি ভাঁজ করা কম্বল পাতিয়া দিয়া, রায় বাহাদুরকে বসিতে বলিল। হরকুমার বলিলেন,—"তবু ভাল, তুমি যে আমাকে বসিতে বলিবে, সে ভরসা আমার ছিল না। আমার এই পাকা গোঁফগুলা আমার পরম শত্রু। ইহার জন্যই বিন্দুর মা আমাকে দেখিতে পারে না।"

বিন্দুর মা বলিল,—" পাকা গোঁফেও আমার আপত্তি ছিল না ; কিন্তু তুমি ঠাকুর যে অনেকের। আমি ভাগাভাগির মধ্যে থাকিতে পারিব না।"

হরকুমার বলিলেন,—"সে কথার উত্তর এখন থাকুক। এখনকার হতশ্রী ছোঁড়ারা মা-মাসীর খবর না লইয়া, আগেই আপনার প্রণয়িনীকে লইয়া ব্যস্ত হয়। এখানে আমার বিধু মা, আর ভব মাসী

শুনি উপস্থিত। আমি তাঁহাদের সহিত কথা না কহিয়া, তোমার কোন কথার জবাব দিতে পারিব না।” তাহার পর বিধুমুখীর দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“মা, কেমন আছ বল! কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা নাই তো?”

বিধুমুখীর চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত; তিনি অধোমুখ—নিরুত্তর। হরকুমার আবার বলিলেন,—“কেন মা কথা কহিতেছ না? আমার উপর রাগ করিয়াছ কি? ছেলের উপর কি মায়ের রাগ সাজে? পাঁচ বৎসর আসিতে পারি নাই; কাজ খুব অন্যায় হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রতিদিন তোমার সংবাদ লইয়াছি। লোক পাঠাইয়া, ভবকে সোণাপুর কইয়া গিয়া, ডাকে পত্র লিখিয়া সর্ব্বদা তোমার সংবাদ না লইয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম না। তথাপি এতদিন স্বয়ং না আসাটা বড়ই দোষের কথা হইয়াছে। কিন্তু মা তুমি বুদ্ধিমতী; ভাবিয়া দেখ, রাজার বিষয়-কর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহার উদ্ধার করিতে বসিয়া এত দিনের মধ্যে আমার একবারও অন্য কোন কাজ করিবার সময় ও সুযোগ হয় নাই। এই জন্যই নিজে আসিতে পারি নাই।”

বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"আমি সে জন্য কোন দুঃখ বা অভিমান করিতেছি না। আপনাদের দয়ার কথা মনে করিয়া আমার চক্ষুতে জল আসিতেছে। যাহার নাম কখন মনে করা উচিত নয়, যাহাকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরান উচিত, দয়া করিয়া, কাজ ক্ষতি করিয়া, কষ্ট স্বীকার করিয়া, তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন বলিয়া লজ্জায় আমি কথা কহিতে পারিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—"ছেলের কাছে মা কি কখন লজ্জা পায়? তুমি কি আমাদের ঘৃণা করিয়া মুখ ফিরাইবার জিনিব মা? তুমি কি ভুলিবার সামগ্রী মা? তোমার লজ্জার কোন কারণই তো আমরা দেখিতেছি না। মানুষ কত সময় কত অবুঝের মত বেহিসাবী কাজ করে; কিন্তু তাই বলিয়া, সংশোধনের পরও তাহাকে ত্যাগ করা উচিত কি? এক জনের দোষে তোমার অধঃপতন হইয়াছিল, সে ভ্রম তোমার ঘুচিয়া গিয়াছে; সুতরাং এখনও তোমাকে ত্যাগ করিব কেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এ দয়ার সীমা নাই; এ সকল বাক্যের তুলনা নাই। যাঁহাদের স্বভাবই দয়া

প্রকাশ, তাঁহারা নরকের কীটকেও দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন না। সে কথা এখন যাউক। রাজা, রাণী, খোকা রাজা, রাজার ভগ্নী প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন তো ?”

হরকুমার বলিলেন,—“সকলেই ভাল আছেন। কিন্তু মা তুমি যেরূপে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছ, তাহা যদি রাজা শুনিতে পান, তাহা হইলে বড়ই দুঃখিত হইবেন। রাজা শ্যামলালকে জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া জ্ঞান করেন। সুতরাং তুমি সেই সম্পর্ক অনুসারে তাঁহাদের উল্লেখ না করিলে, তিনি স্পষ্টই বুঝিবেন, তুমি তাঁহাকে পর বলিয়া মনে কর। ইহাতে তাঁহার কষ্ট হইবারই কথা।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“আপনার কথার উপর কথা কহিতে আমার সাধ্য নাই। কিন্তু বলুন আপনি, কেমন করিয়া এই ঘৃণিত পদার্থ সেই স্বর্গের দেবতার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে সাহসী হইবে ?”

হরকুমার বলিলেন,—“তর্কের অনুরোধে আমি মানিয়া লইলাম, তিনি স্বর্গের দেবতা, আর তুমি নরকের ঘৃণিত পদার্থ। দেবতার সহিত কাহার সম্পর্ক নাই মা ? কোন পাপাত্মা মহাদেবকে বাবা বলে না ? দেবতার চক্ষুতে সকলেই সমান। কুব্জাও যাহা, রুক্মিণীও তাহা।

মা, রাজার সহিত তোমার পাতান সম্পর্ক নহে; তুমি রাজার বিশেষ আপনার লোক।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“পাপীয়সীর এমন সৌভাগ্যের কথা আর কেহ কখন শুনে নাই।”

হরকুমার বলিলেন,—“সে কথা যাউক, আমি তোমাকে দুইটী প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাইতে আসিয়াছি। হরিচরণ, আমাদের সহিত মোকদ্দমায় জাল ও জুয়াচুরি করিয়া, তিন বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছিল জান?”

বিধুমুখী অধোমুখে বলিলেন,—“হাঁ।”

হরকুমার বলিলেন,—“আজি আট দিন হইল সে জেল হইতে খালাস হইয়া আসিয়াছে। আমরা সংবাদ পাইয়াছি, এখন সে কলিকাতায় আছে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“সে তো এখানেও আসিতে পারে এবং আমার উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারে!”

হরকুমার কহিলেন,—“অসম্ভব নহে। তবে মোকদ্দমায় তাহার টাকা-কড়ি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এখনও তাহার কিছু নাই, এমন নহে। সে বুঝিয়াছে, তোমাকে জড়াইয়া একটা মোকদ্দমা করিতে পারিলে কিছু সুবিধা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও যে

রাজার কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহা আমরা জানি। তথাপি সে একবার চেষ্টা না করিয়া ছাড়িবে, এরূপ বোধ হয় না।"

বিধুমুখী ববিলেন,—"কিন্তু ইহাও তো সে বুঝি-য়াছে, যে আমি ভাল বা মন্দ কোন বিষয়েই তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিব না।"

"তাহা সত্য। কিন্তু মরিবার সময়ও সাপ কামড়াই-বার চেষ্টা না করিয়া ছাড়ে কি? সে ভাল ভাবে, মন্দ ভাবে সকল প্রকারেই তোমাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে পারে।"

বিধুমুখী সভয়ে বলিলেন,—"বড়ই ভয়ানক কথা! তাহার নাম হইলেই আমার হৃৎকম্প হয়। এখন উপায়?"

হরকুমার বলিলেন,—"উপায়ের ব্যবস্থা পরে করিব। এখন দ্বিতীয় সংবাদের কথা বলি। শ্যামলাল বাবুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

বিধুমুখী ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কোথায় আছেন তিনি?"

"তিনি এতদিন নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"নানাস্থান পর্য্যটন করিলেন কিরূপে? তাঁহার হাতে তো পায়সা ছিল না।"

"ভিক্ষা করিয়া।"

বিধুমুখী মনে মনে ভাবিলেন, 'এক সময়ে যাঁহার বাসনায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রাও অপব্যয় হইত, আজি তাঁহাকে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ভিক্ষা করিতে হইতেছে! আর আমি এক স্থানে বসিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতেছি।' প্রকাশ্যে বলিলেন,—"এখন কিরূপে চলিতেছে?"

"তিনি কলিকাতায় আছেন শুনিবামাত্র আমরা আবশ্যকমত অর্থ ও লোক পাঠাইয়া দিয়াছি। সম্ভবতঃ সত্বরই আমরা তাঁহাকে সোণাপুর আনিতে পারিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"বাবা, আমি আপনার সঙ্গে সোণাপুর যাইব।"

হরকুমার বলিলেন,—"বহু চেষ্টাতেও এ পর্য্যন্ত তোমার সোণাপুর যাইবার মত করাইতে পারি নাই। আর আজি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক সোণাপুর যাইতে চাহিতেছ, ইহা আমাদের সৌভাগ্য। ভাল, কল্য ভাবিয়া চিন্তিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিব। সে কথা যাউক। প্রথমে মাসীর বাটীতে বসিলাম। মাসী চারিটী মুড়ী খাইতে

দিয়াছেন। তাহার পর মার কাছে আসিলাম। মা তো কিছুই খাইতে বলেন না। যাহা কিছু ঘরে থাকে, বুড়া ছেলেকে খাইতে দেও মা।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি তাহা বার বার ভাবিতেছি বটে, কিন্তু আমার সাহসে কুলায় না।"

হরকুমার বলিলেন,—"কেন, আমি অনেক খাই বলিয়া ভয় পাইতেছ?"

বিন্দুর মা বলিল,—"শেষে মাথায় ঢুটা দিয়া দিলেই হইবে।"

বিধুমুখী আহারের আয়োজনে গমন করিলেন।
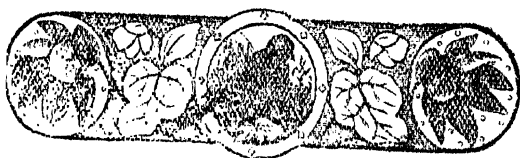
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•—

ভয়।

হরকুমার ও চণ্ডী পরদিন প্রাতে ভবসুন্দরীর চণ্ডী-মণ্ডপে বসিয়া আছেন। চণ্ডী এখন আর গুলি খায় না ; কিন্তু দুই বেলা প্রকাণ্ড দুই তাল আফিং উদরস্থ করিয়া থাকে। কোন অভাব-অপ্রতুলের জ্বালা তাহাকে আর ভোগ করিতে হয় না। তাহার অকৃত্রিম বন্ধু হরকুমার দাদার কৃপায় সে বড়ই সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে। বাস করিবার নিমিত্ত, সোণাপুরে রাজবাটীর আমলাদিগের বাস-ভবনে, সে উত্তম দ্বিতল ঘর পাই-য়াছে ; দুই বেলা তাহার নিমিত্ত সন্দেশাদি জল খাবার আসিয়া থাকে। দিনমানে তাহার ভোজনার্থ নানা

ব্যঞ্জন সহকৃত অন্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; রাত্রিতে তাহার নিমিত্ত ঠাকুরবাটী হইতে লুচী ও মিষ্টান্ন আইসে। তা ছাড়া, গোপাঙ্গনা তাহার নিমিত্ত প্রতিদিন জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার তামাক-টীকার ভাণ্ডার নিয়ত অক্ষয়। দেশী ভাল ভাল ধুতি সে পরিধান করে; রকম রকম জামা-কোট সে গায় দেয়; চীনা বাড়ীর ভাল ভাল জুতা সে পায় পরে। গড়-গড়ায় সে তামাক খায়; রাজবাটীর এক দাসী আসিয়া তাহার বিছানা পরিষ্কার করিয়া, কাপড় কাচিয়া, হুঁকায় জল ফিরাইয়া, অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যায়। সুতরাং চণ্ডী সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ ভাবেই কাল কাটাইতেছে। তাহার আকৃতিরও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহারা তাহাকে পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছে, তাহারা এখন তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারে কি না সন্দেহ। তাহার দেহে অস্থি চর্ম্মের মধ্যে মাংসের ব্যবধান ছিল না; কিন্তু এখন দেহ বেশ স্থূল হইয়াছে। গায়ের বর্ণ এখন আর পূর্ব্ববৎ কালীর মত নাই; একটু লাবণ্য সংযোগে রঙ্গটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মাথার সে রুক্ষ কেশ নাই; তেল চুক-চুকে কালো কেশরাশিতে মাথাটী ঢাকিয়া আছে।

নয়ন মুদিয়া তামাক খাইতে খাইতে, চণ্ডী জিজ্ঞাসিল,—"দাদা, এ বেলা সোণাপুর ফিরিয়া যাওয়া হইবে না কি ?"

হরকুমার বলিলেন,—"না ভায়া, আজি তো কোন মতেই যাওয়া হইবে না। এখানে অনেক কার্য্যের জন্য আসা হইয়াছে। সে সকল কাজ শেষ না করিয়া যাওয়া হয় কি ?"

চণ্ডী বলিল,—"তোমার কাজ যে কি তাহা তুমিই জান। আবার তোমাকে কাগজের সেই রোগে ধরিয়াছে কি ?"

"না ভায়া, এবার কাগজের সন্ধানে এ দেশে আমি আসি নাই।"

চণ্ডী বলিল—"এত দেশ থাকিতে ফের আমাকে টানিয়া লইয়া যখন এই দেশে আসিয়াছ, তখন কাগজপত্র ছাড়া আর কোন মতলব তোমার আছে বলিয়া বোধ হয় না। যদি কাগজই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সময় নষ্ট করিয়া ফল হইবে না। এদেশে আর কাগজ-পত্র নাই। চল তবে বর্দ্ধমান যাওয়া যাউক।"

হরকুমার বলিলেন,—"কাগজের কাজ তোমার

কল্যাণে শেষ হইয়াছে। এবার অন্য মতলব আছে।”

চণ্ডী বলিল,—“তা যে মতলবই থাকুক, রাজবাটীতে পরম সুখে ছিলাম। আমাকে এত কষ্ট দিবার জন্য এ পোড়া দেশে আনিলে কেন দাদা?’

হরকুমার বলিলেন,—“কেন ভায়া, তোমার কি বিশেষ কষ্ট হইতেছে?”

চণ্ডী বলিলেন,—“কষ্ট যথেষ্ট হইতেছে বই কি? আর কষ্ট যতই হউক, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু এখনই যে কষ্ট পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইবে। দুপুর বেলা দুইটা ভাত চাই তো। তাহার ব্যবস্থা তো ছাইও দেখিতেছি না।”

তখনই ভব পার্শ্বের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“বাবা, খাওয়া দাওয়ার কি হইবে?”

হরকুমার বলিলেন,—“মধ্যাহ্নে দুইটা ভাত খাইতে হইবে মাসী। তুমি যেমন করিয়া পার, তাহার উপায় কর। চণ্ডী ভায়ার জন্য সের খানিক ঘন দুধ চাই। তোমরা মা-মাসী এখানে থাকিতে আমাদের খাওয়ার ভাবনা কি?”

ভব বলিলেন,—“তা সবই ঠিক হইবে। সেই

লক্ষ্মীকান্ত বাটীতেই আছে। সন্দেশ, রসগোল্লা তো তোমরাই অনেক আনিয়াছ। মাছ, দুধ, সবই পাওয়া যাইবে। আমি তাহার উদ্যোগে যাই।”

হরকুমার বলিলেন,—“দাঁড়াও মাসী, দুইটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তোমাকে আর মাকে সোণা-পুর যাইতে হইবে। পারিবে না কি?”

ভব বলিলেন,—“কেন পারিব না? তোমার মার মত করাই কঠিন। তিনি বলেন, এ পোড়ামুখ সে দেবতাদের কাছে দেখাইতে পারিব না।”

হরকুমার বলিলেন,—“সে তর্ক পরে হইবে। আপা-ততঃ কথা বড় ভয়ানক। এখানে কেবল তোমাকে মাত্র সহায় করিয়া থাকায় তাঁহার অনেক বিপদ ও কষ্টের সম্ভাবনা।”

ভব বলিলেন,—“তাহা তো কালি তোমার মুখে সেই হতভাগার জেল খালাস হওয়ার খবর শুনিয়াই বুঝিয়াছি।”

হরকুমার বলিলেন,—“তুমি আমার মত জানাইয়া তাঁহাকেও এ বিষয়ে সম্মত হইতে বলিবে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য কোন সৎপরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছি না।”

ভব বলিলেন,—"যখন তুমি বলিতেছ, অন্য সদুপায় হইতেছে না, তখন কাজেই দিদিকে মত করিতে হইবে। সোণাপুরের কথা শুনিলে আমার তো আনন্দ ধরে না। সত্যই সে দেবলোক। তা যাই হউক, যদি যাওয়া হয়, তাহা হইলে কবে যাইতে হইবে?"

"কালিই।"

চণ্ডী বলিলেন,—"হাঁ মাসী, কালিই। তুমি এখানে যতই যত্ন কর, রাজবাড়ীর মত সুখ আর ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও নাই।"

ভব বলিলেন,—"তা আর বলিতে? কিন্তু বাবা, আমার হাতে তো অনেক লোকের টাকা-কড়ি ঘটিত কাজ আছে। সেখানে গিয়া দুই চারি দিনে কখনই আসিতে পারিব না। কাজেই গোল মিটাইয়া যাইতে হইবে: তাহা হইলে দুই এক দিন বিলম্ব হইতে পারে।"

হরকুমার বলিলেন,—"যত শীঘ্র পার হাতের কাজ মিটাইয়া ফেল।"

ভব প্রস্থান করিল। হরকুমার জিজ্ঞাসিলেন,—"ভায়া, এই রামনগর তোমার পূর্ব্ব নিবাস, এই স্থানেই তোমার মাসীর বাড়ী, পরে সে বাড়ী তোমারই হইয়াছিল; তুমি সে বাড়ী বেচিয়া ফেলিয়াছ। এক্ষণে যদি সে বাড়ী

আবার তোমার হয়, তাহা হইলে তুমি এখানে বাস করিতে সম্মত আছ কি ?”

চণ্ডী বলিলেন,—“সে বাড়ী কেন? আমাকে এই সমস্ত দেশটার রাজা করিয়া দিলেও, আমি এখানে থাকিতে চাহি না। রাজবাটী ছাড়িয়া স্বর্গে পাঠাইলেও আমি যাইব না।”

“তোমার সেই বাটী পুনরায় খরিদ করা হইতেছে জান ?”

চণ্ডী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেন ? তখনই সে ঘরটী পড় পড় হইয়াছিল। এতদিনে হয়তো পড়িয়া গিয়াছে। পয়সা দিয়া সেই ভূতের বাসা কিনিতেছ কেন ?”

“তোমাদের জিনিসটা হাত ছাড়া হওয়া কি ভাল ?”

“তোমার গুণ সকলই ; কিন্তু দোষের মধ্যে তোমার ঘাড়ে সময়ে সময়ে ভূত চাপে। সেই ভাঙ্গা বাড়ীতে দুঃখানা ছেঁড়া কাগজ পাওয়া গিয়াছিল। সেই মায়ার সেই পচা ইট কয়খানা গলায় বাঁধিয়া ডুবিয়া মরাটা সুবোধের কাজ নয় দাদা।”

হরকুমার বলিলেন,—“ঠিক কথা। কিন্তু মনে কর, ঐ বাড়ী যদি ভাল করিয়া মেরামত করা হয়, উত্তম পাক-শালা, বসিবার ঘর প্রভৃতি যদি প্রস্তুত করা হয়, আর

তোমার দাদা রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদি স্ত্রী-পরিবার লইয়া সেখানে আসিয়া বাস করেন, তাহা হইলে ভাল হয় না কি?"

চণ্ডী বলিলেন,—"তা দাদা আইসেন, আসুন। আমাকে আসিতে না বলিলেই হইল। ভাল, দাদা তো বর্দ্ধমানে মোক্তারি করেন; তিনি সেখান হইতে এখানে আসিবেন কেন?"

করকুমার বলিলেন,—"বর্দ্ধমানে তিনি মোক্তারি করেন বটে, কিন্তু তাঁহার তো সেখানে বাসা। একটা নিজের বাসস্থান থাকা উচিত নয় কি? ছেলে-মেয়ে আছে, দিন-অদিন আছে।"

চণ্ডী বলিলেন,—"উচিত বটে। তাঁহার ঘাড়ে এ ভূতের বাড়ী চাপাইতে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে তাহার ব্যবস্থা করিতে পার।"

"তোমার সেই বউ দিদির সঙ্গে, ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছা হয় না কি?"

চণ্ডী বলিলেন,—"সত্যই বলিতেছি দাদা, তাঁহাদের সকলকেই দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বউ-ঠাকরুণের নিকট হইতে আমি সেই যে কাগজ লইয়া পলাইয়া

আসিয়াছি, তাহার পর হইতে দাদার নাম মনে হইলেই আমার ভয় হয়। আমি স্বপ্নে দেখি, যেন দাদা মুগুর লইয়া আমাকে তাড়া করিতেছেন।”

হরকুমার বলিলেন,—“আজি তাঁহারা সকলেই এখানে আসিবেন।”

চণ্ডী চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—“বল কি দাদা! তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব?”

হরকুমার বলিলেন,—“কোথায় যাইবে তুমি? এজন্য তোমার কোন ভয় নাই।”

চণ্ডী নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল,—“তাঁহাদের এখানে আসার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তোমার মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হয় না। আর তুমি, রামায়ণ মহাভারতকে হারি মানাইয়া, অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইতে পার। কাজেই তোমার কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইতেছে। তাহা হইলে দাদা, আমি কেন আজিই সোণাপুর চলিয়া যাই না?”

হরকুমার বলিলেন,—“তোমার কোন ভয় নাই। আমি এখানে থাকিতে তোমাকে কেহ কোন কথা বলিতে পারে কি?”

চণ্ডী বলিল,—“তা তুমি যাই বল, আমার সে দাদা বড়ই ভয়ানক লোক। ছেলে বেলায় বিনা দোষে তিনি আমার উপর যেরূপ লাঠিবাজি করিতেন, তাহা মনে হইলে, এখনও আমার হাড়ের ভিতর কন্ কন্ করিয়া উঠে। আমি আজিই প্রস্থান করিব দাদা।”

“কেমন করিয়া যাইবে?”

“আমি হাঁটিয়া যাইব। গাড়ি লোক কিছুই চাহি না, আমি অনায়াসে হাঁটিয়া চলিয়া যাইব।”

হরকুমার বলিলেন,—“আচ্ছা, সে পরামর্শ পরে হইবে। তুমি আপাততঃ আর একবার ভবকে ডাকিয়া আন।”

চণ্ডী বলিলেন,—“তা ডাকিতেছি। কিন্তু দাদা যদি আইসেন, তাহা হইলে আমাকে আগেই পলাইতে হইবে, এ কথা তোমাকে এখনই বলিয়া রাখিতেছি।”

চণ্ডী বড় কাতর ভাবে উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলন।

সেই দিন বেলা নয়টা কি দশটার সময়, গঙ্গামণির পরিত্যক্ত এবং তাঁহার বোনপো চণ্ডীচরণ কর্ত্তৃক বিক্রীত বাটী, রায় বাহাদুর হরকুমার বর্দ্ধমানের মোক্তার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে ক্রয় করিলেন। দলীল লেখা-পড়া শেষ হইয়া গেল; টাকা দেওয়া লওয়াও মিটিয়া গেল; স্থানীয় অনেক লোকই স্বাক্ষী রহিলেন। কেবল দলীল রেজেষ্টারী করা বাকী থাকিল। পত্র দ্বারা হরকুমার খরিদ-বিক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত কথাই স্থির

চণ্ডী। রাখিয়াছিলেন। সুতরাং এ কার্য্যে কোন বড় বিলম্ব বা অসুবিধা ঘটিল না।

যথাসময়ে ভব সুন্দরীর সুব্যবস্থায় হরকুমার ও চণ্ডীচরণ পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন। উত্তমরূপে তামাক সেবন করিতে কবিতে চণ্ডীচরণ নিদ্রাগ্রস্ত হইলেন। ক্রমে সেই নিদ্রার গাঢ়তা উপস্থিত হইল এবং চণ্ডীচরণের নাসারন্ধ্র হইতে উৎকট শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

হরকুমার, কাগজ-কলম প্রভৃতি বাহির করিয়া, কয়েক খানি পত্র লিখিলেন। একটা লম্বা হিসাবের কাগজ বাহির করিয়া অনেক দেখা-শুনা করিলেন। বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

ভব সুন্দরীর চণ্ডীমণ্ডপ সমক্ষে দুইখানি গরুর গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। হরকুমার গাড়ীর আরোহীগণকে সাদরে আহ্বান করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাদিগকে "আসুন আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভবকে বলিলেন,—"তাঁহারা আসিয়াছেন। তুমি মেয়ে ছেলেদের আদর করিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া আইস; মিষ্টান্ন আছে, জল খাইতে দেও।"

ভব তৎক্ষণাৎ বাহিরে গাড়ির নিকট আসিলেন। গাড়ি হইতে প্রথমে এক পুরুষ অবতরণ করিলেন। তিনিই মোক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি নামিয়াই বলিলেন,—"এ কে! কায়েত মাসি না? আর মাসি মা, আর যে কখন এ দেশে আসা হইবে, কি তোমাদের সহিত দেখা হইবে তাহা মনে ছিল না।"

ভব তাঁহাকে বলিল,—"বাবা, আমি চিরদিনই জানি, তোমার ভাল হইবে। কতকাল যে তোমাদের দেখি নাই তাহা বলিতে পারি না। যাও, এখন চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া বইস। আমি বউ মা আর ছেলেদের লইয়া বাটীর মধ্যে যাই।"

রামচন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপে উঠিতে গিয়াই প্রথমে হরকুমার বাহাদুরের সুদীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বলিলেন,—"ছয় বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের বাসায় যে মহাত্মাকে দেখিয়াছিলাম, আজি আবার তাঁহাকে দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম।"

হরকুমার সাদরে তাঁহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে তক্তাপোষের উপর বসাইয়া বলিলেন,—"আপনি আমাদের যে উপকার করিয়া-

ছেন, তাহা বলিয়া শেষ হইবার নহে। আমরা আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করি।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“সে কাগজগুলায় কাহারও এত কাজ হইবে তাহা কখনও মনে ভাবি নাই। আর সে গুলার জন্য আমারও যে এত উপকার হইবে, তাহা আমি জানিতাম না।”

হরকুমার বলিলেন,—“আপনার উপকার অতি সামান্য; আমরা সেগুলির দ্বারা অসীম উপকার পাইয়াছি এবং সে জন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আপনি যে সেগুলি ফেলিয়া না দিয়া যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য।”

রামচন্দ্র মনে মনে উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার সম্মুখস্থ এই ব্যক্তি ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে সকল গুণেই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহার নিকট অনর্থক বাগাড়ম্বর করিয়া প্রতিপত্তি বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। তথাপি কাগজ ফেলিয়া না দেওয়ার কথায় নিজের একটু বিজ্ঞতার পরিচয় না দিয়া থাকা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি বলিলেন,—“কাগজ কি কখন ফেলিতে পারি মহাশয়? এক টুকরা কাগজের জোরে কত সময় কতক ডুবা মোকদ্দমার আমরা উদ্ধার করিয়াছি।

কাজেই কাগজের বুঝি।"

পার্শ্বস্থ নিদ্রাগত ব্যক্তিকে করিলেন,—"ইনি কে?"

হরকুমার বলিলেন,—"চিনিতে উনি যে আপনার ভায়া চণ্ডীচরণ।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"চণ্ডী! বলেন কি এমন হইয়াছে? আপনাদের হাওয়া গায়ে মানুষের আকার-প্রকার বদলাইয়া যায়।"

চণ্ডীচরণ নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। সহসা সেই নিদ্রিতাবস্থাতেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "দোহাই দাদা, আপনি আমাকে আর মারিবেন না। দোষ আমার নয়—বউ-ঠাকরুণ না বলিলে আমি কখনই কাগজগুলি লইয়া যাইতাম না।"

হরকুমার হাসিতে হাসিতে চণ্ডীচরণের গায়ে হাত দিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করাইবার চেষ্টা করিলেন। চণ্ডী, নিদ্রা ভঙ্গ সহকারে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়াই দেখিল, তাহার দাদা রামচন্দ্র সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত। সে তখন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল এবং রামচন্দ্রের পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দোহাই দাদা,

ছেন, তাহা বলিয়া শেষ হইবার ন না। অনেকক্ষণ
নাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান দিয়াছেন। আর মারিলে
রামচন্দ্র বলিলেন,—'
এত কাজ হইবে তাহামচন্দ্র সাদরে চণ্ডীচরণকে উঠাইয়া
সে গুলার জন্য আ া চণ্ডী বলিল,—"ঐ রে! ধরিয়া মারি-
আমি জানিতাম্রকার নাই দাদা। আমার আর পলাইবার
হরকুমা া হায়! কেন আমি তখনই পলাই নাই!
সামান্য; দাদা, তুমি যে সে সময় দশবার বলিয়াছিলে,
য়া িন ভয় নাই। এখন যে আমার প্রাণ যায় দাদা,
কই তুমি তো কোন কথাই বলিতেছ না।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ভাই চণ্ডী, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; তুমি কষ্ট স্বীকার করিয়া রায় বাহাদুর মহাশয়কে আমার বাসায় লইয়া না গেলে, আর কাগজগুলি তাঁহার হাতে না দিলে, আমার আজি এত উপকার হইত না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও।"

চণ্ডীচরণ অবাক্ হইল। সে অজ্ঞানের ন্যায় একবার হরকুমার এবং আর একবার রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। হরকুমার বলিলেন,—"তোমার কোনই ভয় নাই ভায়া, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও

বলিতেছি। তোমার দাদা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। তোমার বউ ঠাকরুণ, ভাই-পো, ভাইঝিরা আসিয়াছেন। তুমি বাটীর মধ্যে গিয়া তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আইস; তাঁহাদের জল খাওয়া হইল কি না খোঁজ করিয়া আইস।"

রামচন্দ্রের বাহু-পাশ-মুক্ত হইয়া, চণ্ডীচরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে দাদা, তুমি আমার উপর রাগ কর নাই? আমাকে মার নাই? আমি যে এতক্ষণ ঘুমাইতে ঘুমাইতে কেবলই তোমার হাতের মারি খাইয়াছি।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"না ভাই, তোমাকে মারিব কেন? তুমি আমার অশেষ উপকার করিয়াছ। তোমারই জন্য বড় মেয়েটীর ভাল বিবাহ হইয়াছে; আর নানা বিষয়ে নানা প্রকার সুবিধা হইয়াছে। তুমি সুখে থাক।"

চণ্ডীচরণ অনেক ভাবিয়া দেখিল, কিন্তু তাহার দ্বারা কন্যার বিবাহ বা অন্যান্য সুবিধার কোন কথাই তাহার মনে পড়িল না। সে কেবল লুকাইয়া বউ-ঠাকুরাণীর হাতে কুড়িটী টাকা দিয়াছিল; বউ ঠাকুরাণী যেরূপ পাকা লোক, তাহাতে সে টাকা যে তিনি সহজে স্বামীর হাতে দিবেন, সে সম্ভাবনাও কিছু ছিল না। আর

সেই কুড়ি টাকা মাত্র পাইয়াই মেয়ের ভাল বিবাহ, ও অন্যান্য সুবিধা হইতে পারে কি? কথাটা যেরূপ ভাবে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে বিদ্রূপ বা তিরস্কারের ভাবে ইহা গ্রহণ করিতে তাহার মন চাহিতেছে না। সে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, অবশ্যই একটা কিছু ঘটিয়াছে। যখন হরকুমার দাদা ইহার মধ্যে আছেন, তখন অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ডই ঘটিতে পারে। তিনি না পারেন এমন কর্ম্মই নাই। অতএব বোধ হয় আর ভয়ের কারণ নাই এবং নিজের ওজন কমাইবারও আর দরকার নাই। প্রকাশ্যে বলিল,—"দাদা, আমি আর কি করিয়াছি? আমি যে সকল লোকের সহিত চলা-ফেরা করি,তাঁহারা দুনিয়ায় মানুষের সেরা। তাঁহাদের কৃপায় সবই হইতে পারে।"

হরকুমার বলিলেন,—"তা বেশ। তুমি এখন বাড়ীর মধ্যে যাও।"

চণ্ডী বলিলেন,—"যাই; দাদাকে একবার তামাক দিয়া যাই।"

সে তামাক সাজিতে বসিল। দুই কলিকা তামাক তৈয়ার করিয়া, একটী গড়গড়ার উপর বসাইয়া রামচন্দ্রকে খাইতে দিল। অপরটী একটী থেলো

হুঁকার উপর লাগাইয়া, হাতে করিয়া প্রস্থান করিল।

বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চণ্ডী দেখিলেন, তাঁহার সেই বউ ঠাকুরাণী মাটীর উপর বসিয়া, হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে ভব সুন্দরীর সহিত কথা কহিতেছেন। বড় মেয়েটী এখন প্রায় ষোল বছরের। সে মাতার নিকটে বসিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিতেছে ও ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। ছেলে দুইটী কিছু দূরে দাঁড়াইয়া, দাঁড়ের উপর ভবর যে টিয়া পাখী দুলিতেছিল, তদ্গত চিত্তে তাহাই দেখিতেছিল। চণ্ডী নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, —"বউ ঠাকরুণ, চিন্‌তে পার?" সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করিতেও চণ্ডীর ভুল হইল না। কিন্তু এবার শুষ্ক প্রণাম। এবার প্রণামের সঙ্গে রাজরাজেশ্বরীর শ্রীমুখাঙ্কিত চক্রবৎ রজত খণ্ড যুগল বধূ ঠাকুরাণীর চরণ-সরসিজ সমীপে মোহন শব্দ সহকারে নিপতিত হইল না। তা না হউক, বধূ ঠাকুরাণী চণ্ডীর উপর অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিলেন না।

সসম্ভ্রমে উঠিয়া বউ ঠাকরুণ বলিলেন,—"ওমা ঠাকুর পো যে! কি ভাগ্য আবার দেখা হইল! সেই দেখা আর এই দেখা! ভাল আছ তো ঠাকুর পো?"

চণ্ডী বলিল,—"তোমাদের কৃপায় এক রকম ভাল আছি বউ ঠাকরুণ। তোমরা সকলে ভাল আছ? পুঁটীর বিবাহ হইয়াছে, তা বউ আমাকে একবার জানাইলেও না।"

বউ ঠাকরুণ বলিলেন,—"জানাইব কি গো! তুমিই বিবাহ দিলে, তোমারই দয়ায় চারি হাত এক হইয়া গেল; আবার তোমাকে আমরা জানাইব কি?"

চণ্ডী আবার চিন্তিত হইল। সে তো বিবাহ বিষয়ে কোনই সাহায্য করে নাই। তবে বউ ঠাকরুণ তাহাকেই সকল কর্ম্মের মূল বলিতেছেন কেন? চণ্ডীর মনে হইল, হঠাৎ কি তাহার মাথা বিগড়াইয়া গেল? সহসা সে কি বুদ্ধি হারাইয়া ফেলিল? অকস্মাৎ সে কি পাগল হইল? এই সময়ে ভব স্থন্দরীর একটা কথা তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন বুদ্ধিকে একটু আলোক প্রদান করিল।

ভব বলিল,—"তা চণ্ডী চিরকালই লোক ভাল। আপনার লোকের উপকার তো করিতেই পারে, পরের কোন উপকার করিতেও চণ্ডী কখন পিছ পা নহে।"

চণ্ডী কখনই জানিত না যে, সে এত গুণবান্, এত পরোপকারী। ভাবিল, হয় সে পাগল হইয়াছে, না হয়

সে ঠিক আছে, কিন্তু কিরূপ একটা হাওয়া লাগায় এক সঙ্গে দুনিয়ার সকল লোকই বেঠিক হইয়া পড়িয়াছে। ভবর কথার উপরে বউ ঠাকুরাণী বলিলেন,--"উপকার বলে উপকার। মেয়ের বিবাহের জন্ম আমাদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল। সম্বন্ধ ঠিক, কথাবার্ত্তা পাকা, কিন্তু আমাদের হাতে একটিও পয়সা নাই। সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তিনটী শ টাকার ক্রমে আর জাতি থাকে না। হঠাৎ ঠাকুর-পোর নিকট হইতে এক রেজষ্টারী চিঠি গিয়া উপস্থিত। দু টাকা নয়, দশ টাকা নয়, মাসি মা! ঠিক্ মন জানিয়া ঠাকুর-পো তিন শ টাকাই পাঠাইয়াছেন। আমরা তো মরা দেহে প্রাণ পাইলাম। তাই তো পুঁটীর বিবাহ হইল! তা বেশ বিয়ে দিয়াছে ঠাকুর-পো। পাঁচটার ঘর, ভাত-কাপড়ের দুঃখ নাই— ছেলে চাকরী করে। তোমার কৃপায় পুঁটী বেশ পড়িয়াছে ঠাকুর-পো।"

ঠাকুর-পো ভাবিয়া স্থির করিলেন, এ সকলই ঐ বুড়া রায় বাহাদুরের খেলা। রায় বাহাদুরই যথা সময়ে চণ্ডীর নাম দিয়া, বিবাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইয়াছেন। হরকুমারের উপর চণ্ডীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। আজি আবার তাহার মাত্রা আর একটু বাড়িয়া

গেল। চণ্ডী সে সব কিছু না বলিয়া, পুঁটীর নিকটস্থ হইয়া বলিল,—"মা-লক্ষ্মী শাশুড়ী কেমন হইয়াছে বল।"

পুঁটী মাথা হেঁট করিল। বউ-ঠাকুরাণী বলিলেন, —"প্রণাম কর মা, কাকাকে প্রণাম কর। ওরে তোরা পাখী' দেখ্‌ছিস বুঝি। এদিকে আসিয়া আগে কাকার পায়ের ধূলা নে।"

তখন চণ্ডীর চরণে অনেক প্রণাম পড়িয়া গেল। চণ্ডী বাবাজীদের হাত ধরিয়া, মাথায় হাত দিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর-আপ্যায়িত করিলেন। তাহার পর ভবকে বলিলেন,—মাসী, ছেলেদের জল-খাইতে দেওয়া হইয়াছে? বউ ঠাকুরাণী জল খাইয়াছেন?"

ভব বলিল,—"ছেলেরা জল খাইয়াছে, কিন্তু তোমার বউ ঠাকরুণ কিছুই খান নাই। বলিতেছেন, হুগলীতে অবেলায় খাইয়া, এখন আর খাইতে ইচ্ছা নাই।"

চণ্ডী বলিল,—"ছি বউ ঠাকরুণ! তোমার মুখে এমন অবিচারের কথা। তুমি জল না খাইলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব।

বউ বলিলেন,—"ঠাকুর-পোর কথা, ঠেলিবার যো নাই। দেও মাসি মা, অল্প যাহা হয় কিছু দেও।"

মাসী জল খাবার দিলেন, বউ মা খাইলেন। চণ্ডী বলিলেন,—"এখন বাহিরে যাই বউ দিদি, আবার শীঘ্র আসিতেছি।"

চণ্ডী প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃতজ্ঞতা।

চণ্ডীচরণ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অনেক লোক একত্র হইয়া রায় হরকুমার বাহাদুরের সহিত কথোপকথন করিতেছে। হরকুমার একখানি ষ্ট্যাম্পকাগজে লিখিত দলীল বাহির করিলেন ও সমবেত লোক সকলের সম্মুখে, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে তাহা প্রদান করিয়া, বলিলেন,—"আপনার মাসী মার যে বাটী চণ্ডীচরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে এই গ্রামের যদুনন্দন ঘোষের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, সেই বাটী, বিক্রেতার ইচ্ছানুরূপ টাকা দিয়া, আপনার নামে খরিদ করা

হইয়াছে। এই ষ্ট্যাম্প তাহার দলীল। দলীলের অন্যান্য সকল বিষয়ই নির্দোষ হইয়াছে, কেবল এখনও ইহা রেজেষ্টরী করা হয় নাই। সে কার্য্যের এখনও অনেক সময় আছে; আপনি নিয়মিত কালের মধ্যে তাহা শেষ করিয়া লইবেন। সকলের সমক্ষে টাকা দেওয়া ও সহি করা হইয়াছে। আমার অনুরোধ, আপনি অদ্যই বাটী দখল করুন এবং তাহার মেরামত প্রভৃতি কার্য্য কল্য হইতেই আরম্ভ করুন।"

রামচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"আপনার নিকট কিরূপ কথায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা আমি জানি না। আমি এতকাল পরিশ্রম করিতেছি সত্য, কিন্তু তাহাতে পেটের ভাতই সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত মাথা দিবার একটা নিজের স্থান করিয়া উঠিতে পারি নাই। আপনার কৃপায় আজি আমার আপনার বলিয়া দাঁড়াইবার একটা বাটী হইল। ভায়া চণ্ডীচরণ! তোমাকে আমি চিরদিন বড়ই ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তুমি কোথায় থাক, কি কর, কখনও তাহার কোন সংবাদও লই নাই। তুমি আহার অভাবে কষ্ট পাইয়াছ, হাটের ঘরে শুইয়া কাল কাটাইয়াছ, শীতে হিমে দুঃখভোগ করিয়াছ, ইহা জানি-

য়াও আমি কখন একটা প্রতীকারের চেষ্টা করি নাই; মুখের কথা বলিয়াও একটা আপ্যায়িত করি নাই। সেই তুমি, এই নরাধমের যে উপকার করিলে, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। তোমার ঋণ এ জন্মে শোধিতে পারিব না।"

চণ্ডী বলিলেন,—"দাদা, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার পাইয়া থাক, আর সে জন্য যদি আপনাকে ঋণী বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে সে ঋণ এখনই শোধ হইয়া গেল। তোমার যে উপকার হইয়াছে বলিতেছ, তাহাতে তো আমারই উপকার হইল। আমার আর কে আছে দাদা? তোমার দুইটা ছেলে-মেয়ে আর তোমরাই আমার এ জগতে আপনার। তোমার মেয়ের বিবাহের চিন্তা তোমারও যেমন হওয়া উচিত, আমারও তেমনই হওয়া উচিত। আর ছেলে দুইটা আমাদের অবর্ত্তমানে পথে না দাঁড়ায়, সে চিন্তা তোমারও যেমন হওয়া উচিত, আমারও তেমনই হওয়া উচিত। সুতরাং দাদা, তোমার যাহা উপকার, আমারও তাহাই উপকার। আর দাদা তুমি কখন আমার কোন খবর লও নাই বলিতেছ; তা সে দোষটা তোমার, না আমার? যে নিয়ত চুরি করিত, ছেঁড়া কাপড় খানাও সম্মুখে পাইলে যে লুইয়া

পলাইত, যাহার সকল ব্যবহারই নিতান্ত ছোট লোকের মত ছিল, ইতর লোকের সহিত মিশিয়া মন্দ কাজেই যে ডুবিয়া থাকিত, সারাদিন নেশা করাই যাহার ব্যবসায় ছিল, তাহার সহিত কোন আত্মীয় লোক সম্বন্ধ রাখিতে পারে কি? দোষ আমারই দাদা। তাহার পর কথাটা সত্য বলাই ভাল। দেখ দাদা, তোমার কোন উপকার করিতেছি ভাবিয়া আমি কোন কাজ করি নাই। ঐ যে হরকুমার দাদা দেখিতেছ, উনি একজন সাধারণ মনুষ্য নহেন। যদি মানুষে দেবতা হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে উনিই সেই দেবতা। উঁহারই উপকারের জন্য আমি উঁহাকে সঙ্গে লইয়া তোমার কাছে কাগজের চেষ্টায় গিয়াছিলাম; তার পর তোমার কাছে সহজে কার্য্য সিদ্ধ হইল না দেখিয়া, বউ ঠাকরুণের নিকট হইতে তাহা হস্তগত করিয়াছিলাম। আমি ইহা ঠিক জানিতাম, যদি যথার্থ দরকারী কাগজ পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইবে। তবেই বুঝিয়া দেখ দাদা, আমার নিকট তোমার ঋণী থাকিবার কোনই কারণ নাই। এখন সে কথা যাউক। যে বাটী খরিদ করা হইল, তাহাতে তোমার তো কোনরূপ সংকুলান হইবে দাদা।

রামচন্দ্র বলিলেন,—"সে বিবেচনা পরে হইবে ভাই আপাততঃ যাহার কিছুই নাই, তাহার যাহা হইল তাহাই যথেষ্ট।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমিও তাহা বুঝিয়াছি। বাস্তবিক ঐ ক্ষুদ্র বাটীতে রামচন্দ্র বাবুর বিশেষ কোন কাজ হইবে না। আমি মনে করিয়াছি, উহাতে আর দুইটী কুঠারি ও দুইখানা খড়ের ঘর যোগ না করিলে কিছুতেই সংকুলান হইবে না। তাহাতে অনুমান হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। সে হাজার টাকা রামচন্দ্র বাবু আমার নিকটেই পাইবেন। এখনই লইতে ইচ্ছা করেন, লইতে পারেন।"

হরকুমার বাহাদুরের জামার ভিতরদিকে দুই একটা বড় বড় পকেট থাকে। একটা পকেট হইতে দশখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"আপনি হাজার টাকা গণিয়া লউন। আরও একটা কথা এই সময়ে আপনাকে বলিয়া রাখি। যদি কাজ-কর্ম্মে কোন কারণে আপনি অশক্ত হন, অথবা উপার্জ্জন করিতে অক্ষম হন, অথবা ঈশ্বর না করুন, আপনার স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে আপনি অথবা আপনার পুত্রগণ কার্য্যক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত,

রাজ-সংসার হইতে মাসিক কুড়ি টাকা সাহায্য পাইবেন।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"রায় বাহাদুর দাদা, তোমার জয় জয়কার হউক! এত গুণ না দেখিলে, তুমি এমন দয়ার সাগর না বুঝিলে, কি আমি তোমার গোলাম হইয়াছি। দাদা, অতঃপর ছেলে দুইটার সম্পূর্ণ বিলি হইল।"

আনন্দে চণ্ডীচরণের চক্ষু-জল-ভারাকুল হইল। রামচন্দ্র বলিলেন,—"এত অনুগ্রহ আমি লাভ করিব, ইহা স্বপ্নেও মনে করি নাই। এমন কার্য্যও আমি কিছু করি নাই, যাহাতে এত দয়া লাভে আমার অধিকার হয়। আমার ন্যায় অধম ব্যক্তি আপনার এতাদৃশ কৃপাভাজন হইবার কোনই হেতু নাই। হয় আমার পিতৃপুরুষদিগের পুণ্যে, না হয় আমার পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কোন সুকৃতিবলে এই সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে।"

হরকুমার বলিলেন,—"আপনার নিজ পুণ্যবলে এবং বর্ত্তমান জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-বলেই আপনি আমাদিগের বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। আপনি জানেন, সমস্ত সংবাদপত্রে রাজা উমাশঙ্করের বৃত্তান্ত ঘোষিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত জন্ম সংক্রান্ত অনেক প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু প্রকৃষ্ট ও অবি-

সংবাদিত প্রমাণ আপনার নিকট যে কাগজ ছিল, তাহা হইতেই পাওয়া গিয়াছে। আপনার সেই কাগজ না পাইলে রাজার সম্পত্তি লাভে অনেক বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইত এবং হয় তো আমাকে সে জন্য ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত। আপনি ঐ কাগজগুলি এত কাল যত্ন করিয়া রাখায়, কোন উপকারে লাগিতেছে না এবং কেহই সন্ধান করিতেছে না দেখিয়াও, আপনি কাগজগুলি নষ্ট না করায় আমাদের সাতিশয় উপকার হইয়াছে। সে উপকারের তুলনায় আমরা আপনার জন্য যাহা করিতেছি, তাহা অতিশয় তুচ্ছ বলিয়া মনে হওয়া উচিত। সে যাহা হউক, আপনি এক্ষণে নূতন বাটী দেখিতে যান এবং তাহার কোথায় কি করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসুন। বেলা প্রায় শেষ হয়।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"রায় বাহাদুর দাদা, তোমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। তুমি দেখিয়া যে বিষয়ে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই হইবে। তুমি দয়ার সাগর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, আর আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের কোন কাজই হইতে পারে না।"

হরকুমার বলিলেন,—"তবে চল, সকলেই যাই।"

সকলে প্রস্তুত হইয়া এবং সমবেত স্থানীয় লোক-দিগকে সঙ্গে লইয়া-যাত্রা করিলেন। ভবন সংক্রান্ত ব্যবস্থা করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হরকুমার, রামচন্দ্র ও চণ্ডীচরণ ভবসুন্দরীর চণ্ডীমণ্ডপে প্রত্যাগত হইলেন।

রাত্রির আহারের নিমিত্ত ভব অনেক আয়োজন করিয়াছে। লক্ষ্মীকান্ত ও রামচন্দ্রের গৃহিণী উভয়ে পাক করিতেছেন। একটা ক্রিয়া বাড়ীর মত ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। বিধুমুখীর বাটীতে আহারের আয়োজন বন্ধকরা হইয়াছে। ভবর বাটী হইতে বিধুমুখীর ও বিস্নুর মার আহার্য্য প্রেরিত হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

আহারাদির অনেক বিলম্ব আছে বুঝিয়া হরকুমার আবার বিধুমুখীর বাটীতে গমন করিলেন, সেখানে তাঁহাকে অনেক সাবধানতার পরামর্শ ও অনেক উপদেশ দিয়া তিনি ভবর বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। সকলের আহারাদি শেষ হইতে প্রায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। সকলে শয্যা গ্রহণ করিলেন এবং নিদ্রামগ্ন হইলেন। হরকুমার ও চণ্ডীচরণ চণ্ডীমণ্ডপে শয়ন করিয়াছিলেন। চণ্ডী গড়গড়ার নল মুখে দিয়া ঝিমাইতে

লাগিলেন। হরকুমারের অসংখ্য কার্য্যভার মাথায় ; সুতরাং শীঘ্র নিদ্রা আসিল না।

রাত্রি প্রায় একটার সময় সহসা নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদ হরকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কে যেন সন্নিহিত কোন স্থান হইতে "বাবাগো, মাগো" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল! স্বর হরকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি ব্যস্ততা সহ উঠিয়া বসিলেন। বহুক্ষণ হরকুমার উৎকর্ণ হইয়া পুনরায় কোনরূপ শব্দ শুনিবার আশায় অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু কোন দিক হইতে সন্দেহজনক কোন প্রকার সব্দই তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। তাঁহার এক একবার মনে হইল যে, যে কাতর-ধ্বনি তিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা বিধুমুখীর কণ্ঠোত্থিত। আর স্থির ভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকা অবিধেয় বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি ডাকিলেন,—"চণ্ডীচরণ, চণ্ডী ভায়া।"

চণ্ডী নিদ্রাবেশে উত্তর দিল,—"আমার আফিং চুরি করিতে আসিয়াছ? এমন কাজ করিও না বাবা!—ইহাতে বিপদ ঘটিবে।"

হরকুমার বলিলেন,—"চণ্ডীভায়া, একটু সাবধান থাকিও, আমি একবার বিধুমুখীর বাটীতে যাইতেছি।"

চণ্ডীর কাণে হরকুমারের বাক্য কতক প্রবেশ করিল। সে বলিল,—“খুব সাবধান থাকিব; আফিং চোরে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বিধুমুখী আফিং ধরিয়াছে।”

হরকুমার আপনার প্রকাণ্ড পাঁচের লাঠি গাছটি হাতে লইয়া নিক্রান্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে চণ্ডীচরণ তামাক খাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিল। সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আন্দাজেই তামাক-টীকার পাত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার নিকটেই তৈলাদিযুক্ত একটা প্রদীপ থাকে। দিয়াশলাই দ্বারা সেইটা জ্বালাইয়া তাহাতে চণ্ডীচরণ টীকা ধরাইয়া থাকে। এক্ষণে যথাস্থান হইতে দিয়াশলাই লইয়া চণ্ডী তাহার মধ্য হইতে একটা কাটি বাহির করিল এবং দিয়াশলাইয়ের বাক্সে জ্বালিতে লাগিল, কিন্তু যে দুই পার্শ্বে ঘর্ষণ করিলে কাটি জ্বলিতে পারে, তাহার কোন দিকে ঘর্ষণ না করিয়া, চণ্ডী বার বার প্রাণপণে বাক্সের যে দিকে কাগজ মোড়া থাকে, সেই দিকে ঘসিতে লাগিল। কাঠি জ্বলিল না। চণ্ডী সেটা ফেলিয়া দিয়া বলিল,—“ছাই মাটী, সকলই ভেল।” আবার আর একটী কাঠি বাহির করিল; কিন্তু তাহার

যে মুখে মশলা দেওয়া আছে, সে দিকটা না ঘসিয়া, যে দিকটা খালি কাঠি, তাহাই বার বার বাক্সের গায়ে ঘসিল। দেশলাই জ্বলিল না। চণ্ডী বলিল,—"কেবল জুয়াচুরি, সব ফাঁকি।" সে কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা বাহির করিল; কিন্তু তখন নিদ্রার আবল্য নিতান্ত প্রবল; এজন্য বাক্স পর্য্যন্ত কাঠি পৌঁছিল না; সে আপনার বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্তস্থিত কাঠি অতি ধীরে ও মৃদুভাবে ঘসিতে লাগিল। তখনই দারুণ নিদ্রার ঘোরে সে আচ্ছন্ন হইয়া প'ড়িল—দেশলাইয়ের কাঠি ও বাক্স তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। কিয়ৎ-কাল নিদ্রাভিভূত থাকার পর, তাহার নাসিকা হইতে বিকট শব্দ উত্থিত হইল এবং সে নিজেই সে শব্দে চমকিয়া উঠিল। তাহার ঘুমের ঘোর কতকটা ছাড়িয়া গেল। সে তখন গড়গড়ার নল মুখে লাগাইয়া দুই, চারি বার টানিতে লাগিল। কিন্তু সে অগ্নি ও তামাক শূন্য হুঁকা হইতে একটুও ধূম বহির্গত হইয়া তাহাকে বিনোদিত করিল না। তখন সে আবার তামাক সাজিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। এবার তাহার দেশলাই সহজেই জলিয়া উঠিল এবং তৎসাহায্যে চণ্ডীচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া লইল। তাহার পর টীকা লইয়া প্রদীপ সংলগ্ন

করিল। দুই একবার চক্ষু উন্মীলিত করিল; কিন্তু আবার তাহা বুঝিয়া গেল। হস্ত যথাস্থানে না থাকিয়া একটু স্থান-ভ্রষ্ট হইতে লাগিল এবং কিয়ৎকাল পরে হঠাৎ তাহার হাত জ্বলন্ত প্রদীপের উপর পড়িয়া গেল; সুতরাং হাতে ভয়ানক উত্তাপ লাগিল। চণ্ডী "উহু উহু" করিয়া বলিয়া উঠিল,—"পোড়া প্রদীপগুলাও যেন ঠিক আগুনের মত।" এবার তাহার ঘুম ভাল রকম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাহার পর সহজেই তামাক সাজিয়া ফেলিল। তাহার পর বিপন্ন-বান্ধব, সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশক, চতুর্ব্বর্গফল-প্রদ, গড়গড়ার নল মুখে দিয়া সে ধীরে ও সন্তর্পণে টানিতে টানিতে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

সহসা কতকগুলি মনুষ্যের দ্রুত গমন-জনিত পদ-শব্দ চণ্ডীর কর্ণে প্রবেশ করিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কেও? কে যায়?"

কোন উত্তর নাই। তাহার মনটা বড়ই ভীত ও সন্দেহাকুল হইয়া উঠিল। সে ডাকিতে লাগিল,—"দাদা, রায় বাহাদুর দাদা, কে আমার আফিং চুরি করিতে আসিয়াছিল। আমি যে জাগিয়া আছি, তাহা বুঝি জানে না।"

হরকুমার দাদার কোন উত্তর না পাইয়া চণ্ডীচরণ

উঠিয়া বসিল। প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ভাল করিয়া চক্ষু মেলিয়া চণ্ডী দেখিল, শয্যায় তাহার রায় বাহাদুর দাদা নাই। তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একটা হাই তুলিয়া তিনটা তুড়ি দিল।

দাঁড়াইয়া চণ্ডীচরণ একটু চিন্তা করিল। তাহার দাদা বিছানায় নাই, অনেক লোকের পদশব্দ শুনা গেল, একবার বাহিরে গিয়া দেখা উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বাহিরে আসিল। কিন্তু কোন দিকে রায় বাহাদুর বা অন্য কোন লোক সে দেখিতে পাইল না। তখন তাহার দুইটা কথা মনে পড়িল। নিদ্রাবেশে সে একবার রায় বাহাদুর দাদার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল। তিনি একবার বিধুমুখীর নাম করিয়াছিলেন ও সাবধান থাকিতে বলিয়াছিলেন। এই কথা মনে পড়ার পর, সে একবার পার্শ্বস্থ বিধুমুখীর বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়া, হরকুমারের সন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিল।

জ্যোৎস্নালোকে তখন বসুন্ধরা সমুদ্ভাসিত। ধীরে ধীরে ও সাবধানতা সহকারে, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, চণ্ডীচরণ অগ্রসর হইল। বিধুমুখীর দ্বার সন্নিধানে গমন করিয়া চণ্ডীচরণ যাহা দেখিল, তাহাতে

তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সে দেখিল, তাহার হরকুমার দাদা রক্তাক্ত কলেবরে অজ্ঞান অবস্থায় ভূশয্যায় নিপতিত। এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চণ্ডীচরণ "দাদা গো,—তোমার এ দশা কে করিল?" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই সংজ্ঞাহীন ভূ-পতিত রুধিরাক্ত পুরুষের চরণতলে পতিত হইল।

চণ্ডীর কাতর চীৎকার ধ্বনি ভবসুন্দরীর কর্ণগোচর হইল। সে ব্যস্ততাসহ চীৎকার শব্দ লক্ষ্য করিয়া, বিধুমুখীর বাটীর দিকে আসিল এবং এই দৃশ্য দেখিয়া নিতান্ত অভিভূত হইল। তখন ভব. চুপ করিয়া রোদন করা অবৈধ বোধে, বাটী হইতে লণ্ঠন লইয়া ও রামচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিল। রামচন্দ্রও ভব লণ্ঠন লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বিধুমুখীর ঘরের দরজা খোলা; জিনিষ-পত্র সকলই যথাস্থানে পতিত আছে; কিছুই স্থান ভ্রষ্ট বা অপহৃত হয় নাই; কিন্তু বিধুমুখী কোথাও নাই। ঘরে বা অঙ্গনে কোথায়ও সে সুন্দরীকে দেখিতে পাওয়া গেল না। দূরে, অঙ্গনের পার্শ্বে একটা চাঁপা গাছ তলায় বিন্দুর মার অচৈতন্য দেহ দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার হাত পা বাঁধা এবং তাঁহার মুখ-গহ্বরে অনেক কাপড়

প্রবিষ্ট। সেও মৃতকল্প। তাহার বন্ধন মোচন করা হইল।

হরকুমারের সংজ্ঞাশূন্যদেহ সন্তর্পণে সকলে বহন করিয়া ভবর চণ্ডীমণ্ডপে আনয়ন করিল। তৎক্ষণাৎ ভব পল্লীবাসী অনেক লোক ডাকিয়া জমা করিল সকলে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে হরকুমারের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। সেই গভীর রাত্রিতে ভবসুন্দরী সমস্ত ব্যাপার জানাইবার জন্য, রাজা উমাশঙ্করের নিকট একজন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিল।

অন্নপূর্ণা ।

তৃতীয় খণ্ড—দেবলোক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রমালা।

বীরভূম জেলা বঙ্গদেশের শেষ গৌরবস্থল। এই প্রদেশের নরপতিগণ বহুকালাবধি মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ ও বিসংবাদ করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং লাক্ষ্মণেয় সেন কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ-সিংহাসন যবনদিগের হস্তে নির্ব্বিবাদে সমর্পিত হইলেও, বীরভূমের নরপতিগণ বহুকালাবধি আপনাদিগকে মুসলমানদিগের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণার্থ অশেষ প্রযত্ন ও অধ্যবসায় ইতিহাসের অতি সমাদৃত প্রসঙ্গ। এই জেলার রাজনগর, সংক্ষেপত নগর, হিন্দু-স্বাধীনতার শেষ লীলাস্থল। এখন সে নগরের অস্তিত্ব নাই। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও বহুদূর পর্য্যন্ত সমাকীর্ণ ইষ্টক ও প্রস্তররাশি সেই অতীত গৌরব স্থলের নিদর্শনস্বরূপে নিপতিত রহিয়াছে।

এই জেলার নাম বীরভূমি ও ইহার বর্ত্তমান প্রধান-নগরের নাম শূরি; ইত্যাকার অনেক নাম, এই স্থানে যে এক সময়ে বিক্রমশালী মহাপুরুষগণের নিবাসস্থল ছিল, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বীরভূম অন্যান্য নানা কারণেও আদরণীয় স্থান ইহার পশ্চিম ও উত্তরাংশ অতি রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য সমূহের নিকেতন। কোথায় শোভাময় তরুলতা সমাচ্ছন্ন অপূর্ব্ব গিরিমালা, কোথায় শাল, পলাশ প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষরাজি পরিবৃত ঘনারণ্য, কোথায় সঙ্কীর্ণ কলেবরা খরস্রোতা, স্বল্পতোয়া, স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী ইত্যাদি নৈসর্গিক শোভায় এই প্রদেশ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। উন্নতাবনত ভূমি, রক্তাভ মৃত্তিকাকীর্ণ ভূতল ও স্থানে স্থানে সুদূরব্যাপী সুশ্যামল ক্ষেত্র এই প্রদেশের পরম রমণীয়তা সংবিধান করিয়াছে।

বিজ্ঞানবিৎ বা বিজ্ঞানতত্ত্বানুসন্ধিৎ সুব্যক্তিগণের পক্ষেও এ প্রদেশ অশেষ উপযোগী উপকরণের ভাণ্ডার। এখানে ভূপৃষ্ঠ বিদার করিয়া যে সকল রমণীয় নৈসর্গিক উৎস সমুত্থিত হইয়াছে, তত্তাবতের অপূর্ব্ব রমণীয়তার প্রসঙ্গ বিচার্য্যরূপে গ্রহণ না করিলেও, জ্ঞানার্থীর পক্ষে তৎসমস্ত যে অপরিসীম আলোচনা ও বিচারের বিষয়ীভূত তাহার আর সন্দেহ নাই। এই প্রদেশে নানাবিধ জীবের পঞ্জর, কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রীর পাষাণাকারে রূপান্তর প্রাপ্তির ভূরি ভূরি নিদর্শন নিয়ত পরিদৃষ্ট হয়। সেই সকল রূপান্তরিত নিদর্শন নিরতিশয় কৌতুকাবহ ও অনেক শিক্ষার সদুপায়। এ প্রদেশের কোন কোন গিরির গঠন ও উপাদান বিষয়ে অনেক অসাধারণত্ববিশিষ্ট; সুতরাং আলো-

চনার বিষয়ীভূত। এখানকার ভূগর্ভও ভূতত্ত্ববিদ্‌মনীষী-
গণের সমক্ষে বিবিধ আলোচ্য বিষয় সমুপস্থিত করিয়াছে।
স্তর সৃষ্টির অনেক পারম্পর্য্য এখান হইতে সুন্দররূপে
মীমাংসিত হইবার প্রকৃষ্ট অবসর আছে। কোন কোন
বৈজ্ঞানিক মীমাংসা করিয়াছেন, একদা হিমালয়ের শিখরে
সমুদ্র বিস্তৃত ছিল; বহুবিধ নৈসর্গিক ব্যাপার সংঘটিত
হওয়ার পর ভারতের এই রূপান্তর হইয়াছে। সে সকল
গুরুতত্ত্বের অবতারণা করা, আমাদের উদ্দেশ্য নহে;
বিজ্ঞানপ্রিয় পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন, যাঁহারা
তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে এই সকল মনোহর প্রসঙ্গ
অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে পরামর্শ প্রদান করি।
বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, সে দিনও বীরভূমের শুষ্ক ভূভাগ
ও উন্নত শৈলসমূহ সমুদ্রজলে আচ্ছন্ন ছিল এবং যেখানে
অধুনা মানবকুল পরম সুখে বাস করিতেছে, তরক্ষু ও
গজসমূহ বিচরণ করিতেছে, দেবালয় ও তীর্থক্ষেত্র প্রতি-
ষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় মকর ও তিমিঙ্গিল ক্রীড়া করিত
এবং সাগরের বারিরাশি তাহার উপর লহরীলীলা বিস্তার
করিত। কিন্তু সে সকল বিজ্ঞানের কথা—উপন্যাসে
তাহার স্থান হইতে পারে না।

যাঁহার কোমলকান্ত পদাবলীর সুমধুর বিন্যাসে শ্রোতৃ-
বৃন্দের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, যাঁহার অলৌ-
কিক প্রেমলীলার সুপবিত্র সঙ্গীতধ্বনি বসুন্ধরাকে

মোহিত করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার কমনীয় কবিত্বের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসে ভারতভূমি গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে, কবিকুঞ্জের পিকস্বরূপ সেই জয়দেব কবি এই প্রদেশেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার চরণাঙ্কিত কেন্দুবিল্ব পরম তীর্থরূপে পরিগণিত রহিয়াছে।

ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বীরভূমের প্রাধান্য সম্বন্ধে অন্য বিশিষ্ট কারণ আছে। বীরভূম সাধনার ক্ষেত্র ও সাধকের প্রিয় স্থান। এই প্রদেশের বহু স্থানে এখনও শাস্ত্রার্থবিৎ ও ক্রিয়াশীল তান্ত্রিক এবং হঠযোগীর অবস্থান দৃষ্ট হয়। পুরাকালে যে এখানে নানাস্থানে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণের আসন ও আশ্রম ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাঁহারা যোগশাস্ত্রের ও কর্ম্মমার্গের অনুরাগী, তাঁহারা এ প্রদেশের ভাব ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াই অনুমান করিতে পারেন যে, এক সময়ে এই স্থান সাধনা ও সিদ্ধির সর্ব্বথা অনুকূল ও উপযোগী ক্ষেত্র ছিল। অধুনা এ স্থানের পূর্ব্ব মাহাত্ম্য অপচিত হইয়াছে, কালসহকারে ভূমির নৈসর্গিক শক্তি অপগত হইয়াছে সন্দেহ নাই; তথাপি এ প্রদেশ বঙ্গদেশের মধ্যে যোগার্থীর যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রম্য নিকেতন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। যোগশাস্ত্রের পরম গুরু মহর্ষি অষ্টাবক্র এই স্থানেই সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁহার সেই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গরূপী

মহেশ্বর বক্রেশ্বর নাম ধারণ করিয়া অদ্যাপি বিবিধ বিধানে পূজিত হইতেছেন। সেই অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষের তিরোধানের পর, তাঁহার সাধনাস্থলে একাল পর্য্যন্ত বহু সিদ্ধ ও সাধক তপশ্চর্য্যা ও যোগানুষ্ঠান করিয়াছেন এবং এখনও বহু পুণ্যবান্ মহাপুরুষের সমাগমে সেই পুণ্যক্ষেত্রের তেজস্তপ্ত ভূতল পবিত্রীকৃত হইতেছে। এই জেলার অনেক স্থানে অনেক সাধু পুরুষের সাধনাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এখনও অনেক মহাত্মা স্থানবিশেষে প্রচ্ছন্নভাবে স্বকার্য্য সাধনে রত থাকিয়া কালযাপন করিতেছেন।

ঐতিহাসিক রহস্যের এই লীলাক্ষেত্রে, প্রকৃতির এই রম্য-নিকেতনে চন্দ্রমালা নামে এক সমৃদ্ধিশালী নগর আছে। সেই জনপদে অতি পূর্ব্বকালাবধি প্রবল প্রতাপান্বিত এক ভূস্বামীবংশ বাস করিয়া আসিতেছেন। এক সময়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রতাপের সহিত স্বাধীন নরপতির ন্যায় রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের সে ক্ষমতা ও প্রতাপ বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিবার অধিকার তাঁহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির বিশেষ অপচয় হয় নাই। এখনও তাঁহাদের ভবনের চতুর্দ্দিকে গড় আছে; এখনও তাঁহাদের সৈন্য ও সেনাপতি আছে; এখনও তাঁহাদের কামান ও

বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র আছে; এখনও তাঁহাদের হস্তিশালায় বহুসংখ্যক হস্তী আছে; মন্দুরায় নানাবর্ণের অশ্ব আছে; এখনও তাঁহাদের কাছারিবাটী কর্ম্মচারী, বিচারক ও বিচারার্থীর সমাগমে জনাকীর্ণ; এখনও তাঁহাদের ধনাগার অবিরত রজত ও কাঞ্চনধ্বনিতে শব্দিত; এখনও তাঁহাদের অতিথিশালা বিবিধ দেশাগত ব্যক্তিবৃন্দ পরিপূর্ণ; এখনও তাঁহাদের প্রাসাদ নবীনতার আবরণে পরিশোভিত; এখনও সেই রাজবংশ প্রদেশ মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে শীর্ষস্থানীয়।

এই রাজগণ ব্রাহ্মণবংশসম্ভুত এবং ইঁহাদের আদিম ইতিহাস পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সহিত বিজড়িত। এই সিংহাসনে যে সকল মহাপুরুষ একাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা তাবতেই ধর্ম্মপরায়ণতা ও বীরত্বের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের অনেকেরই নাম দেবতার ন্যায় সমাদরে উক্ত ও স্মৃত হইয়া থাকে এবং এতদ্দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ এখনও সমবেত হইয়া এই রাজবংশাগত অনেক মহাপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী রামায়ণ মহাভারতাদিতে বর্ণিত বিবরণের ন্যায় ভক্তি ও প্রীতিসহকারে আলোচনা করিয়া থাকে। এ সকল বৃত্তান্ত তাহাদের পক্ষে চিরনবীন ও পরমা সমাদৃত এবং তাহার আলোচনা ও পরিচিন্তন তাহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের সাধন বলিয়া সকলে বিশ্বাস করে।

ফলতঃ চন্দ্রমালার রাজবংশের মহাপুরুষগণ দেব-প্রভাব সম্পন্ন এবং দৈববলে বলীয়ান ইহাই সর্ব্বসাধারণের অবিচলিত ধারণা। এতদ্বংশীয় স্বর্গগত মহাত্মাগণের জীবন-বৃত্তান্তসংক্রান্ত ও অতীত ইতিহাসের আলোচনা করিলে অনেক বিস্ময়জনক অমানুষী শৌর্য্য ও বীর্য্যের বিবরণ শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে হয় এবং অনেক কঠোর ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, অলৌকিক ত্যাগস্বীকার ও বিষম হৃদয়বলের পরি-চয় শ্রবণে ভক্তি ও প্রেমার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাদের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মনের বাসনা জন্মে।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীকাল এই রাজসিংহাসন এক পিতৃমাতৃহীনা মহীয়সী মহিলা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা আর কখন সংঘটিত হয় নাই। এই মহিলার নাম করুণাময়ী। করুণাময়ীর পিতা এক-মাত্র তনয়া রাখিয়া জীবলীলা সংবরণ করেন; অগত্যা সেই নন্দিনীকেই পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে হইয়াছে। কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই জননী সূতিকাগারেই জীবলীলা সংবরণ করেন। যখন স্বর্গীয় মহা রাজা স্বর্গারোহণ করেন, তখন করুণাময়ীর বয়স প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ। পঞ্চদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা কন্যাকে উদ্বাহ-বন্ধনে বদ্ধ করা এ রাজবংশের নিয়ম ছিল না; এ কন্যা পিতার পরলোক প্রাপ্তির সময়ে অনূঢ়া ছিলেন। করুণাময়ীর শিক্ষা ও চরিত্রবল সেই অল্প বয়সেই

অতুলনীয় হইয়াছিল এবং যে মহদ্বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয় ও মন, শিক্ষা ও ব্যবহার, অনুষ্ঠান ও আচার সর্ব্বথা তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। এক সংসার-বিরাগী, সর্ব্বত্যাগী পূর্ণ প্রজ্ঞ মহাপুরুষ করুণাময়ীর শিক্ষক ছিলেন। সেই স্থিতধী মহাত্মার কৃপায় করুণাময়ী আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাসাহায্যে শাস্ত্রোপদেশলব্ধ উপদেশসমূহ হৃদ্‌গত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজকুমারীর রূপ অলোকসামান্য ছিল। অলৌকিক দেবকান্তি তাঁহার দেহ আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে সহসা দেবী বলিয়াই মনে হইত। নিতান্ত কলুষিতস্বভাব হীনচরিত্র পুরুষও তাঁহার অপরূপ শ্রী সন্দর্শন করিলে ঘৃণিত মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিত এবং ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি ও ভোগবাসনা পরিহার করিয়া অন্তর হইতে আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিত। করুণাময়ীর জনক কন্যাকে শাপভ্রষ্টা দেবকুমারী বলিয়াই জ্ঞান করিতেন।

যথাকালে কন্যার বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে স্বর্গীয় মহারাজা পূর্ব্ব হইতেই পাত্র অনুসন্ধান করিতেছিলেন এবং অনেক আয়াসে এক সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত যুবককে রাজবাটীতে আনয়ন করিয়া ভাবী জামাতারূপে প্রতিপালন

করিতেছিলেন। পাত্র ও পাত্রীর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ বা কথোপকথনের কোনই সুযোগ হইত না; উভয়েই আপন আপন শিক্ষা ও সদনুষ্ঠান লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। পাত্রের নাম দেবরাজ। কেন রাজসংসারে আশ্রয় লাভ করিয়া পুত্রাধিক যত্নে ও সমাদরে প্রতি-পালিত হইতেছেন, তাহা দেবরাজ জানিতেন না। তিনি অন্নবস্ত্রবিহীন পিতৃমাতৃহীন দুঃখী বালক। মনে করিতেন তাঁহাকে নিরতিশয় দুরবস্থাপন্ন দেখিয়াই করু-ণার্দ্র হৃদয় মহারাজা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আশ্রয় ও অন্ন-দান করিতেছেন।

অতি অল্পকাল মধ্যেই দেবরাজ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বজ্ঞ গুরু, শিষ্যের হৃদয়াকর্ষণ অনু-ধাবন করিয়া, হঠযোগাদির ক্রিয়াসমূহে তাঁহাকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কালক্রমে যুবক দেবরাজ যোগের একজন অবিচলিত সাধক হইয়া উঠিলেন।

দেবরাজ, মহারাজার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিলেও, করুণাময়ী পিতার হৃদয়ভাব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। করুণাময়ীকে কখন দর্শন করার সুযোগ দেবরাজের সমক্ষে উপস্থিত না হইলেও বহু সময়েই দূর হইতে প্রচ্ছন্ন স্থানে থাকিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে পাইতেন। সেই পরম রমণীয় রূপ ও অশেষ বিদ্যাসম্পন্ন পিতৃনির্ব্বাচিত পাত্রের চরণে আত্ম-

সমর্পণ করা ভাগ্যের কথা বলিয়াই করুণাময়ী জ্ঞান করিতেন এবং যখনই যেস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেন, তখনই তাঁহাকে পতিদেবতা জ্ঞানে তিনি প্রণাম করিতেন। আর বর্ষদ্বয় পরে ঐ চরণের দাসী হইয়া তিনি নারীজন্ম সফল করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার উপযোগিনী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন। শিষ্যার ভাবী পরিণাম-সম্বন্ধে-অভিজ্ঞ-গুরুদেব এই সময়ে গিরিগুহায় স্বকীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ সময়ে মহারাজের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল এবং তিনি অখণ্ডনীয় শাসনের অধীন হইয়া দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবরাজ সেই পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ, দেবতুল্য শক্তিসম্পন্ন, মহাপুরুষের বিগত-জীবদেহ, অন্যান্য অনুচরের সহিত বহন করিয়া, পুণ্য-তীর্থে আনয়ন করিলেন এবং যথাবিধি সংকারাদি সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার আনুযাত্রিক ব্যক্তিগণ তাবতেই রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইল; কিন্তু দেবরাজকে কেহই দেখিতে পাইল না। সেই মহাপুরুষের পুণ্যপ্রদীপ্ত রাজকলেবর অগুরুকাষ্ঠ ও ঘৃতাদিসহ ভস্মীভূত হইল; কিন্তু তদেকাশ্রিত অনুগত ও বৎসল ভক্ত দেবরাজকে কেহই দেখিল না। নানা জনে নানা প্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। অনেকে মনে করিল, সেই একান্ত রাজভক্ত

শোকোন্মত্ত যুবা হয় ত আত্মহত্যা করিয়াছেন, কেহ বা মনে করিল, তিনি জ্ঞানী, সংসারে বাস করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না; কেবল রাজার স্নেহশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিতে অক্ষমতা হেতু তিনি সংসারকারায় আবদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে সে শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়াছে; দেবরাজও পলায়ন করিয়াছেন। কেহ মনে করিল, যে স্থানে পুত্রের ন্যায় তিনি লালিত পালিত হইয়াছেন, অতঃপর সেই স্থানে তাঁহাকে যুবতী রাজনন্দিনীর ও সম্ভবতঃ তাঁহার ভাবী পতির অধীনতায় জীবন যাপন করা বাঞ্ছনীয় মনে না হওয়ায় তিনি সমুচিত সময়ে প্রস্থান করিয়াছেন। ইত্যাকার নানাবিধ কল্পনা নানা স্থানে নানা ভঙ্গীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। দেবরাজের কোন বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; রাজবাটীতে বা অন্যস্থানেও কুত্রাপি তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। তাবতেই তাঁহার অলৌকিক রূপ ও অসাধারণ গুণগ্রামের পক্ষপাতী ছিল; সুতরাং তাঁহার এবম্প্রকার অচিন্তিতপূর্ব্ব তিরোধানে সকলেই নিরতিশয় দুঃখিত হইল। দেবরাজ কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই, কোন লোকের নিকটেই স্বকীয় অভিসন্ধি পরিব্যক্ত করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

করুণাময়ী।

যথাসময়ে স্বর্গগত মহারাজার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়াকলাপ যথানিয়মে সুসম্পন্ন হইল। করুণাময়ী পিতৃপরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন এবং পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাবে বৈষয়িক ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহিত করিতে থাকিলেন। দেবরাজের কোনই সন্ধান হইল না। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু দেবরাজের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। করুণাময়ী স্বতঃপরতঃ নানাস্থানে দেবরাজের সন্ধান করিলেন; কিন্তু কোনই ফল হইল না।

মন্ত্রীগণ, আত্মীয়গণ ও উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ করুণাময়ীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন; নানাস্থানে নানা সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিলেন; নানারূপ যুক্তি ও প্রলোভন প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু করুণাময়ী কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিলেন না। যখন আত্মীয়স্বজন ও রাজকুটুম্বগণ তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইবার নিমিত্ত জ্বালাতন করিতে লাগিলেন, যখন তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ হৃদয়গত অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে

অসম্ভব হইল, তখন তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, লৌকিক বিবাহ না হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার ধর্ম্ম-সম্মত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পিতা তাঁহার নিমিত্ত যে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, যাঁহাকে জামাতা জ্ঞান করিয়া তিনি নিজালয়ে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যাঁহাকে করুণাময়ী পতিজ্ঞানে দর্শন করিয়াছেন, যাঁহার চরণচিন্তা করুণাময়ী কর্ত্তব্য বলিয়া অবলম্বন করিয়াছেন, লোকতঃ তাঁহার সহিত বিবাহ না হইলেও ধর্ম্মতঃ করুণাময়ীর তাঁহারই সহিত বিবাহ হইয়াছে। যদি তিনি দয়া করিয়া কখন করুণাময়ীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি অণুমাত্র আপত্তি না করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে বিক্রীত হইবেন। যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায় বা তিনি বিবাহে অসম্মত হন, তাহা হইলে করুণাময়াকে সন্তুষ্ট মনে এই অবস্থায় জীবনযাপন করিতে হইবে।

তাঁহার এই কঠোর সংকল্প শ্রবণ করার পর আত্মীয়গণকে অগত্যা নিরস্ত হইতে হইল। তখন তাঁহারা আর একবার নবীভূত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে দেবরাজের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এবারও আত্মীয়গণের সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন নিষ্ফল হইল। দেবরাজের কোনই সন্ধান হইল না। বহু অর্থ ব্যয়িত হইল, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত

নানা স্থানে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বিচরণ করিল, সকলেই হতাশ হইয়া গৃহাগত হইল ; দেব-রাজের কোনই সন্ধান হইল না।

দেবরাজের সন্ধান না পাইলেও, করুণাময়ীর হৃদয় একটুও অবসন্ন বা বিচলিত হইল না। তিনি আন্তরিক অনুরাগ ও প্রসন্নতার সহিত স্বকীয় বিষয়-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে শাস্ত্রচর্চ্চা ও অভ্যস্ত অনুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করিয়া অবশিষ্টকাল বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ব্যয়িত করিতে থাকিলেন। আহার ও ভোগবিলাসে তাঁহার কোনই আশক্তি ছিল না। দেহধারণার্থ যে যৎসামান্য আহারের প্রয়োজন তদ-তিরিক্ত কোন বস্তু ইচ্ছায় বা কাহারও অনুরোধে তিনি ভোজন করিতেন না। প্রকৃষ্টরূপে লজ্জানিবারণ ও শালীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ পরিচ্ছদের প্রয়োজন তিনি তদ্ব্যতীত কোন অতিরিক্ত বস্ত্রালঙ্কার দেহে ধারণ করিতেন না। কাহারও অনুরোধে বা স্বকীয় বাসনার প্রাবল্যে তিনি কথনই বিলাসিতায় প্রমত্ত হইতেন না। অনেক সময় তাঁহাকে বিষয়কর্ম্মানুরোধে পুরুষের সমক্ষে প্রকাশ্যরূপে উপস্থিত হইতে হইত ; কখন কখন তাদৃশ ব্যক্তিবৃন্দের সহিত বাদানুবাদ করিতে হইত ; কখন কখন তিনি পূর্ণাঙ্গী যুবতী হইলেও, যুবা-পুরুষ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে তাঁহার নানা বিষয়ে

নানা প্রকার আদেশ করিতে হইত। এ সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার ব্যবহার, দৃষ্টি, ভাষা ও ভঙ্গী তাবতের বিস্ময় উৎপাদন করিত এবং কাহারও হৃদয়ে কোন প্রকার কলুষিত চিন্তার আবির্ভাব হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই জননী জ্ঞানে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ শ্রবণ ও পালন করিত। তাঁহার বিপুল ভূসম্পত্তির প্রজাগণ, তাঁহাকে আবশ্যক হইলেই দেখিতে পাইত এবং নর ও নারী, বালক ও বৃদ্ধ স্ব স্ব আবেদন ও অভিযোগ তাঁহার সমক্ষে নিবেদন করিবার সুযোগ পাইত, প্রত্যেকের বিবাদ ও অভিযোগ সঙ্গে সঙ্গে মীমাংসিত হইত এবং প্রত্যেকের অভাব করুণাময়ীর সুব্যবস্থায় সম্ভবমত পরিপূরিত হইত। করুণাময়ীর অধীন প্রজাগণ, কর্ম্মচারীগণ এবং আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকারে সুখী ও নিরুপদ্রব ছিল। সকলেরই জীবনযাত্রা নির্ব্বিবাদে নির্ব্বাহিত হইত।

করুণাময়ীর পিতৃপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিশাল ভূসম্পত্তির নানা স্থানে নানা প্রকার সাধারণহিতকর ও ধর্ম্মসঙ্গত হিতানুষ্ঠান ছিল। বহুস্থানে বহু দেবালয়, বিস্তর অতিথিশালা, পান্থনিবাস, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। করুণাময়ী তত্তাবতের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত করিলেন এবং সেই সমস্ত শুভানুষ্ঠানের কার্য্য প্রণালী সময়ে সময়ে স্বয়ং সন্দর্শন ও

পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল সম্পত্তির দূরতম স্থানেও তিনি সময়ে সময়ে স্বয়ং উপস্থিত হইতেন এবং যথাসাধ্য লোকের দুঃখ ও অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। যে স্থানে বিপদ ও নির্য্যাতন, ক্লেশ ও উৎপীড়ন সেখানেই করুণাময়ী আহূত না হইয়াও স্বয়ং উপস্থিত হইতেন, প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতা বলিয়াই জ্ঞান করিত; সকলেই জানিত তিনি আদ্যাশক্তি ভগবতী —কোন উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়েই ভূতলে অবতীর্ণা। লোকেরা তাঁহাকে মহারাণী বা তাদৃশ কোন নামে ডাকিত না। সকলেই তাঁহাকে "মা করুণাময়ী" বলিয়া সম্বোধন করিত। পিতা ও পুত্র, স্ত্রী ও স্বামী, মা ও মেয়ে সকলেই তাঁহাকে "মা করুণাময়ী" নামে ডাকিয়া পরিতৃপ্তি অনুভব করিত এবং যেখানে তাঁহার উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইত সেখানেই তাহারা তাঁহাকে "মা করুণাময়ী" বলিয়াই উল্লেখ করিত। ভগবান্ মহাদেব যেমন সকলেরই "বাবা", ভগবতী যেমন সকলেরই "মা", করুণাময়ীও সেইরূপ সকলেরই "মা"।

রাজ সংসারে করুণাময়ীর একমাত্র পরিচারিকা ছিল। রাজ-বাটীর অগণ্য দাসদাসী সকলেই স্ব স্ব নিয়মিত কর্ম্ম-সম্পাদন করিত; করুণাময়ী স্বকীয় কার্য্যাদি প্রায় সমস্তই স্বয়ং স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন। দাসদাসীর

সাহায্য তাঁহার কখনই আবশ্যক হইত না। যদি কখন দৈবাৎ কোন কর্ম্মের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে উক্ত পরিচারিকা তাহা সম্পাদন করিত। করুণাময়ী সেই বিশাল পুরীর মধ্যে একাকিনী বাস করিতেন। তাঁহার দেবচরিত্রে কখনই কোন কলঙ্ক প্রসঙ্গ কেহই শ্রবণ করে নাই বা তৎসম্বন্ধে কোনই সন্দেহ কখনও কাহারও মনে সমুদিত হয় নাই।

দশ বৎসর এই রূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। দেবরাজের কোনই সন্ধান হইল না এবং করুণাময়ীও বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন না। অনূঢ়া করুণাময়ী আপনাকে বিবাহিতা বলিয়াই বোধ করিতেন এবং সধবা নারীর লক্ষণাদি ধারণ ও তদনুরূপ নিয়মাদি পালন করিতেন।

করুণাময়ী একবার স্বয়ং দেবরাজের সন্ধানে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোন সঙ্গী রহিল না। তিন মাস পরে তিনি গৃহাগতা হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ও তৎসিদ্ধি সম্বন্ধে লোকে কোন সংবাদই জানিত না; সুতরাং কেহই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে তদ্বিষয়ক কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। তিনমাস পরে তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করিলেন এবং দুই মাস পরে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনঃ পুনঃ নানা সময়েই তিনি নানাকারণে

আপনার বিশাল সম্পত্তির নানা স্থানে পর্য্যটন করিতেন; সুতরাং তাঁহার যাতায়াত সম্বন্ধে লোকের কোন কৌতূহল জন্মিবার কারণ ছিল না। কখন কখন এক সঙ্গে পাঁচ ছয় মাস কাল তিনি স্বকীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিতেন। তিনি কখন কোথায় যান ও কি করেন তাঁহার অধীনস্থ ও অনুগত ব্যক্তিগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিত না এবং তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দিহান হইয়া তাঁহার গমনাগমনের স্থান বা কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইত না।

দশ বৎসর নিরন্তর পরিশ্রম করিয়া করুণাময়ী বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে যে প্রণালী গঠিত করিয়াছিলেন, হিতকর অনুষ্ঠান সমূহ সুরক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ব বিষয় প্রকৃষ্টরূপে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত যে শৃঙ্খলবিধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অনুপস্থিতি হেতু তত্তাবৎ সুনির্ব্বাহিত হইবার পক্ষে কোনই ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

এইরূপে করুণাময়ীর জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাঁহাকে দর্শন করিলে কখনই তাঁহার বয়স বিংশবর্ষাপেক্ষা অধিক বলিয়া কেহই অনুমান করিত না এবং যদি কেহ তাঁহার বয়সের আধিক্য সমর্থন করিত তাহা হইলে দর্শক সমর্থকের উক্তি ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ অবিশ্বাস্য

বলিয়াই বোধ করিত। কোন কোন স্থানে এতদুপলক্ষে বিবাদ বিসংবাদেরও উদ্ভব হইত। কেহ করুণাময়ীর বয়স ত্রিশ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল। একজন নবীন দর্শক এ কথা তাহার প্রতি বিদ্রূপ বিবেচনা করিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তির প্রতি তীব্র কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল। ক্রমে সেই বাগ্‌বিতণ্ডা বিষম বিবাদে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। আশ্চর্য্য সংযম ও নিয়মাধীনতা হেতু এই অলৌকিক চরিত্রবলসম্পন্না ও অমানুষী শক্তিশালিনী নারীর দৈহিক অপার্থিব শোভা, ও যৌবনের পরিপূর্ণতা বয়ঃপ্রভাবে বিন্দুমাত্র অপচিত হয় নাই। বরং বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার কলেবর অধিকতর জ্যোতিষ্মান ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কালের অখণ্ডনীয় নিয়ম এই দেবপ্রকৃতিসম্পন্না মহিলার নিকট পরাভূত হইয়াছে এবং লজ্জায় সেস্থান ত্যাগ করিয়া যেন চিরদিনের নিমিত্ত চরিত্রহীন নরনারীগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জীবনকৃষ্ণ।

বৈশাখমাস; মধ্যাহ্ন কালে চন্দ্রমালার রাজপ্রাসাদের এক সজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া মহারাণী করুণাময়ী এক-খানি প্রকাণ্ড পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহার ললাটে স্থূল সিন্দূররেখা, হস্তে স্থবর্ণ বলয়, পরিধান স্থূল লাল পেড়ে তসর কাপড় এবং তাঁহার মুখ, করপল্লব ও চরণদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য সর্ব্বাবয়ব এক স্থূল শ্বেতবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। তাঁহার ঘনকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি কবরী-বদ্ধ। তিনি একখানি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত চৌকীর উপর আসীনা। দূর হইতে এই অধ্যয়ননিরতা লাবণ্যময়ী, প্রতিভাজনিত জ্যোতির্ম্ময় নেত্রশালিনী, যৌবনশ্রীবিভূ-ষিতা দেবীকে দর্শন করিলেই মনে হয় যেন স্বয়ং ভগবতী ভারতীদেবী সশরীরে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

একজন উজ্জ্বল পরিচ্ছদধারী ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল যে, দেওয়ানজি সাক্ষাৎ অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতে-ছেন। করুণাময়ী তাঁহাকে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অবিলম্বে দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে ভূতলে মস্তক

স্থাপন করিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিলেন। মহারাণী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।

দেওয়ানজি জীবনকৃষ্ণ এম, এ, বিএল পরীক্ষোত্তীর্ণ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর, দেহ ক্ষীণ ও সুদীর্ঘ উর্দ্ধভাগ সম্মুখদিকে ঈষৎ অবনত। বর্ণ সুগৌর; মস্তকের কেশ অনেকগুলি শ্বেতবর্ণ।

দেওয়ানজি আসন গ্রহণ করিলে, করুণাময়ী হস্তস্থিত পুস্তক পার্শ্বস্থিত পেটিকার উপরে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"জীবনকৃষ্ণ, সংবাদ কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"বর্দ্ধমান জজ আদালতে আমাদের নামে একটা নালিস উপস্থিত হইয়াছে।"

করুণাময়ী জিজ্ঞাসিলেন, "কে করিয়াছে? কিসের নালিস?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—সত্ত্বের মোকদ্দমা, সোণাপুরের রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর নালিস করিয়াছেন।"

করুণাময়ী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বর্দ্ধমান জেলার যে তিনটা মহাল শ্যামলালের পত্নী বিধুমুখী আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, তাহার জন্য রাজা উমাশঙ্কর নালিস করিতেছেন কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। কথাটা খুব সহজ। তাঁহারা বলিতেছেন, বিধুমুখীর কোন সম্পত্তি বিক্রয়

করিতে অধিকার ছিল না; সুতরাং তাঁহার বিক্রয় অসিদ্ধ।”

করুণাময়ী বলিলেন,—“আর আমরা বলিতেছি, শ্যামলাল বাবু ঐ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি রীতিমত দলিল লিখিয়া তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন; সুতরাং সমস্ত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ দান বা বিক্রয় করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল,—এবং তাঁহার কৃত বিক্রয় সিদ্ধ।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“আজ্ঞা হাঁ। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের কথার উত্তরে বলিতেছেন পরের দ্রব্য যদি পরে আসিয়া পরকে বিক্রয় করে তাহা কখন সিদ্ধ বিক্রয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।”

করুণাময়ী বলিলেন,—“এ সম্বন্ধে আইন কাহাদের পক্ষে অনুকূল?”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“বোধ হয় আইন আমাদের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। যুক্তিদ্বারা দেখা যাইতেছে, আমরা উচিত মূল্যে আইনসঙ্গত প্রণালী ক্রমে যথানিয়মে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। আমাদের মনে বা কার্য্যে কোন অসৎ অভিসন্ধি ছিল না। সে সম্পত্তি যে বিধুমুখীর নহে, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন অধিকার বা কারণ ছিল না। নিতান্ত অসম্ভাবিত উপায়ে তাহা রাজা

উমাশঙ্করের হস্তগত হইয়াছে। যখন সেই বিপুল সম্পত্তি শ্যামলাল বাবুর ও তাহার পর বিধুমুখীর ছিল, তখন নানা ব্যক্তির সহিত নানাপ্রকার কাজ কর্ম্ম হইয়াছে, অনেক দেনা পাওনা হইয়াছে, অনেক বিষয় খরিদ বিক্রয় হইয়াছে। এ সকলই যদি এখন অসিদ্ধ দাঁড়ায়, তাহা হইলে বহু লোকের বহু প্রকার ক্ষতি হওয়ার সম্ভব। শ্যামলাল বাবুর সম্পত্তি প্রায় আমাদের মত; সুতরাং তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার লেন দেন, খরিদ বিক্রয় প্রভৃতি কাজ হওয়াই সম্ভব। এখন সে সম্পত্তি শ্যামলালের নহে, এই প্রমাণে তৎসময়েরকৃত সকল কাজকর্ম্ম উড়াইয়া দেওয়া বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহারা যাহা বলেন, আইনের তাহাই মর্ম্ম বটে; কিন্তু মোকদ্দমা কেবল আইন ধরিয়াই হয় না; যুক্তি ও বৈধতাও বিশেষরূপে বিচারকালে আলোচিত হয়।”

করুণাময়ী বলিলেন,—“ঠিক কথা। তোমার কথা অসঙ্গত নহে। আমি জ্ঞাত আছি, রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা। তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“রাজাবাহাদুরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু তাঁহার প্রধান আত্মীয় রায় হরকুমার বাহাদুরের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল।”

মহারাণী বলিলেন,—"আমি জ্ঞাত আছি, তিনিও একজন মহাশয় লোক। তাঁহাকে তুমি সমস্ত কথা বলিয়াছিলে কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়াও সম্পত্তি ছাড়িতে চাহেন না।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"রায় হরকুমার বাহাদুর বিষয়-কর্ম্মে একজন সুদক্ষ ব্যক্তি। তিনি যাহা ব্যবস্থা করিবেন, রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর তাহাই স্বীকার করিবেন। রায় বাহাদুর যদি সমস্ত কথা শুনিয়াও, সম্পত্তি ছাড়িতে সম্মত না হন, তাহা হইলে সে জন্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেন তাঁহারা এরূপমত করিতেছেন। কেহ যুক্তিবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ ও আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিতে হয়। আইন যদি অনুকূল হয়, কিন্তু যুক্তি ও ন্যায় যদি প্রতিকূল থাকে, তাহা হইলেও মোকদ্দমা করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ আইন সকল স্থলেই অবলম্বনীয় হইতে পারে না; অনেক ক্ষেত্রেই আইনের বলে অবিচারই হইয়া যায়; যুক্তি, ন্যায় ও আইন সকলই যে ক্ষেত্রে অনুকূল, সেই স্থলেই মোকদ্দমার প্রকৃষ্ট কারণ থাকে। আইন হয় ত রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুরের পক্ষে বর্ত্তমান বিষয়ে অনুকূল হইতে পারে; কিন্তু যুক্তি ও ন্যায় নিশ্চয়ই তাঁহার বিরোধী;

তথাপি রায় বাহাদুর হরকুমার কেন মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তিনি সদ্বিবেচক ও সূক্ষ্মদর্শী। কেন তিনি ন্যায় ও যুক্তির সম্মান করিতে চাহিতেছেন না, তাহা ভাবিয়া স্থির করা সুকঠিন। যাহাই হউক, আমি এ স্থলে রীতিমত আয়োজন করিয়া মোকদ্দমা চালাইতেই তোমাকে পরামর্শ দিতেছি। বোধ হয়, তোমারও তাহাই অভিপ্রায়।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই মামলা চালান উচিত। আইন যে ঠিক এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিকূল, তাহাও বলিতে পারি না। দুই একটা নজীর আমাদের বিশেষ অনুকূল আছে; আর আইনেও এরূপ বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই।"

মহারাণী বলিলেন,—"সাধারণতঃ মোকদ্দমা করিতে আমার বিশেষ প্রবৃত্তি নাই। আমাদের বিষয়-ব্যাপারে কখনই প্রায় কোন মোকদ্দমা করিতে হয় না। কিন্তু এবার আমাদিগকে একটা প্রধান মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে হইতেছে। মোকদ্দমা কাজটা ভাল না হইলেও, যে স্থলে পক্ষগণ একমত হইতেও অশক্ত, সেখানে অগত্যা রাজ-দ্বারে দণ্ডায়মান হওয়াই সুব্যবস্থা। রাজার নিয়োজিত ও বেতনপ্রাপ্ত বিচারক যে অসাধারণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতা-বিশিষ্ট মহাত্মা, এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই; বরং কোন কোন স্থলে তাঁহাদের হাস্যজনক

নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেখা যায়। সুতরাং অকারণ বহু অর্থব্যয় ও ক্লেশস্বীকার করিয়া তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষা আপনারা একমত হইয়া মোকদ্দমার কারণ মিটাইয়া ফেলাই উচিত পরামর্শ। এ স্থলে আমাদের পক্ষে যে সকল ন্যায়সঙ্গত যুক্তি রহিয়াছে, তাহা শুনিয়াও যখন রায় হরকুমার বাহাদুর মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন, তখন আমরা ইহার সমুচিত তদ্বির করিতেই বাধ্য। দানে বা পরোপকারার্থে, দৈব কারণে বা কোন বিপদহেতু সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ন্যায় ও যুক্তির বিরোধে একটী কপর্দ্দকও নষ্ট হইতে দেওয়া কখনই বিধেয় নহে। তুমি এ সম্বন্ধে সমুচিত জবাব দাখিল করিয়া দেও এবং আমাদের নিয়মিত যে উকীল মহাশয় আছেন, আবশ্যক বুঝিলে তাঁহার সাহায্যার্থ আরও উকীল নিযুক্ত করিয়া দেও।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“যে আজ্ঞা।”

মহারাণী বলিলেন,—“তোমার তহবিলে এক্ষণে কত টাকা মজুত আছে?”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“কালি পর্য্যন্ত মহারাণীর ধনাগারে নোটে ও টাকায় নগদ আশী লক্ষ টাকা মজুত আছে।”

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন,—“ধনাগারে যে সকল অলঙ্কার ও সোণারূপার বাসন প্রভৃতি মজুত আছে, এক

দিনে বিক্রয় করিলে তাহার মূল্য কত টাকা হইতে পারে ?”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“খুব যদি কমও হয়, তাহা হইলে দশ লক্ষ টাকার কম হইবে না।”

করুণাময়ী ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন,—“তাহা হইলে তোমার মজুদ টাকা এক কোটীরও কম। এই সামান্য সম্পত্তির তুমি অধ্যক্ষ !”

জীবনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন,—“মা ঠাকুরাণী, কি অভিপ্রায়ে এ কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা জানি না ; কিন্তু আমাদের সম্পত্তি সামান্য বলিয়া আপনি যে উল্লেখ করিতেছেন, তাহাতে আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। আমাদের সম্পত্তির মূল্য প্রায় চারি কোটী টাকা এবং রাজবাটীর যানবাহন, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতির মূল্যও দুই কোটী টাকা হইবে।”

করুণাময়ী বলিলেন,—“স্বীকার করিলাম, তোমাদের সর্ব্বস্ব একত্র করিতে পারিলে সাত কোটী টাকা হইবে। তাহা হইলেও এ সম্পত্তি নিতান্তই সামান্য বলিয়া মনে করিতে হইবে না কি ? অথচ এই সামান্য সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিয়া তুমি প্রশংসাভাজন হইয়াছ, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় নহে কি ?”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“প্রশংসা ! জানি না মা, কিসের জন্য কে আমার প্রশংসা করে। প্রশংসা ও

নিন্দা উভয়ই যদি তুল্য বোধ করিতে সক্ষম না হইয়া থাকি, তাহা হইলে মা বৃথা এতদিন আপনার শ্রীচরণ ধ্যান করিলাম।”

করুণাময়ী বলিলেন,—“তুমি একজন উচ্চ শিক্ষিত—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এই সামান্য সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিয়া প্রশংসা লাভ না করিতে পারিলে, তোমার পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা হইত।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“উচ্চশিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি—বড়ই ঘৃণিত পরিচয়। জীবনের বহুমূল্য সময় বড়ই বৃথা কার্য্যে অপব্যয়িত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পরীক্ষায় শিক্ষা কিছুই হয় নাই; কেবল পণ্ড-শ্রম হইয়াছে মাত্র। শুভক্ষণে, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অশেষ পুণ্যফলে আপনার ন্যায় কৃপাময়ী মার চরণে স্থান লাভ করিয়াছি। শিক্ষা যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা আপনারই কৃপায় লাভ করিয়াছি। জ্ঞান যদি কিছু অর্জ্জন করিয়া থাকি, তাহা আপনারই অমূল্য উপদেশে প্রাপ্ত হইয়াছি। উচ্চশিক্ষা, উচ্চাভিমান রসাতলে যাউক্, প্রশংসা বা নিন্দা চারিদিকে যাহা হয় ঘোষিত হউক, কিছুতেই আর ক্ষতি বৃদ্ধি অনুভব করি না। আপনার কৃপা—আপনার উপদেশ—আপনার প্রদত্ত জ্ঞান যেন আমার আজীবন সঙ্গ ত্যাগ না করে।”

করুণাময়ী বলিলেন,—"তথাপি যে কার্য্য অবলম্বন করা যায়, তাহাতে প্রশংসালাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রশংসা লাভ করিয়া স্ফীত বা বিচলিত হওয়া মূঢ়ের কার্য্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যে প্রশংসা লাভ করিতে না পারা গৌরবের কথা নহে। প্রশংসা বা নিন্দা উভয়কেই তুল্যজ্ঞান করিয়া এবং প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা মাত্র পরিশূন্য হইয়া কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। কিন্তু পরিণামে সে কার্য্যের জন্য প্রশংসা লাভ করিতে না পারাও বড় লজ্জার কথা। এমন কার্য্যও হইতে পারে, যাহার উদ্দেশ্য ও মর্ম্ম সর্ব্বসাধারণে প্রণিধান করিতে অক্ষম। তাদৃশ কার্য্যবিশেষে হয় ত ভয়ানক নিন্দাই কর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই; কেন না, তখন না হইলেও হয় ত অচিরে বা বহুকাল পরে অবশ্যই লোকে সে কার্য্যের মর্ম্ম ও লক্ষ্য প্রণিধান করিতে সক্ষম হইবে এবং নিশ্চয়ই প্রশংসার বৃষ্টিধারা কর্ম্মকর্ত্তার শিরে বর্ষণ করিতে থাকিবে। ফলতঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধু হইলে কার্য্যের পুরস্কার প্রশংসা হইবে। সম্প্রতি এই পুস্তকে তোমার কার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা প্রচারিত হইয়াছে; তুমি তাহা পাঠ কর।"

মহারাণী করুণাময়ী সেই প্রকাণ্ড ইংরাজি পুস্তকখানি জীবনকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিলেন। সেখানি বঙ্গদেশীয়

শাসন বিবরণী (Administration Report of Bengal) যে স্থান অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া মহারাণী পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। জীবনকৃষ্ণ নির্দ্দিষ্ট স্থান পাঠ করিতে লাগিলেন। সে স্থানে যে যে কথা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—বঙ্গদেশের ভূস্বামীগণের মধ্যে চন্দ্রমালার রাজবংশই প্রধান ও প্রথম উল্লেখযোগ্য। এই বিস্তীর্ণ সম্পত্তির অধিশ্বরী মহারাণী করুণাময়ী দেবী পৃথিবীর মধ্যে স্মরণীয়া মহিলা! দান ও পরোপকার তাঁহার অবিরত ব্রত। তাহার আয় অন্যূন দশ লক্ষ টাকা। এই টাকার প্রায় সকলই পরোপকারে, সাধারণের হিতকর কার্য্যে ও দরিদ্রসেবায় ব্যয়িত হয়। মহারাণী ইংরাজী, সংস্কৃত প্রভৃতি অনেক ভাষায় বিদ্যাবতী এবং একান্ত ধর্ম্মশীলা। দুঃখের বিষয় তিনি অবিবাহিতা; কিন্তু এখনও তিনি বিবাহযোগ্য বয়স অতিক্রম করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী ও আইনজ্ঞ জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার দেওয়ান। জীবনকৃষ্ণ বাবু কর্ম্মিষ্ঠ, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এই রাজবংশের প্রধান ও বিশেষত্ব এই যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোনরূপ মোকদ্দমাতেই ইঁহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় না; অথচ বিনা অত্যাচারে সুশৃঙ্খলার সহিত ইঁহাদের সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হয়। এই সম্পত্তির মূল্য প্রায় পাঁচ কোটী টাকা হইবে।”

পাঠ করিয়া জীবনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন,—"অনেক কথাই ভুল। সম্পত্তির মূল্যাবধারণা বড়ই হাস্য-জনক।"

করুণাময়ী বলিলেন, "তাহার পরের অংশটুকুও পাঠ কর।"

জীবনকৃষ্ণ পাঠ করিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—"ইহার পরেই সোনাপুর সম্পত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ যোগ্য। এই সম্পত্তির বর্ত্তমান অধিকারী রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুরের অতীত ইতিহাস বড়ই বিস্ময়াবহ। ইনি এক জন সুশীল, বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ। রায় হরকুমার বাহাদুর পূর্ব্বেও এই সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিতেন, মধ্যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কার্য্য ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; এক্ষণে তাহাকে বাধ্য হইয়া পুনরায় কার্য্য-ভার গ্রহণ করিতে হইতেছে। তিনি এরূপ বিষয়কর্ম্ম পরিচালনা কার্য্যে বোধ হয় অদ্বিতীয় ব্যক্তি। যেরূপে এই বিষয় বর্ত্তমান অধিকারীর হস্তগত হইয়াছে তাহা উপন্যাসে বর্ণনোপযোগী। হস্তান্তরিত হওয়ায় এই বিষ-য়ের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সুদক্ষ অধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষ বিশেষ যত্নে প্রায় সমস্ত বিষয় সুস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সম্পত্তির মূল্য প্রায় চারিকোটী টাকা, উল্লিখিত দুই ষ্টেট বঙ্গদেশে আদর্শ।"

পাঠ করিয়া জীবনকৃষ্ণ পুস্তকখানি যথাস্থানে স্থাপন

করিলেন এবং বলিলেন,—"এই দুই আদর্শ ষ্টেটে মোকদ্দমা হওয়া লজ্জার কথা। কিন্তু উপায় কি ?"

করুণাময়ী বলিলেন—"আমি তোমাকে এই কথার জন্যই এ পুস্তক পাঠ করিতে দিয়াছিলাম। হরকুমার বাহাদুরের ন্যায় বিচক্ষণ লোক ন্যায় ও যুক্তির কেন অবমাননা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন—"আমার প্রতি মহারাণী মাতার আর কোন আদেশ আছে কি ?"

করুণাময়ী বলিলেন—"না।"

বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া জীবন বাবু প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাস্নান।

মহারাণী করুণাময়ী গঙ্গাস্নানে যাইবেন। চন্দ্রমালা নগর হইতে আজিমগঞ্জের গঙ্গার ঘাট প্রায় কুড়ি ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সেই ঘাটেই মহারাণী স্নান করিতেন। যে দিন গঙ্গাস্নানে যাইতেন, সে দিন এই সুদীর্ঘ পথের উভয় পার্শ্ব দীন ও দরিদ্র ব্যক্তিগণে পরিপূর্ণ হইত। মহারাণী বলশালী ও বৃহৎকায় অশ্বদ্বয়বাহিত সুরম্য যানে আসীন থাকিতেন; সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার পরম প্রিয় দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ ও অন্যান্য লোকেরা স্বতন্ত্র যানে গমন করিতেন। মহারাণীর সঙ্গে এক যানে তাঁহার পরিচারিকা থাকিত। আর এক যানের চতুর্দ্দিকে অশ্বপৃষ্ঠে অস্ত্রধারী চারিজন রক্ষী যাইত; তাহাতে এক জন বিশ্বস্ত রাজ-কর্ম্মচারী রাশি রাশি সিকি, দুয়ানি, আধুলি ও টাকা লইয়া বসিয়া থাকিত এবং গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে—উভয় হস্তে সেই ধন-রাশি অনবরত বিতরণ করিত; অনেকক্ষণ ধন-বিতরণ করিয়া সেই কর্ম্মচারীরা কাতর হইয়া পড়িলে, স্বতন্ত্র যান হইতে আর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিত। মহারাণী দুই তিন দিন

গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। কখন কখন বহরমপুর হইতে মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। পুলিস প্রহরীগণ ও একজন উচ্চ কর্ম্মচারী শান্তিরক্ষার নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটের নিকট ছাউনি করিত। ঘাটের ধারে যে কয় দিন মহারাণী অবস্থান করিতেন সে কয় দিন নিরন্তর অন্ন বিতরণ করা হইত। নানা দিগ্দেশাগত ব্যক্তিগণ উদর পূরিয়া বিবিধ উপচারে আহার করিত। তাহার পর শীতকাল হইলে সমাগত দুঃখিগণকে এক একখানি কম্বল প্রদত্ত হইত; অন্য ঋতুতে সকলকে এক এক খণ্ড বস্ত্র প্রদত্ত হইত। মহারাণী গঙ্গাতীরে একটী ক্ষুদ্র বস্ত্রাবাসে অবস্থান করিতেন। আরও কয়েকটী নাতি-বৃহৎ বস্ত্রাবাসে মহারাণীর সঙ্গী ও অনুযাত্রিকগণ বাস করিতেন।

গঙ্গাস্নান যাত্রার তিন চারি দিবস পূর্ব্বে ঢোল বাজাইয়া এই সংবাদ চারিদিকে ঘোষিত হইত। বহু দূরের পথ অতিক্রম করিয়াও কাতর, রুগ্ন, অন্নহীন ব্যক্তিগণ পথপার্শ্বে অপেক্ষা করিত। বীরভূম ও মুরশিদাবাদ উভয় জেলার মধ্য দিয়াই মহারাণীকে যাইতে হইত। উভয় জেলার মাজিষ্ট্রেট মহাশয়েরা পথের শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা করিতেন। দুই জেলাতেই সে সময়ে একটা ভয়ানক জনতা ও উৎসাহ উপস্থিত হইত

কখন কখন স্থানে স্থানে পথের ও গঙ্গাতীরে লোক-সমাগমের ফটোগ্রাফ লইবার জন্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ ফটোব্যবসায়ীরা যন্ত্রাদিসহ লোক প্রেরণ করিতেন। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার সাহেব কখন কখন এই ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত মুরশিদাবাদের সীমায় অপেক্ষা করিতেন এবং মহারাণীর যানাদি উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে আন্তরিক সম্মান বিজ্ঞাপিত করিয়া স্বকীয় শকট মহারাণীর শকটাদির সহিত চালাইতেন। একবার বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত সাঁইথিয়া ষ্টেসনে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যথাকালে মহারাণী লোকজন যানাদিসহ তাহার নিকটস্থ পথে উপস্থিত হইলে, তিনি স্বয়ং মহারাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকারে ঐ অতুলনীয়া মহিলাকে সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং সানুনয়ে তাঁহাকে কিয়ৎকাল মাত্র অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। মহারাণীর আজ্ঞায় গমন নিরুদ্ধ হইলে, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তাঁহার সহিত অতি অল্পকাল মাত্র বাক্যালাপ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। সেই স্বল্পকালে বিচক্ষণ গবর্ণর সাহেব করুণাময়ীর অলোক-সামান্য রূপ, অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধি এবং ইংরাজি ভাষায় বাক্য কথনে তাঁহার অত্যদ্ভূত নিপুণতা প্রভৃতি দর্শনে বিমোহিত হন। তিনি স্বকীয় শাসনলিপিতে এই

ব্যাপার বিশেষরূপে লিখিয়া রাখেন। তদবধি প্রত্যেক লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আপনার শাসনকালে অন্ততঃ একবার চন্দ্রমালায় আসিয়া এই মহীয়সী মহিলার সহিত পরিচয় ও কথোপকথন করিতেন। বিভাগীয় কমিশনার বর্ষে একবার করিয়া এই মহিমান্বিতা মহারাণীকে দর্শন ও তাঁহার সহিত নানা বিষয় কথোপকথন করিয়া এবং বিষয়বিশেষে তাঁহার পরামর্শ ও অভিপ্রায় জানিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতেন।

নিয়মিত ব্যবস্থা সমস্ত সুস্থির হইলে মহারাণী করুণা-ময়ী গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। রাজপথের উভয় পার্শ্ব লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পাছে কাহারও আঘাত লাগে ও কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় মহারাণীর যানসমূহ ধীরে ও সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। যথাস্থান হইতে বর্ষার বারিধারার ন্যায় ভারতেশ্বরীর মূর্ত্তি নামাঙ্কিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রজতখণ্ড-সমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। উভয় পার্শ্বের লোকেরা "জয় মহারাণীর জয়, জয় মা করুণাময়ীর জয়!" ইত্যাদি রবে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাণীকে দেবী বলিয়াই অনেকের ধারণা ছিল। এজন্য বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিবার মানসে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ভূলুণ্ঠিত

হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং এই নরদেহে সাক্ষাৎ দেবদর্শন ও তজ্জনিত অশেষ পুণ্য সঞ্চিত হইল ভাবিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল।

জনতায় ও লোকের ব্যস্ততায় কোন দুর্ঘটনা না ঘটে, এই জন্য পুলিসকর্ম্মচারীগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে নানারূপ সুব্যবস্থা করিল। মহারাণীর যান ও লোকজন সেই দিন সন্ধ্যাকালে আজিমগঞ্জে উপনীত হইল।

মহারাণীর সঙ্গের লোকজন এবং যান অশ্বাদি থাকিবার উপযুক্ত পটমণ্ডপাদি পূর্ব্বেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাত্রি স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। পর দিন প্রাতে ভূরি ভোজনের ও বস্ত্র বিতরণের আয়োজন আরব্ধ হইল। বেলা এগারটার পর হইতে ভোজনব্যাপার চলিতে লাগিল। প্রায় একশত বিঘা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভূমি চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তাহারই মধ্যে দলে দলে লোক আসিয়া উত্তম অন্ন, বিবিধ ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, পায়স ও পিষ্টকাদি ভোজন করিয়া এবং ভোজনান্তে বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। প্রথম দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিল ও বস্ত্র পাইল। দ্বিতীয় দিবসে ভোজনার্থীর সংখ্যা লক্ষের নিকটস্থ হইল; তৃতীয় দিবস লক্ষ লোকপূর্ণ হইল। তিন দিনে দুই লক্ষাধিক লোক ভোজন করিল

ও বস্ত্র পাইল। স্বয়ং জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একজন ইনস্পেক্টর, দুইজন সব ইন-স্পেক্টর, দশজন জমাদার ও পঞ্চাশজন কনষ্টবল শান্তিরক্ষার নিমিত্ত, সেই ক্ষেত্রে তিন দিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শাসনবিভাগের এই সকল সুব্যবস্থার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কেন না, মহারাণী ও তাঁহার দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ এই কাণ্ড সুনির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত এতই সাবধানতা অবলম্বন করিতেন এবং এরূপ লোকবল প্রয়োগ করিতেন যে, ইহাতে কখনই কোন দুর্ঘটনা ঘটিত না বা কোন ভোজনার্থীরই অনুমাত্র ক্লেশ বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না।

এই ব্যাপারের দ্বিতীয় দিবসে, সমস্ত দিনের ভয়ানক পরিশ্রমের পর, রাত্রি আটটার সময়, নিতান্ত ক্লান্ত-শরীরে দেওয়ান জীবকৃষ্ণ আপনার তাম্বুতে একখানি খাটিয়ার উপর পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটী লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোকটীর কি উদ্দেশ্য?"

ভৃত্য উত্তর দিল,—"তাহা সে বলে নাই; তাহার বক্তব্য অনেক ও প্রয়োজনীয়। সে তাহা স্বয়ং মহা-রাণীর নিকট ব্যক্ত করিতে চাহে। মহারাণী মার

সহিত আজি দেখা হওয়ার কোন উপায় নাই বুঝিয়া সে আপনার সহিত দেখা করিবার প্রার্থনা করিতেছে।”

জীবনকৃষ্ণ একটু চিন্তার পর বলিলেন,—“তাহাকে লইয়া আইস।”

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে মাথায় চাদর-বাধা, পাতলা মলমলের পাঞ্জাবী জামায় আবৃতদেহ, সূক্ষ্ম বস্ত্রধারী, এক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। জীবনকৃষ্ণ তাহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনার প্রয়োজন কি প্রকাশ করুন। আমরা আজি নিতান্ত ক্লান্ত আছি।”

আগন্তুক আর একখানি খাটিয়ার উপর উপবেশন করিয়া বলিল,--আমার নাম হরিচরণ দাস। আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল বাবুর, পরে বিধুমুখীর দেওয়ান ছিলাম।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“খবরের কাগজ পড়িয়া আমরা আপনার সহিত রাজা উমাশঙ্করের মোকদ্দমা এবং শ্যামলাল ও বিধুমুখীর বৃত্তান্ত অনেক জানিয়াছি। পূর্ব্বেও বিষয়কর্ম্মসূত্রে আপনাকে জানিতাম। আপনাকে রাজদণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল না?”

হরিচরণ বলিল,—“আজ্ঞা হাঁ। অন্যায় বিচারে আমার তিন বৎসর জেল হইয়াছিল। আমি দুই সপ্তাহ হইল খালাস হইয়াছি।”

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন ?"

হরিচরণ বলিল,—"উমাশঙ্করের সহিত আপনাদের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সেই মোকদ্দমায় যাহাতে আপনারা জয়ী হন, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতে পারি।"

"কিরূপে ?"

"বিধুমুখী যদি আপনাদের পক্ষে যোগ দেয়, তাহা হইলে মোকদ্দমায় কেহই আপনাদের হারাইতে পারিবে না।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"বিধুমুখী আমাদের পক্ষে যোগ দিবে কেন ?"

হরিচরণ বলিল,—"আমি মনে করিলে তাহাকে যোগ দেওয়াইতে পারি।"

"তবে আপনার মোকদ্দমার সময় সে আপনার বিপক্ষে স্বাক্ষী দিয়াছিল কেন ?"

হরিচরণ বলিল,—"তখন যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা নাই।"

"এখন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে ?"

"এখন বিধুমুখী আমার হাতে। আমি তাহার দ্বারা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলাইতে পারি।"

জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কোথায় থাকেন ?"

হরিচরণ বলিল,—“আমি সম্প্রতি বালুচরে আছি।”

“বিধুমুখী কোথায় আছেন?”

“সেও বালুচরেই আছে।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“আপনার প্রস্তাবের কোন উত্তরই আমি এখন দিতে পারি না। মহারাণী মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কল্য এই সময়ে আপনার কথার উত্তর দিতে পারি। আপাততঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এরূপ সাহায্য করায় আপনার লাভ কি?”

হরিচরণ বলিল,—“আমার লাভ অনেক, অনেক লাভের সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা, তাহা হয় আমাদের হইবে, না হয় রাজা উমাশঙ্করের হইবে। বিধুমুখীর সাহায্যে যদি তাহা আমরা পাই, তাহা হইলে আপনার বা বিধুমুখীর কি লাভ হইবে তাহা তো আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।”

হরিচরণ বলিল,—“প্রথম লাভ উমাশঙ্করের ক্ষতি হইবে; দ্বিতীয় লাভ, হরকুমারের দর্পচূর্ণ হইবে। সে যাহা ধরে আর যাহা করে তাহাতেই জিতিয়া ফিরে ও বাহবা পায়, ইহা আমার অসহ্য। তৃতীয় লাভ আপনারা পরমধার্ম্মিক, আপনারা কি এত বড় বিষয়টা হাত ছাড়া না হওয়ার দরুণ আমাকে কিছু দিবেন না?”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—“আপনার অভিপ্রায় কতকটা বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু মহারাণী মা যে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, তাহা আমার কিছুতেই মনে হয় না। সুতরাং আপনাকে আমি এখনই জবাব দিতে পারি। কিন্তু যদি আপনি মহারাণী মার অভিপ্রায় জানিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে আপনাকে কল্য একবার ঠিক এইরূপ সময়ে আসিতে হইবে।”

হরিচরণ বলিল,—“তাহাই হইবে। মহারাণীর অভিপ্রায় জানাই আমার আবশ্যক। মহারাণী এ কথা শুনিলে ঠিক বুঝিতে পারিবেন। আপনি মনে করিতে-ছেন, ইহার মধ্যে কোন অধর্ম্ম আছে। এত বড় ষ্টেটের আপনি দেওয়ান—আমরাও প্রায় এইরূপ ষ্টেটের দেওয়ানি করিয়াছি। দেওয়ানি করিতে হইলে অনেক বুদ্ধিখরচ করিতে হয়। যাহার বিষয়, সে ঠিক বুঝিবে—চাকর বাকর গোল কমাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হয়। যাই হউক, আমি আজি যাই। কালি ঠিক এই সময়ে আসিব। আপনি মহারাণীর অভিপ্রায় জানিয়া রাখি-বেন। সম্ভব হইলে আমার সহিত একবার তাঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন।”

হরিচরণ প্রস্থান করিল। অনতিকাল মধ্যে জীবন-কৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া মহারাণীর বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করি-লেন এবং হরিচরণের সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবে-

দন করিলেন। করুণাময়ী অতিশয় মনোযোগের সহিত সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"হরিচরণ পুনরায় তোমার নিকট না আসিতেও পারে। যদি সে আইসে, তাহা হইলে কল্য তাহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। সে কোথায় থাকে, জানিতে পারা আমার বিশেষ প্রয়োজন। অতএব কল্য প্রাতে এই বিষয়ের সন্ধান করিবার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোককে ভার দিবে।"

অন্যান্য নানা কথার পর জীবনকৃষ্ণ ভক্তি সহকারে মহারাণীকে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অন্নপূর্ণা।

চতুর্থ খণ্ড—মহাপুরুষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মরণাপন্ন।

হরকুমারের অবস্থা বড়ই মন্দ। তাঁহার দেহের নানা স্থান ছুরির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত এবং লাঠির আঘাতে বিচূর্ণ। তিনি মরণাপন্ন।

বিধুমুখীর সেই শূন্য ভবন এখন জনপূর্ণ; ভবসুন্দরীর সেই ক্ষুদ্র ভবন, সপরিবার রামচন্দ্রের আগমনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; এখন তথায় পা বাড়াইবারও স্থান নাই বলিলে হয়। রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর ভবসুন্দরীর প্রেরিত লোকমুখে রায় বাহাদুর সম্বন্ধে এই দুঃসংবাদ শুনিবামাত্র পরদিন প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে রাণী অন্নপূর্ণা, রাজভগ্নী সুহাসিনীও আসিয়াছেন। সুতরাং খোকারাজাকেও আসিতে হইয়াছে। আর আসিয়াছেন, দুইজন বিচক্ষণ ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, এবং বহুসংখ্যক দাসদাসী, শরীররক্ষক ও অনুযাত্রিক লোকজন।

রায় হরকুমার বাহাদুরের দেহ, বিধুমুখীর ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ঘরটী প্রশস্ত ও শুষ্ক এবং পাকা; এই জন্য সেই স্থানই রোগীর জন্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত

হইয়াছে। অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী পীড়িতের উভয় পার্শ্বে নিরন্তর বসিয়া আছেন; এবং রাজা তাঁহার শয্যানিয়ে অদূরে ভূতলে উপবিষ্ট।

ডাক্তারেরা বার বার রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; যখন যে ঔষধের প্রয়োজন তখনই তাহা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে; ক্ষতসমূহ যথাসময়ে পরিষ্কৃত করিয়া ঔষধাদি সহ বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে; রাণী ও সুহাসিনী রোগীকে যথারীতি পথ্য ও ঔষধ সন্তর্পণে সেবন করাইতেছেন। রাণী ও রাজভগ্নী লোকসমক্ষে অন্তরালে গমনের প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়াছেন; লজ্জাজনিত স্বভাবসিদ্ধ সঙ্কোচ তাঁহাদিগকে এখন ত্যাগ করিয়াছে। সকলেরই লোচন জলভারাকুল; সকলেরই বদন নিদারুণ চিন্তায় অবসন্ন।

খোকারাজাকে রাণী আর বড় দেখিতে পান না; তাহার পিসীমাও তাহাকে আর কোলে লইয়া আদর করিবার সময় পান না; রাজাও তাহাকে প্রিয়সম্ভাষণ করিবার অবসর খুঁজিয়া পান না। সকলেই সম্মুখস্থ মৃতকল্প সুহৃদের যথাসাধ্য শুশ্রূষা ব্যতীত, আর কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

বিধুমুখীর বাটীতে গভীর রাত্রিতে ডাকাইত পড়িয়াছিল, ইহাই চারিদিকে প্রচার। কিন্তু ডাকাইত তো মানুষ লইয়া পলায় না; এ ডাকাইতরা বিধুমুখীকে

লইয়া গেল কেন? স্বয়ং পুলিস সাহেব রাজার পত্র পাইয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন। দারোগা জমাদার অনেকে আসিয়াছিলেন। বিধুমুখীর কি হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিল, কি কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে, পুলিস সবিশেষ যত্নে তাহার সন্ধান করিতেছেন এবং এই ঘোর অত্যাচারের কর্ত্তৃগণকে ধরিবার নিমিত্ত অপরিসীম আয়াস স্বীকার করিতেছেন।

কিরূপে কি হইল, তাহার সংবাদও ভাল করিয়া পাওয়া গেল না। বিধুর মার জবানবন্দী পুলিস লিখিয়া লইয়াছে। তাহারই কথায় মোটামুটী একটা বুঝা যায় মাত্র। তাহার কথায় প্রকাশ পায় যে, ঘটনার রাত্রিতে প্রায় দশটা পর্য্যন্ত রায়বাহাদুর দাদা, তাহার সহিত ও তাহার মা ঠাকুরাণী অর্থাৎ বিধুমুখীর সহিত নানা বিষয়ের নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহেন। তাহার পর তিনি চলিয়া গেলে, সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সে ও বিধুমুখী শয়নের উদ্যোগ করে। বড় গ্রীষ্ম, এজন্য তাহারা ঘরের মধ্যে না শুইয়া বারান্দাতেই শয়ন করিয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল; তাহার মা ঠাকুরাণীও কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার মা ঠাকুরাণীর একটা কাতর চীৎকার শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। সে চক্ষু মেলিবামাত্র কয়েকজন বিকট পুরুষ তাহার মুখ

চাপিয়া ধরে ও তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দেয়। তাহার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং সে কষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার চক্ষু খোলা ছিল। সে দেখিতে পায়, দশজন ভয়ানক আকারের লোক, বারান্দার উপরে আছে; তিনজন তাহার নিকট তাহাকে ধরিয়া আছে, দুইজন দুইটা জ্বলন্ত মসাল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর বাকী কয়জন মা ঠাকুরাণীর কাছে উপস্থিত। তাহাদের সঙ্গে জামা গায়ে দেওয়া, জুতা পায়ে দেওয়া, বাবুমত একটা লোক ছিল। সে লোকটা একটা শিশি হাতে করিয়া বিধুমুখীর নাকের কাছে ধরিয়াছিল। বিধুমুখী ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মত চাড়া দিয়া উঠিতেছিলেন; আর যেন অজ্ঞান হইয়া পরিয়াছিলেন।

এইরূপ সময়ে বাহির হইতে রায়বাহাদুর দাদার আওয়াজ সে শুনিতে পায়। রায়বাহাদুর বলিতেছেন, —"বিধুর মা, এত আলো কেন? কি হইয়াছে?" কিন্তু তাঁহাকে উত্তর দেয় কে? বিধুর মা সেই কথা শুনিয়া একবার উঠিবার চেষ্টা করে। তাহাতে ডাকাইতরা তাহাকে ভয়ানক প্রহার করে। তাহার পর, সেই বাবুটার হুকুমে, চারিজন লোক দরজা খুলিয়া ফেলে। সেখানে রায়বাহাদুরের সহিত তাহাদের খুব মারামারি হইতেছে, লাঠির শব্দে তাহার এইরূপ মনে হয়। তাহার পর সে চারিজন লোক ফিরিয়া আসিয়া বলে,—"যাহাকে

জব্দ করা তোমার দরকার, তাহাকে একবারে নিকাশ করিয়া দিয়াছি।” বাবুটা বলে,—“বেশ করিয়াছ। এখন এই মেয়েমানুষটাকে জুৎ করিয়া লইয়া চল।” ঘরের মধ্য হইতে একখানি কম্বল আনিয়া তাহাতেই বিধুমুখীকে জড়াইয়া লয় এবং তাঁহাকে চারিজনে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া যায়। যাইবার সময় বাকী লোকগুলা বিধুর মার পা ধরিয়া টানিতে টানিতে প্রাচীরের নিকট ফুলগাছ তলায় ফেলিয়া রাখিয়া যায়।

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া পুলিস সাহেব অনুমান করিয়াছেন, সেই বাবুটা হরিচরণ হওয়াই সম্ভব। সে নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম্ম দিয়া বিধুমুখীকে অজ্ঞান করিয়াছে। তাহারা বিধুমুখীকে লইয়া নিশ্চয়ই নৌকাপথে চলিয়া গিয়াছে। এ ব্যাপারের সহজেই কিনারা হইবে এবং বিধুমুখী যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। “কেন না, হরিচরণ কখনই লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। সে যে যে স্থানে ঘুরিবে ফিরিবে পুলিস তাহার সন্ধান রাখিতে বাধ্য।”

পুলিসের লোকেরা কর্ত্তব্য সমাপনের চেষ্টায় ফিরিতেছে। তাহাদের প্রদত্ত রিপোর্ট মতে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ইচ্ছানুসারে, সদর হইতে ডাক্তার সাহেব হরকুমার বাহাদুরকে চতুর্থ দিবসে দেখিতে আসিলেন। তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া ও যে দুই ডাক্তার

চিকিৎসা করিতেছেন, তাঁহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া স্থির করিলেন, রোগীর জীবনের কোনই আশা নাই। তিনি সদরে ফিরিয়া গিয়া সেই মর্ম্মে রিপোর্ট করিলে. পরদিন প্রাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আহত রায়বাহাদুরের মরণকালীন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিকিৎসকেরা আজি হরকুমার বাহাদুরের জীবনের আশা এককালেই ত্যাগ করিয়াছেন। এ পাঁচ দিন তাঁহাদের মনে একটু একটু আশা ছিল; কিন্তু আজি প্রাতঃকালে তাঁহাদের আর কোনই আশা নাই এবং আজিই অপরাহ্নে এই মহদ্ব্যক্তির জীবলীলা চিরদিনের নিমিত্ত সাঙ্গ হইবে, ইহা তাঁহারা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিয়াছেন। ভিতরের ভাব যাহাই হউক, রোগীর বাহিরের ভাব আজি অনেক ভাল। তিনি এ কয়দিন সংজ্ঞাশূন্য ও নির্ব্বাক ছিলেন। গত শেষরাত্রি হইতেই তাঁহার সংজ্ঞা হইয়াছে; এবং তিনি ধীরে ধীরে কথা কহিতেছেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণা মনে মনে প্রসন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে অনেক আশা করিতেছেন। ডাক্তারেরা এ সকল লক্ষণ শুভ বলিয়া মনে করিতেছেন না এবং যতই বেলা বাড়িতেছে, ততই রোগীর শেষকাল নিকটস্থ হইতেছে বলিয়া স্থির করিতেছেন।

বেলা ৮৷৷ টার সময় মাজিষ্ট্রেট রোগীর জবানবন্দী স্বহস্তে লিখিয়া লইলেন। রায়বাহাদুরের সে উক্তি হইতে সে রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনা আলোকিত করিবার কোনই সূত্র পাওয়া গেল না। নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ ধ্বনি শুনিয়া তিনি ভবর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে একাকী লাঠি-হস্তে বিধুমুখীর দ্বারে উপস্থিত হন। দেখিতে পান বাটীর ভিতরে অনেক আলো জ্বলিতেছে। সদর দরজা বন্ধ, এজন্য ভিতরে যাইতে না পাইয়া তিনি বাহির হইতে চীৎকার করিতে থাকেন। কিয়ৎকাল পরে, কয়েকজন বিকটকায় লোক দরজা খুলিয়া বাহির হয় এবং কোন প্রকার কথাবার্ত্তার পূর্ব্বেই তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ড লাঠির আঘাত করে। সেই আঘাতেই তিনি প্রায় অজ্ঞান হন; তথাপি নিজের হস্তস্থিত লাঠির দ্বারা দুই এক ঘা মারিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক লাঠি ও ছুরির আঘাতে অবসন্ন হইয়া তিনি ধরাশায়ী হন ও তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লোকগুলার কাহাকেও তিনি চিনিতে পারেন নাই; কাহারও নাম তিনি জানেন না। তাহার পর কি হইল, তাহাও তিনি বলিতে পারেন না।

রায় বাহাদুরের যখন এই অবস্থা এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন তাঁহার শেষ জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছেন, সেই সময়ে ভবসুন্দরীর বাটীর মধ্যে অঙ্গনে দাঁড়াইয়া একটী পুরুষ ও নারী কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই

আমাদের পরিচিত। পুরুষ রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারী তাঁহারই পত্নী।

রামচন্দ্র বলিলেন,—"ভাগ্যে হাজার টাকাটা সেই দিনই লওয়া হইয়াছিল, তাই ত রক্ষা। নহিলে আজি তো লোকটা মরিতে বসিয়াছে, আমাদের আর কে টাকা দিত।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কিন্তু আসল কাজের যে কিছুই করিয়া লইতে পার নাই ভেড়াকান্ত। মাসে মাসে কুড়ি টাকা দিবে বলিয়াছিল, সেটা যদি সেই সময়ে পাকা করিয়া লইতে পারিতে, তবেই তো কাজ হইত।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা আমি কি জানি যে, সেই রাত্রিতেই লোকটার এত দুর্গতি হইবে, তাহা হইলে তখনই যাহা হয় করিয়া লইতাম।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তুমি নিতান্ত আহাম্মক তাই এ কথা বলিতেছ। মানুষের শরীর, কখন কি হয়, তাহা কে বলিতে পারে? কোন্ বুদ্ধিতে যে তুমি মোক্তারি কর তাহা আমি বলিতে পারি না। শুভ কাজ সঙ্গে সঙ্গে শেষ করিতে হয়। এখন দেখ দেখি, তোমার বেকুবিতে আসল কাজটাই নষ্ট হইয়া গেল।"

অনেককেই এরূপ ক্ষেত্রে যাহা করিতে হয়, আমাদের মোক্তার রামচন্দ্রকেও তাহাই করিতে হইল। অর্থাৎ তিনি প্রাণপণে মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। সংসারে

যতই কৃতিত্ব থাকুক না কেন, পত্নীর নিকট অনেককেই বোকা বনিয়া যাইতে হয় এবং হারি মানিয়া মাথা চুলকা-ইতে হয়। নিতান্ত অধোবদনে নিরুত্তর না থাকিয়া রামচন্দ্র বলিলেন,—"তা পাকা করিয়া লইলেই বা কি হইত? আমি যদি কর্ম্মে অপারগ হই বা মরিয়া যাই, তবেই তো মাসে কুড়ি টাকা হিসাবে দিবে বলিয়াছিল। তা আমিতো এখন কর্ম্মে অক্ষম হই নাই; আর এখনই মরিয়া যাইব, এমন সম্ভাবনাও কিছু দেখিতেছি না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কে বলিতে পারে তুমি যে কালিই মরিয়া যাইবে না, এমন কথা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না। তখন আমাদের ভাঁড় হাতে করিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে। আর তোমার কাজ করা—তার কপালে আগুন। সমস্ত মাস হাঁটাহাঁটী করিয়াও কুড়ি টাকা ঘরে আনিতে পার না। আমি যেই মেয়ে, তাই তোমার সংসার চলে,—দু বেলা দু মুঠা ভাত খাইয়া সকলে বাঁচিয়া আছে।"

রামচন্দ্রের সকল কৃতিত্ব এক কথায় উড়িয়া গেল। অনেক সবজজ, অনেক উকীল, অনেক রাজার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম ব্যবসাদার, অনেক দেশবিজয়ী গ্রন্থকার প্রভৃতি অনেকেরই কৃতিত্ব এইরূপ স্থানে এইরূপ এক কথায় উড়িয়া গিয়া থাকে। ক্ষুদ্র রামচন্দ্রের উড়িয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রামচন্দ্র বলিলেন,—

"তা তুমি যে লক্ষ্মী তাকি আমি জানি না। এখন মতলব কি বল? লোকটা তো মরে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার শেষ জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছেন। বোধ হয় আর বড় দেরী নাই। এখন তুমি কি করিতে বল?"

গৃহিণী বলিলেন,—"এখন তোমার সেই গুলিখোর ভাইকে গিয়া ধর। এই কথাটা হরকুমারের মুখ হইতে রাজার সম্মুখে যদি কোন উপায়ে সে বাহির করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলেও কতকটা উপায় হয়।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"চণ্ডী তো ভোর হইতে কেমন পাগলের মত হইয়া বসিয়া আছে। তাহাকে বলিয়া কোন কাজ হইবে এরূপ বোধ হয় না। তথাপি তাহাকে বলিয়া দেখিতেছি।"

গৃহিণী বলিলেন,—"একটু ভাল করিয়া বলিও। নিজে না পার, আমার নিকট তাহাকে ডাকিয়া আন। যাও, আর দেরী করিও না। যদি লোকটা এখনই মরিয়া যায়। এক তিলও যেন দেরী না হয়।"

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরলোকাগত।

জবানবন্দী লওয়া শেষ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রস্থান করিলেন। ডাক্তারেরা আবার রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া রাজাকে একটু অন্তরে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"রায়বাহাদুর মহাশয়ের জীবন যে আর অধিকক্ষণ থাকিবে, এরূপ আশা নাই। অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সকলই ফুরাইবে।"

রাজা বলিলেন,—"উত্তম। ইহসংসারে খুড়ামহাশয় আমার পরম আত্মীয়। উঁহার তিরোধানের পর যে কয়দিন আমাকে সংসারে থাকিতে হইবে, সে কয়দিন আমার অনেক অসুবিধা হইবে; কিন্তু সুবিধা অসুবিধা উভয়ই তুল্য কথা। আর আমিই বা কত দিন? অনন্ত কালের তুলনায় দীর্ঘায়ু ব্যক্তির জীবনও ক্ষণিক বলিয়াই মনে হয়। সে কথা যাউক, আপনাদের বিদ্যায় ও শাস্ত্রে এরূপ রোগের প্রতিকারার্থ যত ব্যবস্থা আছে, তাহার কোনই ত্রুটি হয় নাই তো?"

ডাক্তার বলিলেন,—"কিছু না। অর্থদ্বারা, বিদ্যাবুদ্ধি

দ্বারা প্রতিকারের যত চেষ্টা করা যাইতে পারে, সকলই করা হইয়াছে।”

রাজা বলিলেন,—“বেশ কথা। আমরা কর্ত্তব্যের দাস। ফলাফল চিন্তা না করিয়া কর্ত্তব্যসাধন করাই আমাদের ধর্ম্ম।”

এই সময়ে হরকুমার ডাকিলেন,—“রাজা কোথায় ?”

রাজা ব্যস্ততাসহ পীড়িতের শয্যা সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হরকুমার বলিলেন,—“আমি এতক্ষণে বুঝিয়াছি, আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। একটা অননুভূত-পূর্ব্ব ব্যাপার আমি অনুভব করিতেছি। বোধ হই-তেছে, তাহাই মৃত্যু। তুমি আমার অপেক্ষাও জ্ঞানী ও ধর্ম্মজ্ঞ। তোমাকে আমার আর বলিবার ও শিখাইবার কিছুই নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখে থাক। মা সুহাস, মা অন্নপূর্ণা আমাকে বিদায় দেও।”

বাক্য শেষ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী মুখে কাপড় দিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন, রায় হরকুমার বাহাদুরের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায়। ভবও রোদনধ্বনিতে যোগ দিয়া কোলাহল বাড়াইয়া ফেলিল; বিষুর মাও কসুর করিল না। আর একটা স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিয়া রোগীর পদতলে আছড়াইয়া পরিয়া “বাবাগো” শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। সেই নারী দাসী।

ভবর চণ্ডীমণ্ডপে, তক্তপোষের উপর নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে, চণ্ডীচরণ একাকী বসিয়াছিলেন। আজি তাঁহার হাতে হুঁকা নাই; মুখেও গড়গড়ার নল নাই; প্রাতে তিনি যে এক তোলা আফিঙ্গ খাইয়া থাকেন, তাহাও আজি খাওয়া হয় নাই। উচ্চ ক্রন্দনের রোল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্ব্বে রামচন্দ্র তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং বলিলেন,—"ভায়া যেরূপ শুনা যাইতেছে. তাহাতে বুঝা যাইতেছে, রায়বাহাদুর শীঘ্রই মারা পড়িবেন।"

চণ্ডী কোন উত্তর দিলেন না। নীরবে সেই হৃদয়-বিদারক সংবাদ শ্রবণ করিলেন। রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"তাই বলিতেছিলাম কি, আমার বিষয়টা এই সময়ে তুমি যদি একটু পাকা করিয়া লইতে—

চণ্ডী তাঁহার কথা শুনিতেছেন না ও তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছেন না দেখিয়া রামচন্দ্র আবার বলিলেন,—"ভায়া, তোমাকে বড় অন্যমনস্ক দেখিতেছি। আমার বড় দরকারী কথাটা তুমি একটু মনোযোগ দিয়া শুনিলে ভাল হয়।"

তথাপি চণ্ডীচরণ নিরুত্তর। এই সময়ে বিধুমুখীর ঘর হইতে উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি আসিয়া চণ্ডীচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি প্রথমে বাণবিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর সহসা চলিয়া যাইতে

যাইতে বলিলেন,—"দাদা রাজবাটীর খাজাঞ্চির নিকট আমার আড়াইশ টাকা জমা আছে; তাহা লইয়া আপনার ছেলেদের দিবেন। আর রাজবাটীতে যে ঘরে আমার বাসা তাহাতে একটা ট্রঙ্কে শাল গরদ প্রভৃতি কয়েকখানি কাপড় আছে; তাহা আপনি লইয়া ব্যবহার করিবেন। আপনার অভাগা ভাই জন্মের মত আপনাকে শেষ প্রণাম করিতেছে। বউদিদিকে আমার প্রণাম জানাইবেন, ছেলে মেয়েদের আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি।"

চণ্ডী প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, রামচন্দ্র বলিলেন,—"তুমি যাও কোথা?"

বলিল,—"যাই কোথা? এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ দাদা? হরকুমার দাদার মৃত্যুর পর আমি কি আর মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি দাদা?"

রামচন্দ্র উঠিয়া চণ্ডীচরণকে উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তিনি মনে করিলেন, হতভাগা চণ্ডীচরণ মরিয়া গেলে, বিশেষ ক্ষতি নাই; বরং আপাততঃ আড়াইশ টাকা ও কিছু শালরুমাল লাভ হয়; কিন্তু সে বিষয়ের তো কোনই স্বাক্ষী নাই। চণ্ডীচরণ যে আমাকে সব দিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ কোথায়? এ কথাটা লিখাইয়া লইতে হইবে। বোধ হয়, চণ্ডী বাঁচিয়া থাকায় লাভ বেশী।

রাজার আদেশক্রমে ডাক্তারেরা পুনরায় পীড়িতের

নিকটস্থ হইলেন এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"হৃদ্-যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।"

সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণাকে সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজা দুই জন পরিচারিকাকে আহ্বান করিলেন, তাহারা আসিয়া উভয়কে উঠাইয়া বসাইল। সহসা সেই প্রকোষ্ঠ—যেন দিব্যালোকে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল। পার্শ্বস্থ দ্বারবিশেষের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। সকলে দেখিলেন, তাঁহাদের সকলের সম্মুখে, পীড়িতের মস্তক সন্নিধানে দীর্ঘকায় জ্যোতির্ম্ময় এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার মস্তকে বিশাল জটাভার, পৃষ্ঠে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বাহুমূলে এক ক্ষুদ্র ঝোলা, হস্তে এক কমণ্ডলু ও লোহার চিম্‌টা, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত, পরিধান কৌপীন ও বহির্ব্বাস।

রাজা উমাশঙ্কর কিয়ৎকালমাত্র সেই তেজঃপুঞ্জ-সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার চরণ সমীপে নিপতিত হইয়া বলিলেন,—"বাবা, এত দিন পরে এ অধম সন্তানকে আপনার মনে পড়িয়াছে? আজি আমাদের একান্ত শুভানুধ্যায়ী খুড়া মহাশয়ের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ শূন্য হইয়াছি। বড় অসময়েই আপনি আমাদিগকে দর্শন-দানে চরিতার্থ করিয়াছেন।"

এই সন্ন্যাসী উমাশঙ্করের গুরু, আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক, মহাপুরুষ ঘনানন্দ। ঘনানন্দের অন্য

কোন দিকে দৃষ্টি নাই; অন্য কোন বাক্যও তাঁহার কর্ণ-গোচর হইতেছে কি না সন্দেহ, তিনি অনন্যমনে সেই মৃত ব্যক্তির বদনের প্রতি চাহিয়া আছেন। কিয়ৎকাল পরে সেই তেজঃদীপ্ত মহাপুরুষ, কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ বারি লইয়া মৃত ব্যক্তির সর্ব্বশরীরে সিঞ্চন করিলেন, এবং ঝোলা হইতে একটা শ্বেতবর্ণ চূর্ণপদার্থ বাহির করিলেন এবং তাহার কিয়দংশ মৃতের মুখগহ্বরে সাব-ধানে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহার পর সেই চূর্ণ কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়প্রদেশে মর্দ্দন করিলেন। তাহার পর আর একটু চূর্ণ লইয়া মৃত ব্যক্তির ললাটে, চরণতলে ও করপল্লবে প্রলিপ্ত করিলেন। রোদন ও দীর্ঘনিশ্বাস স্তব্ধ হইল। সকলেই এই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের ক্রিয়া কলাপ দেখিবার নিমিত্ত নিরুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ঘনানন্দ সঙ্কেতে সকলকে নির্ব্বাক থাকিতে বলি-লেন। স্বয়ং নিঃশব্দে রোগীর পার্শ্বে পৃষ্ঠস্থিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার করিলেন এবং তাহার উপর পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাঁহার লোহার চিম্‌টার এক প্রান্ত মৃতের বক্ষে ও অপর প্রান্ত স্বকীয় চরণে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। অতি অল্পক্ষণেই তাঁহার কলেবর এতই জ্যোতিষ্মান হইয়া উঠিল যে, তাহা হইতে যেন অগ্নি নিঃসৃত হইবে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সকলে

একাগ্রচিত্তে ও নির্ব্বাকভাবে এই দৃশ্য দর্শন করিতে লাগিলেন।

রায়বাহাদুরের মৃত দেহের নিরুদ্ধ হৃদ্‌যন্ত্র আবার স্পন্দিত হইতে লাগিল। সকলেই দেখিতে পাইলেন, রায় বাহাদুরের বক্ষস্থিত ও ঘনানন্দ স্বামীর দেহসংলগ্ন সেই লোহার চিম্‌টা নত ও উন্নত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে হরকুমারের বাম হস্ত স্পন্দিত হইতে লাগিল তিনি ধীরে ধীরে সেই হস্ত দ্বারা সেই লোহার ধারণ করিলেন। কিন্তু চিম্‌টা তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার নিমীলিত নয়ন সহ গেল; তিনি মস্তক ফিরাইয়া উভয় পার্শ্ব দে লাগিলেন। রাজা, সুহাসিনী, অন্নপূর্ণা, দাসী ভব প্রভৃতি সকলকেই তিনি দেখিতে পাইলেন। তাহার পর সেই দিব্যজ্যোতি সম্পন্ন ঘনানন্দ স্বামীর মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘনানন্দ তখনও ধ্যানমগ্ন। হরকুমার একবার চেষ্টা করিলেন—কৃতকার্য্য হইলেন না। রাজা বা অপর কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। কেন না, ঘনানন্দ স্বামীর আদেশ না পাইলে এ অসাধ্য কর্ম্মে ও অলৌকিক কার্য্যের মধ্যে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে তাঁহাদের সাহসে কুলায় না। হরকুমার আবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন। সেবার

তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল। চিম্‌টা তাঁহার দেহ হইতে সরিয়া পড়িল। হরকুমার উঠিয়া বসিলেন, বসিয়াই তিনি ঘনানন্দের চরণ উভয় হস্তে ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—"এত দিন পরে,—এই অসম্ভাবিত স্থানে, মরণের পর, আপনাকে দেখিতে পাইলাম।"

এ সন্ন্যাসী নিরুত্তর। ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ যে করিধিক জ্যোতিষ্মান হইয়াছিল, তাহা অবগত হইতে ধানে প্র তাঁহার স্বাভাবিক জ্যোতি তাঁহার দেহকে কিয়ৎপরিমাণে থাকিল। তখন তিনি স্বকীয় বাহুদ্বয় পর আর ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, একবার স্বকীয় দেহ ও কর ও পশ্চাতে নত করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া নিশ্বাসবায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। তাহার পর তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন,—"জয় সচ্চিদানন্দ হরি।"

রাজা উমাশঙ্কর ও অন্যান্য সকলে "জয় সচ্চিদানন্দ হরি।" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই রব অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে করিতে বহু দূরে প্রধাবিত হইল।

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, কুশলে আছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"যখন প্রভু সম্মুখে, তখন নিশ্চয়ই আমাদের পরম কুশল। কিন্তু এ স্থানে প্রভুর আগমন হইল কি প্রকারে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যোগেশ্বরী দেবীর অনুরোধে, তাঁহার পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি সকলকে দেখিবার নিমিত্ত, আমি কাশীধাম ত্যাগ করিয়া অদ্যই প্রাতে সোণাপুর আসিয়াছিলাম। সেখানে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহার পর এখানে আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে আমার পক্ষে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। ইহার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য সাধনে যাহাকে সক্ষম বলিয়া জ্ঞাত আছি, তাঁহার এ কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত কেন হইব? অন্নপূর্ণা, সুহাসিনি, প্রণাম কর। চরণের ধূলা অঙ্গে প্রলিপ্ত করিয়া পবিত্র হও। খোকাকে আনিয়া ঐ পদতলে ফেলিয়া দেও।"

অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনী আন্তরিক ভক্তির সহিত সেই দেবচরণে প্রণাম করিলেন ও তাঁহার চরণধূলা লইয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। দাসীরা খোকারাজাকে আনিয়া উপস্থিত করিল।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"নাতি,—নাতি বড়ই প্রিয় সামগ্রী। দেও, আমি সন্তান ক্রোড়ে ধারণের সুখ অনুভব করি।"

তখন সেই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ উমাশঙ্করের সেই কুমারকে লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। শোভার সীমা থাকিল না। ঘনানন্দ খোকারাজাকে বক্ষে রাখিয়া বলিলেন,—"আর এ স্থানে বোধ হয় তোমাদের কোনই

প্রয়োজন নাই তোমরা এখন স্বচ্ছন্দে সোণাপুর গমন কর।”

সন্ন্যাসীর ক্রোড় হইতে শিশুকে গ্রহণ করিয়া রাজ সবিনয়ে বলিলেন,—“খুড়া মহাশয়! খুড়া মহাশয় যাইতে পারিবেন কি?”

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—“কেন বাবা তোমার খুড়া মহাশয়ের কি হইয়াছে? উহার দেহে চিরদিনই অসুরের ন্যায় শক্তি, এখনও তাহাই আছে। তবে দেহে কয়েকখানা ক্ষত আছে। তা বৈবাহিক মহাশয়, আমার এই কমণ্ডলুর একটু জল উহাতে মধ্যে মধ্যে প্রলেপ দেও। আশা করি, সচ্চিদানন্দ প্রভুর কৃপায় দুই তিন বার প্রলেপ দিলেই ক্ষত শুকাইয়া যাইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হই।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—“এত শীঘ্র যাইবেন? আসিলেন যদি, দুই এক দিন আমাদের সহিত অবস্থান করিবেন না কি?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“না। গৃহমধ্যে ও গৃহী লোকের সহিত একদিনও অবস্থান করিতে আমার সাধ্য নাই। তোমরা আজি সোণাপুর যাও, কল্য তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।”

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসিলেন,—“মা কোথায়? তিনি কি আর দয়া করিয়া আমাদিগকে দর্শন দিবেন না?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তিনি কোথায় তাহা ঠিক

করিয়া বলা যায় না; কারণ তিনি কখন কোথায় থাকেন, তাহা কে ঠিক করিতে পারে? আমি তাঁহাকে আসিবার পূর্ব্বে কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দেখিয়াছি। আর তাহার দর্শনলাভের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি ইচ্ছাময়ী—ইচ্ছা হইলেই তিনি দর্শন দিবেন। আপাততঃ তাহার ইচ্ছায় বাধ্য হইয়া আমি এদেশে আসিয়াছি।"

তাহার পর সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তথায় হর-কুমার বাবুর শিয়রে একটী শ্বেতপাথরের গ্লাস ছিল। নানন্দ কমণ্ডলুর সমস্ত বারি সেই গ্লাসে ঢালিয়া রাখি-লেন। তাহার পর চারিদিকে হস্ত বিস্তার করিয়া উপ-স্থিত সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি ধীরে ধীরে পশ্চাতে হাঁটিয়া দ্বারের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দ্বার-সন্নিহিত হইয়া, কেহ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই, সেই মহাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। যেন তাঁহার সেই কলেবর, কোন অলৌকিক শক্তি-বলে, শূন্যে মিশিয়া গেল।

সুহাসিনী বলিলেন,—"দাদা, দেখ দেখ, ঠাকুর কোথায় গেলেন!"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"নিষ্প্রয়োজন; উনি দেখা না দিলে, দেখা পাওয়া অসম্ভব। কল্য সোণাপুরে নিশ্চয়ই তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। তোমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। আমি বাহিরে, ডাক্তার ও অন্যান্য লোককে, বড়া মহাশয়ের আরোগ্য সংবাদ জানাইতে যাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কল্পতরু।

হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেট জেনাকিন্স সাহেব অপরাহ্ন ৩টার সময় রাজা উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রাজ-বাটীর সদর দরজায় কয়েকজন কনষ্টবল দণ্ডায়মান আছে এবং রাজার একখানি জুড়ি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছে।

উপরের সর্ব্বোপকরণে সজ্জিত প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসন গ্রহণ করিয়াছেন; রাজা উমাশঙ্কর ও রায় বাহাদুর হরকুমার ব্যতীত তথায় অন্য কোন লোক নাই। রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"কিন্তু যাই বলুন, আপনার বাঁচিয়া উঠা ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। আমি যখন আপনার শেষ জবানবন্দী লই তখনই বুঝিয়াছি, বড় জোর দশ পনর মিনিট আপনি বাঁচিয়া থাকিবেন। ডাক্তারেরাও আপনার বাঁচিবার কোন আশা আছে বলিয়া মনে করেন নাই। এরূপ জীবনলাভের কথা আর কখন শুনা যায় না।"

হরকুমার বলিলেন,—"আমাদের দেশে বলিয়া থাকে, যাহার দানা-পানি না ফুরায় কিছুতেই সে মরে না। আমার দানা-পানি এখনও আছে সাহেব।"

সাহেব বলিলেন,—"সে কথা বাদ দিউন। আমি শুনিয়াছি, আপনার মৃত্যুর পর এক সন্ন্যাসী আসিয়া আপনাকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। এ কথা কি সত্য?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আপনার কিরূপ বোধ হয়?"

সাহেব বলিলেন,—"কেহ মরা বাঁচাইতে পারে, ইহা কখনই জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান লোকে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঘটনাটা কি, আপনি বলুন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান লোকে যাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, সেরূপ কাণ্ড কখনই হইতে পারে না। অতএব আমি আর বলিব কি? কিন্তু এখন এ কথা ছাড়িয়া দিয়া, আপনি বলুন দেখি, বিধুমুখীর সন্ধান কি হইল?"

সাহেব বলিলেন,—"পুলিস সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। এখনও কোন কিনারা হয় নাই।"

হরকুমার বলিলেন,—"সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন; আপনাদের পুলিসের চেষ্টায় কখনও কোন কিনারা হইবে বলিয়া আমার বোধ হয় না। যাহারা চোর ধরিয়া না দিলে, কিছুই করিতে পারে না, দুই টাকা

পাইলেই যাহাদের সুর ফিরিয়া যায়, যাহারা অকারণ নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করিবার অধিকার পাইয়াছে বলিয়া উল্লাস করে, তাহারা এরূপ ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিবে ইহা বিশ্বাস হয় না।”

সাহেব বলিলেন,—“পুলিস সম্বন্ধে আমারও কতকটা ঐরূপ ধারণা বটে; কিন্তু তাহারা যে এ ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিবে, তাহার ভুল নাই। স্বয়ং কমিসনার সাহেব ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরল এই বিষয়ের জন্য তাগিদ করিতেছেন; আমি নিজেও ইহার তদ্বিরে লাগিয়া আছি। কেবল পুলিসের উপর নির্ভর করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত নহি। আপনি সন্ন্যাসীর কথাটা—আপনার মরিয়া বাঁচার গল্পটা ঠিক করিয়া না বলায় আমি দুঃখিত হইতেছি।”

হরকুমার বলিলেন,—“আবার যখন আপনি সেই কথা তুলিতেছেন, তখন বুঝিতেছি, তাহা জানিবার জন্য আপনার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। কিন্তু সাহেব, ঠিক কথা বলিলে, আপনারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি? আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধম পৌত্তলিক। আমরা বিশ্বাস করি, দেবতা দয়া করিলে সবই করিতে পারেন; দেবতার পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই। আমি মরিয়া গিয়াছিলাম সত্য; তাহার পর এক সন্ন্যাসীর কৃপায় আবার জীবনলাভ করিয়াছি, ইহাও সত্য।”

সাহেব বলিলেন,—"বড়ই বিস্ময়ের কথা! আপনার ন্যায় বিদ্বান ও বিচক্ষণ লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া বিস্ময়ের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী তো একটা মানুষ। মানুষ কখন এমন কর্ম্ম করিতে পারে কি?"

হরকুমার বলিলেন,—"সন্ন্যাসী মানুষ বটেন; কিন্তু মানুষ কখন কখন জ্ঞান-বলে দৈব-শক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা যে সন্ন্যাসীর কথা বলিতেছি, তিনি এক সময়ে মানুষ ছিলেন; কিন্তু এখন তিনি দেবতা।"

সাহেব বলিলেন,—"মানুষ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে ভয় হয়—বোধ হয় এরূপ কথা মনে করিলে পাপও হয়। আপনি কেন এরূপ কথা বলিতেছেন, তাহা বুঝিতেছি না।"

হরকুমার বলিলেন,—দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ জাতি এক প্রকার জীব-জন্তু-বিশেষ ছিলেন, এ কথা বোধ হয়, আপনি সহজেই স্বীকার করিবেন। এখন ইংরাজ জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বের একজন ইংরাজ, এখন সহসা সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির ক্ষমতা ও সম্পদ্ দেখিয়া তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াই মনে করিবেন সন্দেহ নাই। ইংরাজ জাতির এই উন্নতি—এই দেবত্ব

কেবল জ্ঞান, বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলেই সাধিত হইয়াছে। জ্ঞান-বলে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যখন আপনারা জ্ঞান-বলে এত উন্নতি লাভ করিয়াছেন তখন উহার অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলে, আমরা যাহা বলিতেছি তাহাও সম্ভব বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারিবেন।”

সাহেব বলিলেন,—“এ সম্বন্ধে আপনার সহিত অনেক তর্ক ও বিচারের প্রয়োজন আছে। স্থূলতঃ আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। আজি আমার আর সময় নাই। সংক্ষেপে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। সে সন্ন্যাসীঠাকুর কোথায় থাকেন ?”

হরকুমার বলিলেন,—“তাঁহাকে যখন আমরা দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি, তখন তাঁহার আর থাকিবার স্থান কি ? তিনি সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বত্র তাঁহার স্থান। তথাপি তিনি মনুষ্য ; এই জন্য মনুষ্যরূপে বাস করিবার তাঁহার একটা নির্দ্ধারিত স্থান আছে। সে স্থান কাশী।”

সাহেব বলিলেন,—“আপনি বিরক্ত হইবেন না ; এ সম্বন্ধে অন্য সময়ে আমি আপনাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ আমি যে জন্য রাজার নিকট আসিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিতেছি। রাজা বাহাদুর, আপনি গত বুধবারের কলিকাতা গেজেট পাঠ করিয়াছেন কি ?”

রাজা বলিলেন,—"কোন কোন অংশ পাঠ করিয়াছি। মিউনিসিপাল আইনের যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার পাণ্ডুলিপি আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন,—"সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিতে পারিলে হয়তো গবর্ণমেণ্টের উপকার হইত; কিন্তু এখন তাহার সময় নহে। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গেজেটে যে প্রস্তাব প্রচারিত হইয়াছে,তাহা আপনি দেখিয়াছেন কি?"

রাজা বলিলেন,—"জেলায় জেলায় দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ কমিটি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রত্যেক কমিটির সভ্য, সভাপতি,সম্পাদক প্রভৃতির নাম গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।"

জেনাকিন্স বলিলেন,—"এবারকার দুর্ভিক্ষ বড়ই ভয়ানক আকার ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। মধ্যভারতে ও দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে বড়ই ভয়ানক কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। অন্নাভাবে তথায় বহু লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে এবং এক এক পরিবার একই দিনে মরিয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। অনেক লোকই কেবল কঙ্কালে পরিণত হইয়াছে এবং বোধ হয় অতি অল্প কালে তাহারা কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিবে।"

রাজা বলিলেন,—"বড়ই শোচনীয় বৃত্তান্ত; বড়ই চিন্তার বিষয়!"

জেনকিন্স বলিলেন,—"এক্ষণে বঙ্গদেশে যাহাতে

ঐরূপ কাণ্ড না ঘটে, এই সময় হইতেই তাহার উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রত্যেক জেলায় ধনবান্ ও পদস্থ ব্যক্তিগণের সময় থাকিতে উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।"

রাজা বলিলেন,—"আপনারা এ বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়াছেন?"

সাহেব বলিলেন,—"ছোট লাট সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান লোকসকল মিলিত হইয়া দুর্ভিক্ষ সমিতি গঠন করুন এবং সেই সভা সাধ্যমত অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের জেলার দুঃখী ও অন্নহীন ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করুন। কলিকাতায় সেণ্ট্রাল কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। সে কমিটী সম্ভবতঃ অধিক টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই কমিটী সে টাকাও আবশ্যক বুঝিয়া, জেলার কমিটীর হস্তে অর্পণ করিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"এ সকল প্রস্তাব বড়ই উত্তম। এক্ষণে মহাশয় আমাকে কি করিতে বলেন?"

সাহেব বলিলেন,—"আপনাকে ছোটলাট হুগলী জেলার দুর্ভিক্ষ সমিতির সভাপতি করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় আপনি দেখিয়াছেন। ঐ সভার উদ্দেশ্য যাহাতে সুসিদ্ধ হয় আপনাকে কায়মনোবাক্যে তাহার উপায় করিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে আপনার অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন। তথাপি আপনি যে আমাকে আমার এই কর্ত্তব্যকর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এত দূর আসিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাকে বার বার ধন্যবাদ দিতেছি ও আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমি সভার কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইব, এ কথা বলাই বাহুল্য।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনার বাক্যে বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। আমরা আপনার নিকট যেরূপ সহায়তার প্রত্যাশা করি, তাহা বলিতেছি। আপনি দুর্ভিক্ষ-নিবারণার্থ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা স্থির করিয়াছি, লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে এ জেলার লোক কোন প্রকারেই দুর্ভিক্ষ জনিত কষ্ট অনুভব করিতে পারিবে না। আপনি তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে, যত্ন করিয়া আর পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।"

রাজা বলিলেন,—"ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে। আপনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, মধ্যভারতে ও দক্ষিণ ভারতে কোন কোন স্থানে বড়ই ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সে সকল স্থানের ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণও আমাদের ভাই। কেবল হুগলী জেলায় দুর্ভিক্ষ লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে কেন?"

সাহেব বলিলেন,—"এইরূপে প্রত্যেক জেলার সমিতি যদি চেষ্টাবান্ হন, তাহা হইলে বঙ্গের কোন স্থানেই দুর্ভিক্ষ হেতু মনুষ্য বিশেষ কষ্ট পাইবে না; তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"কিন্তু কেবল বঙ্গদেশ রক্ষা করিলেই ভারত রক্ষা করা হইবে না; কেবল আপনার জেলা রক্ষা করিলেই বঙ্গদেশ রক্ষা করা হইবে না; কেবল আপনার গ্রাম রক্ষা করিলেই, আপনার জেলা রক্ষা করা হইবে না; কেবল আপন পরিবার ও আশ্রিতগণকে রক্ষা করিলেই, আপনার গ্রাম রক্ষা করা হইবে না। আমার বিবেচনায় দুর্ভিক্ষ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করা অনুচিত। সমস্ত ভারতবর্ষই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সমস্ত দেশকেই রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনার কথা ঠিক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র ততদূর বিস্তৃত করিতে আমাদের সামর্থ্য কই? আমরা লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে কতই কষ্ট হইবে বলিয়া চিন্তাকুল হইতেছি; কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইলে হয়তো কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে। তাহার উপায় কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহার উপায় হইবে না, এ কথা বলা যায় না। এরূপ বিপদে দেশের ধনবান্‌গণ

সাহায্য করিলে টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই। সে যাহা হউক, আমি বলিতেছি, আপনারা যেরূপ সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা করুন। আমাকে সেই সভায় সভাপতি করিয়া আপনারা যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি সেই সমিতির কার্য্যে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও যত্ন করিতে সম্মত আছি। কিন্তু হুগলী জেলায় এখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই; বঙ্গদেশেও তাহার ভয়ানক হুঙ্কারধ্বনি এখনও উপস্থিত হয় নাই। অচিরে এদেশে তাহার আগমন সম্ভাবিত। এই সম্ভাবিত বিপদ নিবারণের জন্য আমরা অর্থ-বল লইয়া বসিয়া থাকিব; অথচ অন্যদিকে আমাদের ভাই-ভগ্নীরা দলে দলে দুর্ভিক্ষের আক্রমণে প্রাণ হারাইতেছে এবং দুর্ভিক্ষ অন্যান্য স্থানে ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছে! আমরা তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া, বঙ্গদেশের সম্ভাবিত বিপদ নিবারণের নিমিত্ত স্থিরভাবে অপেক্ষা করিব, এবং তাহা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ সীমা বোধ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিব, এরূপ সঙ্কীর্ণ নীতির আমি পক্ষপাতী নহি।”

সাহেব জিজ্ঞাসিলেন,—“আপনি তাহা হইলে কি করিতে চাহেন?”

রাজা বলিলেন,—“আমি আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না

করিয়া, ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহে সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিতে বাসনা করি।”

সাহেব বলিলেন,—“গবর্ণমেণ্ট তাহারই আয়োজন করিতেছেন।”

রাজা বলিলেন,—“উত্তম কথা। আমরাও হয় সেই অনুষ্ঠানের সহায়তা করিব বা স্বাধীন ভাবে স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিব, ইহাই আমার মনের অভিপ্রায়।”

সাহেব বলিলেন,—“আপনার মনের ভাব আমি প্রণিধান করিয়াছি। আমি বাঙ্গলার ছোটলাটের নিকট আপনার এই অভিপ্রায় জানাইব মনে করিয়াছি। সে সঙ্গে অবশ্য ইহাও বিজ্ঞাপন করিব যে, জেলার সমিতিতে আপনি হৃদয়ের সহিত কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন। অবিলম্বে ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহে গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত সাহায্য-ভাণ্ডারের সহিত একযোগে, অথবা স্বাধীনভাবে অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করাই আপনার বাসনা। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ আপনি কত টাকা দিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাও আমার জানিতে পারা আবশ্যক। লাট সাহেবকে আপনার প্রস্তাবের সহিত সে কথাও জানান উচিত। গবর্ণমেণ্টে আপনার যেরূপ মান এবং আপনি যেরূপ বিস্তারিত ব্যাপারের প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য না করিলে কখনই ভাল দেখাইবে না।”

রাজা একটু চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাহেব তাহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া বলিলেন,—"পঞ্চাশ হাজার টাকা বড় বেশী বলিয়া আপনি মনে করিতেছেন কি? বাস্তবিক একজন মনুষ্য, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও, একটা কার্য্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে অসুবিধা বোধ করিতে পারেন। যদি এত টাকা দিতে আপনার ঠিক সুবিধা না হয়, তাহা হইলে আপনি যাহা সুবিধা বোধ করেন, তাহাই প্রস্তাব করুন। গবর্ণমেণ্ট সাদরে তাহাই গ্রহণ করিবেন। আমি এজন্য কোন জেদ করিতেছি না জানিবেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন—"পঞ্চাশ হাজার টাকা অনেক এবং তাহা দিতে আমার অসুবিধা হইবে বলিয়া আমি চিন্তা করিতেছি না। আমি ভাবিতেছি এরূপ বৃহদ্ব্যাপারে এত কম টাকা দিলে চলিবে কেন? আমি এজন্য কত টাকা ব্যয় করিব মনে করিয়াছি তাহা মহাশয়কে বলিতেছি। রাজবাটীর তহবিলে সম্প্রতি ছয় লক্ষ টাকা মজুত আছে। সেই টাকা সমস্তই আপাততঃ এই কার্য্যে খরচ হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। যখন তাহার পর আবার টাকার অপ্রতুল হইবে, তখন আমাদের তহবিলে যে সাড়ে চারি লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া এই জন্য ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং আপাততঃ সাড়ে দশ লক্ষ টাকা দিবার নিমিত্ত আমি

প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছি। কিন্তু এ বিষম বিপদ সাড়ে দশ লক্ষ টাকায় নিবারিত হইবে কি? আপনি যে কার্য্যের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অব ধারণ করিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাহাতে বাস্তবিকই অনেক কোটী টাকা লাগিবারই সম্ভাবনা। যদি চেষ্টা করিয়া তত টাকা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাড়ে দশ লক্ষ টাকা ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, অথচ কার্য্য কিছুই হইবে না। তখন আমার স্ত্রীর অলঙ্কার, রাজবাটীর আসবাব, গাড়ি, ঘোড়া, হাতী সকলই বিক্রয় করিতে হইবে। তাহাতে অন্ততঃ দুই লক্ষ টাকা হইবে। সে টাকাও এ কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে।"

সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া, হস্তদ্বয় বিস্তার করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—"বলেন কি? আপনি দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রথমে ছয়, পরে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা সত্যই দান করিবেন?"

রাজা বলিলেন,—"ইহাতে আপনি এত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছেন কেন?"

সাহেব এ কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আর তাহার পর গাড়ি, ঘোড়া, রাণীর অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া আরও দুই লক্ষ টাকা দিবেন?"

রাজা বলিলেন,—"কেন দিব না? সাহেব, ধন রাখিয়া কি ফল? যদি এরূপ সময়ে আপনার লোকের

দুঃখ নিবারণের জন্য তাহা ব্যয় না করা যায়, তাহা হইলে কখন তাহা ব্যয় করিব? সে কথা যাউক, যে প্রয়োজনীয় কথা চলিতেছে, তাহা অগ্রে শেষ করা আবশ্যক। যদি এইরূপে প্রায় বারো লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও কোন কাজ না হয়, তখন কাজেই আমার জমিদারী বিক্রয় করিতে হইবে। এই সম্পত্তির আয় সাত লক্ষ টাকা। সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিক্রয় করিলে অন্ততঃ এক কোটী টাকা হইতে পারে। সে সমস্ত টাকাই দুর্ভিক্ষ নিবারণের নিমিত্ত ব্যয় করিতে হইবে।”

সাহেব এখনও দণ্ডায়মান; এখনও অতীব বিস্ময় সহকারে রাজার মুখের প্রতি তিনি দৃষ্টিপাত করিয় রহিয়াছেন। রাজা নিরস্ত হইলে, সাহেব বলিলেন,—“আপনার কথা শুনিয়া, আমার মনে তিনটী কথার উদ্ভব হইয়াছে। হয় নানাপ্রকার চিন্তায় বা অন্য কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; না হয় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি আপনি একান্ত মমতা-শূন্য; না হয় ধন কি অপরিসীম আদরের বস্তু তাহা আপনি জানেন না।”

রাজা ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—“আপনার কোন কথাই ঠিক নহে। আমার মস্তিষ্ক একটুও বিকৃত হয় নাই; এ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বে আপনি আমার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন; তন্মধ্যে মস্তিষ্ক-বিকারের কোন না কোন লক্ষণ অবশ্যই দেখিতে

পাইতেন। আমার স্ত্রী পুত্র-পরিবারের প্রতি যথেষ্ট মমতা আছে; কিন্তু সে মমতার প্রাবল্যে পৃথিবীর তাবৎ লোকের চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এরূপ স্বার্থময় ভা: কখনই আমার হৃদয়ে নাই। ধন যে অপরিসীম আদরে: বস্তু তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কেন না কেবল ধন অনেক সময়ে দুঃখীর দুঃখ নিবারণে সমর্থ।"

সাহেব বলিলেন,—"আপনি এ সম্বন্ধে আপনার আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"এ সংসারে আমার প্রধান আত্মীয় আমার সম্মুখেই বসিয়া আছেন। যদি আমার প্রস্তাবে একটুও অসম্মতি থাকিত, তাহা হইলে খুড়া মহাশয় নিশ্চয়ই আপত্তি করিতেন।"

সাহেব বলিলেন,—"রায় বাহাদুর, আপনিও কি রাজা বাহাদুরের এই অসঙ্গত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"আমি রাজার এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। রাজা যদি নিজ সম্পত্তি এইরূপে দান করিয়া সন্তোষ লাভ করেন, কেন আমি তাহাতে বাধা দিব?"

সাহেব বলিলেন,—"রাজা বাহাদুর, আপনি এ বিষয়ে রাণীর সহিত পরামর্শ করিবেন।"

রাজা বলিলেন,—"কয় দিবস পূর্ব্বে তাঁহার সহিত

আমার এ সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তিনি বলেন, যথা-সর্ব্বস্ব এই কার্য্যে ব্যয় করিতেই হইবে।"

সাহেব বলিলেন,—"তবে আমি নিরুপায়। আপনি আবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। কয়েক দিন পরে আপনার এই অসাধারণ দান-কাণ্ডের কথা আমি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিব।"

রাজা বলিলেন,—"আমার সানুনয় প্রার্থনা, আপনি এ তুচ্ছ কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবেন না। আমি এ সামান্য কার্য্যের জন্য গেজেটে ধন্যবাদের প্রার্থী নহি, অধিকতর সম্মান বা উপাধির ভিক্ষুক নহি; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়া দান করিতে আমি বাসনা করি না। আমি ইচ্ছা করিতেছি, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত যাবতীয় দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে অন্নসত্র স্থাপন করিব; সেই সেই স্থানে যতদিন দুর্ভিক্ষ শেষ না হয় এবং যতদিন আমার অর্থ নিঃশেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সেই সকল সত্রে অন্নহীনজনগণ ভোজন করিবে। প্রত্যেক স্থানেই শান্তিরক্ষার নিমিত্ত, আইনের মর্য্যাদা রাখিবার নিমিত্ত, এবং অন্যান্য নানা কারণে, আমার হয়তো রাজপুরুষগণের সহায়তা আবশ্যক হইবে। আপনি দয়া করিয়া তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটা বিহিত আদেশ প্রচার করিয়া দিলে আমি যার-পর-নাই উপকৃত ও বাধিত হইব।"

সাহেব বলিলেন,—"গবর্ণমেণ্ট অতিশয় সন্তোষের সহিত এ বিষয়ে আপনার সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই। আমি সহজেই তাহার সুব্যবস্থা করিতে পারিব। কিন্তু আপনি এ বিষয়ে আর একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন,—"আমার চিন্তা সমাপ্ত হইয়াছে; অদ্য হইতেই আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। বৃথা বাক্যে এক দিনও সময় নষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

সাহেব বিহিত বিধানে রাজা বাহাদুর ও রায় বাহাদুরের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

অন্নপূর্ণা।

পঞ্চম খণ্ড—রূপান্তর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনাসক্তি।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রাতঃকাল হইতে স্নানার্থী নর-নারীর সংখ্যা করা ভার। কত ভাবের কত লোকই যে নিরন্তর আসিয়া পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীতে দেহ নিমজ্জন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কত লোক প্রবঞ্চনা বা অত্যাচার দ্বারা পরস্বাপ-হরণ করিয়া, অভিনব প্রতারণার ক্ষেত্র কল্পনা করিতে করিতে, গঙ্গাস্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে; কত ব্যক্তি হয়তো সমস্ত রাত্রি পরনারীর সহিত রঙ্গরসে প্রমত্ত থাকার পর, প্রাতে গঙ্গাবগাহন করিয়া সমস্ত পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিতেছে। কত জন নূতন নারী দর্শন, বা কোন নবীনার চিত্তাপহরণ করিবার বাসনায়, যথাসময়ে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কত মহাত্মা গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করিয়া, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের জগদ্বিখ্যাত গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে স্নান-নিরতা নারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন। কত জন ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিতে করিতে, অথবা উপবীত ধরিয়া

জপ করিতে করিতে, কোন লক্ষিতা নারীবিশেষকে কোন সঙ্কেত জ্ঞাপন করিতেছেন। যে নারী ব্যভিচারিণী, যে নারী ভ্রূণহত্যা করিয়া আপনার পাপ-প্রবৃত্তির নিদর্শন প্রক্ষালন করিয়াছে, যে নারী পাপের সাগরে ভাসিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারাও গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রতা সঞ্চয় করিতেছে। কাশীতে গঙ্গাস্নানের বিরাম নাই; বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদর্শনেরও অভাব নাই; সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাতীত পাপ ও দুষ্কর্ম্মেরও অবধি নাই।

পাপাসক্তের সংখ্যা অনেক হইলেও, এ স্থানে যে নির্ম্মল-স্বভাব লোকের সমাগম হয় না, এমন নহে। কদাচিৎ দুই একটী সাধু পুরুষ ও বর্ষীয়সী নারী প্রকৃত সাত্ত্বিকভাবে ও পবিত্র চিত্তে গঙ্গাস্নান করিতে না আইসেন, এমন নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প।

অন্নপূর্ণার পিতা নীলরতন বাবু বেলা সাড়ে আটটার সময় গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। আধ ঘণ্টায় তাঁহার স্নানাদি কার্য্য শেষ হইল। তিনি গরদ পরিয়া, গায়ে উত্তরীয় দিয়া এবং গামছায় ভিজা কাপড় জড়াইয়া লইয়া গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিলেন। কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হওয়ার পর, এক কৃষ্ণকায় স্থূল-কলেবর ও কুৎসিতদর্শন পুরুষ তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। নীলরতন বাবু দর্শনমাত্র সেই পুরুষকে চিনিতে পারিলেন এবং আগ্রহ সহ-

কারে ডাকিলেন,—"শ্যামলাল বাবু! দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার সহিত অনেক কথা আছে, শুনুন!"

সেই পুরুষ শ্যামলাল। তিনি ব্যস্ততাসহ অবনত মস্তকে চলিয়া যাইতেছিলেন। আহূত হইয়া তিনি আহ্বানকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং নীলরতন বাবুকে চিনিতে পারিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে নীলরতন বাবুর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয় আমাকে ডাকিতেছিলেন? আপনি ভাল আছেন? আপনার বাটীর সমস্ত কুশল?"

নীলরতন বাবু বলিলেন।—"হাঁ। আমি আপনাকে অনেক সন্ধান করিতেছি। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি এতদিন নানাস্থানে ঘুরিয়াছি। অনেক দিন দেশে দেশে ফিরিয়া সম্প্রতি আমি কাশী আসিয়াছি। মহাশয় আমাকে এত সন্ধান করিতেছিলেন কেন?"

নীলরতন বলিলেন,—"সে অনেক কথা। রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিবার সুবিধা হইবে না বোধ হয়। আপনি কৃপা করিয়া যদি একবার আমার বাটীতে আইসেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমার বাসস্থান তো নিকটেই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"চলুন।"

নীলরতন বাবুর সেই পূর্ব্বপরিচিত ভবনে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। বৈঠখখানার দ্বার খোলা ছিল। শ্যামলালকে আদর করিয়া নীলরতন বাবু সেই স্থানে বসাইলেন। যে স্থানে বিবিধ অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া হরকুমার বাবু শ্যামলালের বিষয়-বিভব তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, যে স্থানে বহু ভদ্রলোকের সমক্ষে তিনি স্পষ্টরূপে শ্যামলালের নিন্দনীয় জন্মকাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন, বহুদিন পরে শ্যামলাল পুনরায় সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

নীলরতন বাবু স্নানের পর শয্যায় বসিতে ইচ্ছা করিলেন না; অদূরে একখানি কাষ্ঠাসন পড়িয়াছিল, তাহার উপর উপবেশন করিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি কি ভাবে আছেন? কোথায় আছেন? কিরূপে চলিতেছে? এই সকল সংবাদ জানিবার নিমিত্ত আমরা অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত আছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার জন্য কাহারও ভাবিবার কোন দরকার দেখি না; কেন না আমার ন্যায় ব্যক্তির সহিত সংসারের কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে; আমি বাঁচিয়া থাকিলে কাহারও কোন লাভ নাই, মরিয়া গেলেও কাহারও কোন ক্ষতি নাই। আমি ভিক্ষা করিয়া খাই। এতদিন ভিক্ষা করিয়া খাইতে খাইতে বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, এখনও ভিক্ষা করিয়া খাইতেছি।"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনি ভিক্ষা করিয়া খান কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আর কি করিব? লেখাপড়া শিখি নাই; সুতরাং আমার দ্বারা কোন কাজ-কর্ম্ম হওয়া সম্ভব নহে। দেহ অকর্ম্মণ্য, সুতরাং কোন শ্রমের কাজ করিতেও আমি অক্ষম; কখন অভ্যাস না থাকায় কোন কঠিন কাজও আমি করিতে পারি না। এরূপ লোকের পক্ষে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি আছে?"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনি স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য আপনার আত্মীয়গণ ব্যাকুল আছেন। রাজা উমাশঙ্কর আপনার জন্য অনেক সন্ধান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি নানাস্থানে আপনার সন্ধানে লোক পাঠাইয়াছিলেন। অনেক স্থানে রাজার লোক এখনও মহাশয়ের সন্ধান করিতেছে; কাশীতে সন্ধান করিবার জন্য আমার উপর ভার ছিল। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি। এতদিন পরে দৈবাৎ আজি আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া সুখী হইলাম। আমি অদ্যই রাজাকে সংবাদ পাঠাইতেছি; নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে রাজার লোকজন আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে, অথবা আপনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপে আপনার সকল সুব্যবস্থা করিয়া দিবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আপনি রাজাকে আমার সংবাদ লিখিতে ইচ্ছা করেন, লিখিতে পারেন। তাঁহাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবেন এবং এ অধমের প্রতি কৃপা রাখিতে বলিবেন। কিন্তু তাঁহার কোন সাহায্যে আমার প্রয়োজন নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"কেন? আপনি কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। রাজা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আপনার স্বচ্ছন্দে ও অনায়াসে জীবিকাপাতের উপায় করিয়া দিবেন। ইহাতে আপনি অসম্মত হইতেছেন কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি এ অবস্থায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দে আছি। আমার কোন কষ্টই নাই। সুতরাং রাজার সাহায্য অনাবশ্যক।"

নীলরতন বলিলেন,—"ভিক্ষা করা ক্লেশ ও লজ্জার কর্ম্ম। তাহার অপেক্ষা সাহায্য গ্রহণ অনেক ভাল।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"যাহার এ সংসারে কিছুই নাই, অথচ কোন কার্য্য করিয়া জীবনপাত করিতেও যাহার সাধ্য নাই, ভিক্ষা ভিন্ন তাহার আর উপায় কি আছে? রাজার নিকট সাহায্য লইলেও ভিক্ষা লওয়া হইবে। যখন কোন প্রকারে জীবন চলিয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার সাহায্য লইবার আবশ্যক কি?"

নীলরতন বলিলেন,—"রাজা মনে করেন, তাঁহার

সম্পত্তির আয় হইতে স্বচ্ছন্দরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আপনার অধিকার আছে। আপনি কেন তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা বলিয়া মনে করিতেছেন?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিতে ধর্ম্মমতে, ন্যায় মতে, আমার কোনই অধিকার নাই। রাজা পরম দয়ালু,—মহাত্মা; তিনি কৃপা করিয়া আমাকে নানাপ্রকার অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্য লইলে যে ভিক্ষা লওয়া হইবে তাহার ভুল নাই। এক প্রকার ভিক্ষায় আমার চলিয়া যাইতেছে। তবে আর তাঁহাকে ত্যক্ত করিব কেন? যদি আমার কখন অসুবিধা হয়, বা বিশেষ অভাব হয়, তখন আমি নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিব। আপাততঃ আমার কোন প্রয়োজন নাই।”

নীলরতন বলিলেন,—“আপনি রাজার সাহায্য লইতে ইচ্ছা না করেন, আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন তো? কাশীতে যখন আপনি ভিক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, তখন আমার নিকট সাহায্য লওয়ায় ক্ষতি কি?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“এখনও কোন দরকার হয় নাই। কাশীতে থাকিলে হয়তো কোন না কোন দিন মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা লইতে হইবে। আমি আবশ্যক হইলে নিশ্চয়ই মহাশয়ের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিব।”

নীলরতন বলিলেন,—"আপনার নিকট আর কে আছে ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেহ না। এ সংসারে আমার কেহ নাই ; কাছে কে থাকিবে ?"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"ভিক্ষার পর আপনাকেই পাক করিয়া খাইতে হয় ?"

"কাজেই।"

"সেও তো একটা বড় কষ্ট। আপনি কৃপা করিয়া প্রতিদিন এই স্থানে আসিলে, বা যেথানে আপনি থাকেন, চিনাইয়া দিলে সেই স্থানেই পাক করা অন্নাদি ভোজন করিতে পান। ইহাও কি আপনি ভাল বলিয়া মনে করেন না ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এ ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে কিন্তু আমি কাহারও নিয়মিত গলগ্রহ হইতে ইচ্ছা করি না। যদি আমার নিতান্ত অচল হয়, তখন অবশ্যই মহাশয়কে এ কথা জানাইব।"

নীলরতন বলিলেন,—"ভাল, এ ব্যবস্থা যদি আপনার ভাল না লাগে, তাহা হইলে কাশীর নানাস্থানে অনেক সত্র আছে। তাহার যে কোন স্থানে আমি আপনার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। তাহাতে তো আপনার মনে কোনই সঙ্কোচ হইতে পারে না ; কারণ সেখানে পরকে দিবার নিমিত্তই অন্নাদি প্রস্তুত হয়।

আপনি অনুমতি করিলে আমি সহজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“এ পরামর্শ মন্দ নহে। কিন্তু এ কথা আমি আপনাকে পরে জানাইব। আপনি অনেকক্ষণ স্নান করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে আহ্নিকাদি করিতে যান। আমি আর এক দিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

নীলরতন বলিলেন,—“আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এখানে আপনি কোথায় থাকেন?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“চক ছাড়াইয়া মুড়ারইগ্রামের দিকে যাইতে রাস্তার বাম ধারে একটী ভাঙ্গা বাড়ী আছে। বাড়ীর মালিক একজন হিন্দুস্থানী মহাজন। তিনি দয়া করিয়া আমাকে একটী নীচের ঘরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। আমি সেখানেই থাকি।”

নীলরতন বলিলেন,—“বোধ হয় চেষ্টা করিলে সে স্থান আমি ঠিক করিয়া লইতে পারিব। আপাততঃ আমি একটা অনুরোধ করিতেছি। অদ্য বেলাও বেশী হইয়াছে; আপনার ভিক্ষা করাও হয় নাই। আপনি এ বেলা আমার বাটীতে আহার করিলে বড়ই সুখী হইব।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমার প্রতি আপনার দয়ার সীমা নাই। আজি আমার ভিক্ষা করিবার কোন

প্রয়োজন নাই। আহারের জন্যও কোন চিন্তা নাই। গত কল্য আমি না বুঝিতে পারিয়া অনেক ভাত রাঁধিয়াছিলাম। তাহা আমি খাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখনও অনেক অন্ন হাঁড়িতে আছে। কাজেই আজি আর কোন প্রয়োজন নাই। আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমার যে দিন অভাব হইবে, বা বিশেষ অসুবিধা হইবে, আমি সেদিন আসিয়া প্রথমেই মহাশয়কে জানাইব। আপাততঃ আমি বিদায় হই।”

নীলরতন বলিলেন,—“কাজেই আমি আর কি বলিব? আপনি কোন প্রকারেই আহারাদি করিতে সম্মত হইলেন না। কিছু টাকা পয়সার নিশ্চয়ই আপনার প্রয়োজন আছে। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপাততঃ দুই চারিটী টাকা লইয়া যান।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“কোন দরকার নাই। পয়সায় আমার তো কখনই দরকার হয় না। প্রয়োজন হইলে আমি মহাশয়ের নিকট সকলই চাহিয়া লইব। আপাততঃ বিদায় হই।”

শ্যামলাল প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। নীলরতন বলিলেন,—“বড় দুঃখের সহিত আপনাকে বিদায় দিতেছি। আমি কি করিব? আমার কোন সাহায্যই আপনি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। সত্রের বিষয়টা চেষ্টা করিব কি না, তাহাও আজি জানিতে পারিলাম না।

আপনার সহিত যে আবার দেখা হইল ইহাও সুখের বিষয়। আমি রাজাকে এখনই আপনার সংবাদ লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তর আইসে, তাহাও আপনাকে জানাইব। আপনি কৃপা করিয়া সময়ে সময়ে দেখা সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি কোন সাহায্য লইলাম না বলিয়া আপনি দুঃখ করিবেন না। আমার সকল বিপদেই আমি আপনার শরণাগত হইব। সত্রের কথা আমি শীঘ্র আপনাকে জানাইয়া যাইব। রাজার নিকট আমার কথা না লেখাই ভাল। তবে যদি নিতান্ত লিখিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানাইতে ভুলিবেন না।”

শ্যামলাল পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই বিস্ময়াবহরূপে পরিবর্তিত ব্যক্তির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে নীলরতন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষুক।

শ্যামলালের আবাসে ফিরিয়া আসিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। কিন্তু সে জন্য তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। আজি আর তাঁহার ভিক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কল্য তিনি ভিক্ষা করিয়া যে অন্ন পাক করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আহার হওয়ার পরও হাঁড়িতে যথেষ্ট ভাত রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আজি আর চাউলের প্রয়োজন নাই; পাক করিবারও প্রয়োজন নাই।

শ্যামলাল যে স্থানে বাস করিতেছেন তাহা অতি কদর্য্য। ঘরটী অন্ধকার, সোঁতা এবং অত্যন্ত মলিন। সেই ঘরের মেজের উপর একখানি দরমা পাতা আছে, তাহাই শ্যামলালের শয্যা। কতকগুলি খড় তাঁহার বালিস। ঘরের এক প্রান্তে একটী উনান আছে; তাহাতেই শ্যামলাল পাক করেন। একদিকে একটী শিকা আছে; তাহাতেই শ্যামলালের একটী হাঁড়ি ও একখানি সরা ঝুলান থাকে। ঘরের একদিকে একটী মাটীর কলসী আছে; তাহাতে জল থাকে। কলসীর নিকটে

দুইটী মাটীর ভাঁড় পড়িয়া আছে। একদিকে একটু দড়ির উপর শ্যামলালের একখানি ছিন্ন মলিন বস্ত্র ও তদ্বৎ উড়ানি এবং একখানি গামছা আছে। এক কোণে একটী প্রদীপ আছে, তাহাতে তৈল বা সলিতা কিছুই নাই। এতদ্ব্যতীত শ্যামলালের ঘরে কোন আসবাব নাই, বা মূল্যবান্ কোন সামগ্রী নাই। এক সময়ে যাঁহার প্রতাপে ও অত্যাচারে লোক কম্পান্বিত ছিল, যাহার ভোগ ও বিলাসিতার শেষ ছিল না, শত শত লোক যাঁহার পরিচর্য্যা করিত, আজি সেই শ্যামলাল বাবু এইরূপ হীনাবস্থায় ও দুর্দ্দশায় স্বচ্ছন্দভাবে ও সন্তুষ্ট মনে কালপাত করিতেছেন।

এই কদর্য্য আবাসে অনেক বেলায় শ্যামলাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, এক অস্থিচর্ম্মাবশেষ, বিকটদর্শন স্ত্রীলোক তাঁহার সেই গৃহদ্বারে দেওয়াল হেলান দিয়া বসিয়া আছে। শ্যামলাল তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,— "তুমি কে? এখানে কেন বসিয়া আছ?"

স্ত্রীলোক তখন চক্ষু মুদিয়া ছিল; শ্যামলালের প্রশ্ন শুনিয়া সে নয়ন উন্মীলন করিল এবং কাতরভাবে শ্যামলালকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল,—"আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? চিনিতে পারিবার আর কোন উপায় নাই। আপনার দোষ কি? আমি সারদা— আপনার দাসী।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সারদা, তোমার এই দশা হইয়াছে? কোথায় থাক তুমি? কেন তোমার এমন অবস্থা হইল?"

সারদা বলিল,—"সকল কথাই বলিতেছি। আমি বড় কাতর। ধীরে ধীরে কথা বলিতে হইবে। আমার পাপের কথা আপনার নিকট লুকাইয়া কি করিব? আপনি কি না জানেন? হরিচরণ আমাকে ছাড়িয়া যায়। তাহার পর আমাকে পাপের ব্যবসা করিয়া থাকিতে হয়। আমি দেশে চলিয়া যাই। সেখানে এক পুরুষের সহিত আমার বড় ভাব হয়। সে আমাকে আবার কাশী লইয়া আইসে। এখানে তিন চারি মাস থাকার পর, আমার কঠিন পীড়া হয়। সেই সময় সেই পুরুষ আমার অলঙ্কার, টাকা-কড়ি যাহা ছিল সকলই লইয়া পলাইয়া যায়। আমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে বলিয়া আমি ভাল হইয়া উঠি। কিন্তু পথ্য করি এমন সম্বলও আমার নাই। যে বাটীতে আমি ছিলাম, সে বাড়ীওয়ালী আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। শুনিয়াছি আপনি এখানে আছেন। অতি কষ্টে আপনার নিকট আসিয়া পড়িয়াছি। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাইতো। তোমার অবস্থা শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইল। আমি এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই; তুমি ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখ, আমার কিছুই

নাই। তথাপি আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, আমি তাহা সন্তুষ্ট মনে করিতে প্রস্তুত আছি।"

শ্যামলাল ঘরের দ্বার খুলিলেন। বলিলেন,—"আইস সারদা, ঘরের মধ্যে আইস। তোমার হাত ধরিতে হইবে কি?"

সারদা বলিল,—"না, আমি যাইতে পারিব।"

কষ্টে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সারদা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল এবং শ্যামলালের আসবাব দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। বলিল,—"আপনি এখানেই থাকেন? এই ঘরে যাহা আছে, তাহা ছাড়া আপনার আর কিছু নাই?"

শ্যামলাল বলিলেন,—কিছু না। এখানেই আমি স্বচ্ছন্দে থাকি। ভিক্ষা আমার অবলম্বন। আমার মত লোকের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তুমি অনায়াসে বল। আমি তাহা এখনই করিতে সম্মত আছি।"

সারদা বলিল,—"সে পরামর্শ পরে হইবে। আপাততঃ তিন চারি দিন আমার খাওয়া হয় নাই। কল্য কেবল একটু জল খাইয়া আছি; আমি ক্ষুধায় মারা যাই। আপনি তাহার উপায় করিয়া দিউন।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার ঘরে চাউল নাই; কিন্তু হাঁড়িতে চারিটী ভিজা [illegible] আছে; তুমি যদি

তাহা খাইতে চাহ, তাহা হইলে আমি তাহা বাড়িয়া দিতে পারি।”

সারদা বলিল,—“আপনি কি খাইবেন ?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি কিছু খাইব না। আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন গুরুতর। তুমি স্বচ্ছন্দে খাও।”

সারদা বলিল,—“আমি মারা যাইতেছি। কাজেই খাইতে হইবে। আপনি দয়া করিয়া ভাত দিউন।”

তখন শ্যামলাল হাতে পায়ে জল দিয়া হাঁড়ি নামাইলেন; একটা কোণ হইতে একটা ভাঙ্গা পাথর আনিলেন। সেই পাথরে হাঁড়ির সমস্ত ভাত বাড়িয়া ফেলিলেন। তাহার পর একটা স্থান হইতে একটু লবণ ও একটা লঙ্কা বাহির করিয়া ভাতের উপর দিলেন। বলিলেন,—“আমার আর কিছুই নাই সারদা। তুমি কষ্ট করিয়া কোনরূপে ইহাই খাও। আইস।”

সারদা উঠিয়া আসিল। পরম আনন্দে লঙ্কা ও লবণ সংযোগে সেই সমস্ত পর্য্যুষিত অন্ন উদরস্থ করিল। খাইবার সময় সে কোন কথা কহিল না। খাওয়া শেষ হইলে একটা ভাণ্ডে করিয়া শ্যামলাল তাহাকে জল দিলেন। সে জল খাইয়া পাথর তুলিতেছে দেখিয়া শ্যামলাল বলিলেন,—“এখনই পাথর ধুইবার কোন আবশ্যক নাই। আজি আর পাথরের কোন দরকার হইবে না। তুমি হাত মুখ ধুইয়া এখন বিশ্রাম কর।”

সে তাহাই করিল। শ্যামলাল তাহাকে দরমার শয্যা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"তুমি অতিশয় কাতর আছ ; এখন এই স্থানে বিশ্রাম কর।"

সারদা সেই শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে অনেকটা সুস্থবোধ করিল। সে শুইয়া বলিল,—"বাবুর কিছু খাওয়ার উপায় হইবে না কি ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সে জন্য কোন চিন্তা করিও না ; এরূপ উপবাস মাসের মধ্যে আমার প্রায় দশ পনর দিন ঘটিয়া থাকে। আমি সুস্থ ব্যক্তি ; মাঝে মাঝে উপবাসে আমার কোন ক্ষতি হয় না। তুমি যে যথা-সময়ে যাহা হউক চারিটী খাইতে পাইলে, ইহাই আমার পরম আনন্দ।"

সারদা কহিল,—"আপনি এমন করিয়া থাকেন কেন ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি এ অবস্থায় বড় সুখে আছি। আমি বড় পাপী। যাহাদের বিরুদ্ধে আমি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছি, তাহাদের কাহারও নিকট সাহায্য লইয়া,বা তাহাদের সহিত মিশিয়া থাকিতে আমার লজ্জা হয় ; ভালও লাগে না। আমার মত লোকের এই প্রকারে থাকাই উচিত। সংসারের সকল সুখই আমি ভোগ করিয়াছি, কিছু না থাকা এবং কোন অভাব না থাকাই বড় সুখ।"

সারদা বলিল,—"আমি ও সকল কথা বুঝিতে পারি না। আপনি জানেন এখন হরিচরণ কোথায় ?"

শ্যামলাল বলিলেন—"তাহার জেল হইয়াছিল। সে এখন ফাটক হইতে খালাস হইয়া আসিয়াছে শুনিয়াছি।"

সারদা উঠিয়া বসিল। বলিল—"তাহা হইলে আমার একটা পরামর্শ আছে। আপনি শুনিবেন কি ?"

শ্যামলাল বলিলেন—"বল, যদি শুনিবার উপযুক্ত কথা তুমি বল, তাহা হইলে আমি অবশ্যই শুনিব।"

সারদা সমুৎসাহে বলিল,—"তাহা হইলে আপনি হরিচরণের সঙ্গে যোগ দিউন। রাজার সহিত মোকদ্দমার সময় সে অনবরত অনেক স্থানে আপনার সন্ধান করিয়াছে। বউদিদিরও সে অনেক খোঁজ করিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও সে পায় নাই। তাহার মুখে শুনিয়াছি, বউদিদিকে আর আপনাকে পাইলে সে সকল বিষয় রাজার হাত হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিত। আপনি এখনও তাহার সহিত যোগ দিলে যাহা ছিল সকলই ঠিক সেইরূপ হইতে পারে। আপনার আর কোন কষ্ট থাকে না।"

শ্যামলাল বলিলেন—"তুমি উত্তম পরামর্শ বলিয়াছ সারদা। কিন্তু এ উত্তম পরামর্শ শুনিয়া কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। কেন আমি তোমার পরামর্শমত কার্য্য করিতে অক্ষম তাহা বলিয়া কোন লাভ নাই।

আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে কাহারও সহিত যোগ না দিলেও, রাজা স্বয়ং যেরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে আছেন, আমাকে এখনই নিশ্চয়ই সেই অবস্থায় রাখিয়া চরিতার্থ হইবেন। তিনি মহাপুরুষ; হরিচরণের সহিত যোগ দিয়া, সেই মহাত্মার সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হইলেও পাপ হয়। তোমার এরূপ পরামর্শে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে কি করিলে তোমার উপকার হয়, আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে, তাহা তুমি আমাকে বল। আমি যথাসাধ্য যত্নে তোমার উপকার করিতে চেষ্টা করি।"

সারদা বলিল,—"আমি যে কয়দিন সুস্থ না হই, সেই কয়দিন আপনি দয়া করিয়া আমাকে অন্ন আর আশ্রয় দিলে আমি সুখী হইব।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"নিশ্চয়ই তাহা হইবে। আমি ভিক্ষা করিয়া তোমাকে খাওয়াইব।"

দিন কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে শ্যামলাল ভিক্ষায় বাহির হইলেন। অনেক বেলায় তিনি তণ্ডুলাদি লইয়া গৃহাগত হইলেন এবং তাহা পাক করিয়া সারদাকে উদর পুরিয়া খাইতে দিলেন। সারদার খাওয়া হইলে এবং সে পাথর ধুইয়া দিলে, শ্যামলাল আপনার ভাত বাড়িয়া লইলেন।

চারি পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। সারদা সুস্থ হইয়া

উঠিল. এদিক ওদিক যাইতে সমর্থ হইল এবং তাহার আকার প্রকারও অনেক ভাল হইল। তখন শ্যামলাল বলিলেন,—"এক্ষণে তুমি কি করিতে চাহ সারদা ?"

সারদা বলিল,—"আমি আপনার নিকটই পড়িয়া থাকিব, আর কোথায় যাইব ? আপনার সুখের শরীর ; কাজ-কর্ম্মের জন্যও একজন লোক চাহি তো ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি ভিখারী, ভিখারীর কাজ-কর্ম্ম করিতে লোক লাগে না।"

সারদা বলিল,—"আপনি একা থাকেন ; চিরদিনই আপনার স্ত্রীলোক লইয়া থাকা অভ্যাস। আমি দাসী হইলেও, অনেকেই আমার প্রতি নেকনজরে চাহিয়া থাকেন। না হয়, আপনার পা টিপিবার জন্য আমি কাছে থাকিব।"

শ্যামলাল অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি অতি মন্দ লোক! এজন্য তুমি মনে করিয়াছ, একটা স্ত্রীলোক না হইলে আমি থাকিতে পারিব না। তোমার অনুমানের নিন্দা করিতেছি না। কিন্তু সারদা, আমার সে দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন তুমি কেন, কোন অপ্সরাকে লইয়াও ঘর পাতাইতে আমার আর প্রয়োজন নাই। ভিক্ষা করিয়া যে খায়, তাহার সুখের ইচ্ছা না থাকাই উচিত। তোমার আর কোন স্থান না থাকিলে তুমি এই স্থানেই থাকিতে পার ; আমি কিন্তু

আর এখানে থাকিব না, বা তোমার আর সন্ধান লইব না।”

সেই দিন শ্যামলাল ভিক্ষার্থ গৃহত্যাগ করিলেন; কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। তাঁহার দরমা, ভাঙ্গা পাথর, জলের কলসী, ছেঁড়া কাপড়, মাটীর ভাঁড় প্রভৃতি সামগ্রী ফেলিয়া তিনি সেই যে পলায়ন করিলেন, আর সে আবাসে ফিরিলেন না। সারদার ভয়ে শ্যামলাল আশ্রয়হীন হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছলনা।

যে একটু আশ্রয় স্থান ছিল, তাহাও শ্যামলাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। সে জন্য তাঁহার কোন কষ্ট নাই। তিনি এক্ষণে বৃক্ষতলবাসী। এক গামছা, এক ছিন্ন চাদর ও এক পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া তাঁহার আর কিছুই নাই এ সকল দ্রব্য সঙ্গেই থাকে। সুতরাং গাছতলায় পড়িয়া থাকিতেও শ্যামলালের কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না।

সারদার নিকট হইতে পলায়ন করার পরদিনই নীলরতন বাবুর সহিত শ্যামলাল সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে একটী সত্রে শ্যামলালের আহারের সুব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে আর ভিক্ষা করিতে হয় না, আহারের জন্য কোন উদ্যোগও করিতে হয় না।

নীলতরন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ কালে শ্যামলাল বলেন নাই যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আশ্রয় স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছে; এবং তিনি আর সে স্থানে থাকেন না। কয়েক দিন পরে, শ্যামলালের সন্ধান করিবার জন্য, নীলরতন বাবু তাঁহার আবাসে গমন করিলেন।

নীলরতন বাবু সেখানে আসিয়াছেন দেখিয়াই সারদা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অতি সচ্চরিত্রা নারীর ন্যায় বিনীত ভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল। নীলরতন কখন সারদাকে দেখেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কথাও কাহারও মুখে শুনেন নাই। কাজেই তিনি সারদাকে চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কে ?"

সারদা বলিল,—"আমার নাম সারদা; আমি পূর্ব্বে শ্যামলাল বাবুর সংসারে দাসী ছিলাম। এক্ষণে তাঁহাদের বড় দুর্দ্দশা হইয়াছে। বাবু অতি কষ্টে পড়িয়াছেন। সুখী লোক, দুঃখে পড়িয়া মারা যাইতে বসিয়াছেন। আমি কাশী আসিয়াছিলাম; বাবুর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কয়দিন তাঁহার নিকটে আছি, যথাসাধ্য তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছি।"

নীলরতন বাবু একটু বিবেচনা করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, শ্যামলাল বাবু বড় ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পুরুষ। তিনি হয় তো এ অবস্থাতেও এই স্ত্রীলোকটাকে লইয়া ঘরকরনা করিতেছেন এবং ইহাকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব বলিয়াই হয় তো আমাদের কাহারও নিকটে বা আমাদের তত্ত্বাবধানের অধীন হইয়া থকিতে চাহেন না। তিনি যে ভাবেই থাকুন, তাহাতে কিছু যায় আইসে না। তাঁহার সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিবার

জন্য রাজা বার বার পত্র লিখিতেছেন। অতএব যেমন করিয়া হউক, তাহা করাই আবশ্যক। সে জন্য শ্যামলাল বাবুর স্বভাব-চরিত্রাদির কোন বিষয়েরই বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে?"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আমি রাজা উমাশঙ্করের শ্বশুর; কাশীতেই থাকি। দশাশ্বমেধের নিকট আমার বাটী। শ্যামলাল বাবু কোথায় গিয়াছেন, তুমি জান?"

সারদা বলিল,—"তিনি দিনে আর বড় এখানে থাকেন না। এখানে এ ভাবে থাকিতে লজ্জাও হয়, কষ্টও হয়। সন্ধ্যার পর এখানে আইসেন। আমি যথাসাধ্য যত্নে তাঁহার খাদ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া রাখি; প্রাণপণে তাঁহার যত্ন করি।"

নীলরতন বলিলেন,—"বেশ কর। এজন্য রাজা নিশ্চয়ই তোমাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন। আমি তোমার সমস্ত কথা রাজাকে বলিয়া পাঠাইব। খরচ-পত্র চলে কিরূপে?"

সারদা বলিল,—"সে দুঃখের কথা আর আপনাকে কি বলিব? আমার হাতে একুশটী টাকা ছিল। এক সময়ে বাবুর অনেক খাইয়াছি; এখন বাবুর এই কষ্ট দেখিয়া থাকি কিরূপে? একে একে সেই একুশ টাকাই বাবুর জন্য খরচ করিয়াছি। বাবু কাহারও নিকট

চাহিতে পারিবেন না; কাজেই কষ্টের একশেষ। এখন এমন হইয়াছে যে দিন আর কাটে না। বাবু দিনে আর আইসেন না। রাত্রি প্রায় উপবাসে যাইতেছে। আমার হাতে আর কিছু নাই যে বাবুর জন্য খরচ করি। আহা, এক সময়ে হাজার হাজার লোকে যাঁহার ভাত খাইয়াছে, আজি সে ভাতের ভিখারী!"

সারদার চক্ষুতে একটু জল আসিল। নীলরতনেরও বিশেষ কষ্ট হইল। তিনি বলিলেন,—"শ্যামলাল বাবু ইচ্ছাপূর্ব্বক এ কষ্ট ভোগ করিতেছেন. তিনি যে ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করেন, রাজা তাঁহাকে সেই ভাবে রাখিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন, তাঁহার খরচ পত্রাদির জন্যও কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। তিনি একটা মুখের কথা বলিলে আমি এখনই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।"

সারদা বলিল,—"আহা! তাহা কি জানি না—রাজার কত দয়ার শরীর! বিষয় রাজা পাইয়াছেন সত্য কিন্তু তাই বলিয়া যাহাতে ভাসিয়া না জান, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি রাজা স্থির থাকিতে পারেন? আপনার যে বাবুর জন্য টাকা দিতে, অন্য নানা প্রকারে সাহায্য করিতে চাহেন, এ কথা আমি বার বার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু কি বলিব আপনাকে? বাবু বলেন,—

কষ্টে মরিয়া যাইব, সেও স্বীকার, তথাপি কাহারও নিকট হইতে সাহায্য লইতে পারিব না। ইহাতে অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।”

নীলরতন বাবু আবার একটু চিন্তা করিলেন। বুঝিয়া দেখিলেন, কথাটা অসঙ্গত নহে। এইরূপ অভিমান শ্যামলালের মনে না হইতে পারে এমন নহে। তিনি মনে করিলেন, রাজার বাসনা সুসিদ্ধ করিবার পক্ষে সারদা ইহাও এক মন্দ উপায় নহে। শ্যামলালের উপকার করিতে হইলে ও তাঁহাকে একটু ভাল ভাবে রাখিতে হইলে, সারদার দ্বারা সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সারদার হস্তে সময়ে সময়ে আবশ্যক মত অর্থ প্রদান করিলেই শ্যামলালের কাজে লাগিবে, অথচ আমরাই দিতেছি ইহা জানিতে না পারায়, শ্যামলাল বাবু কুণ্ঠিত হইবেন না। বলিলেন,—“এ কথা শ্যামলাল বাবুর মনে হওয়া অসম্ভব নহে। তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার হস্তে আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া কিছু কিছু টাকা দিতে পারি। তুমি আমাদের নিকট টাকা পাইতেছ, এ কথা না বলিয়া, শ্যামলাল বাবুর জন্য আবশ্যক মত খরচ করিতে পারিবে।”

সারদা বলিল,—“আহা বাবুর জন্য আমি চুরি ডাকাইতি করিতে পারি, এ সামান্য কথা আপনি কি বলিতেছেন! বাবু যে কষ্টে আছেন তাহা দেখিলে বুক

ফাটিয়া যায়। আপনি দয়া করিয়া আর একটু সরিয়া আসুন।”

নীলরতন বাবু আর একটু অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বে শ্যামলাল কর্ত্তৃক অধিকৃত, অধুনা সারদার অবস্থান স্থানের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। সারদা দেখাইয়া বলিল,—“ঐ দরমায়—ঐ খড়ের বালিস মাথায় দিয়া বাবু শুইয়া থাকেন। এক সময়ে মকমলের বিছানায় যিনি শুইয়া থাকিতেন, দশ জন লোকে যাঁহার সেবা করিত, আজি তাঁহার এই দুর্দ্দশা। একখানি ছেঁড়া কাপড় আর একটী ভাঙ্গা পাথর তাঁহার সম্বল। মহাশয়, দুঃখী লোকেও এমন দুঃখ সহিতে পারে না! রাজরাজেশ্বরের এ কষ্টের কথা ভাবিলেও প্রাণ ফাটিয়া যায়। কি করিব? আমি বড় অসময়ে অসিয়া পড়িয়াছি, এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়াও যাইতে পারি না। হাতে যাহা ছিল সকলই গিয়াছে; এখন কেবল কষ্টই দেখিতেছি।”

সারদার কথায় হাতে হাতে ফল ফলিল। নিরীহ সাধু নীলরতন বাবু এ সকল কথা সম্ভব ও সত্য বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি বলিলেন,—“সারদা, আমি রাজার নিকট এ সকল সংবাদ অদ্যই লিখিয়া পাঠাইব। তোমার বিশেষ পুরস্কার হইবে, সে বিষয়ে কোনই ভুল নাই। তুমি যাহাতে খাওয়া পরা ছাড়া কিছু কিছু করিয়া মশহারা পাও তাহার ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করিয়া

দিব। আর শ্যামলাল বাবুর খরচের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাও আমি আনাইয়া দিব। তুমি এ অবস্থায় বাবুকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমার এই গুণে রাজা তোমার নিকট চিরদিন উপকৃত থাকিবেন।”

সারদা বলিল,—“ছাড়িয়া যদি যাইবার হইত, তাহা হইলে এত দুঃখ সহিয়া এখানে পড়িয়া থাকিতাম না। সেই মনিবের এই কষ্ট, ইহা দেখিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে কি? ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইতে হইলেও আমি এখানে পড়িয়া থাকিব; সাধ্যমতে বাবুর দুঃখ দূর করিব।”

নীলরতন বাবু বলিলেন,—“আমার হাতে আপাততঃ দশ টাকা আছে, ইহা তুমি লও; রাত্রিতে শ্যামলাল বাবু আসিলে, তাঁহার যত্ন করিও। কোথা হইতে জিনিষ-পত্র বা পয়সা-কড়ি আসিতেছে, তাহা তাঁহাকে বলিয়া কাজ নাই।”

সারদা হাত পাতিয়া নীলরতন বাবুর টাকা হাতে লইল এবং বলিল,—“আমাকে তাহা শিখাইতে হইবে না। আমি বলিব, আমার এক মাসী সাত আট দিন হইল কাশী আসিয়াছেন। তাঁহার অনেক টাকা-কড়ি আছে; সকলই তিনি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, আমার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া। আমি অতি কষ্টে আছি দেখিয়া তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আরও দিবেন।”

নীলরতন বলিলেন,—"উত্তম পরামর্শ। এ কথায় শ্যামলাল বাবুর কোন আপত্তি, বা সঙ্কোচ হইবে না। তুমি আপাততঃ তৈল, ভাল একটা আলো, একখানা কম্বল কোন উপায়ে আনাইয়া ফেল; আর রাত্রির জন্য কিছু ভাল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ কর। তাহার পর কল্য প্রাতে তুমি আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না কি?"

সারদা বলিল,—"কেন পারিব না? প্রাতে কি করিতে হইবে?"

নীলরতন বলিলেন,—"প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আমি তোমাকে আর এক শত টাকা দিব। তুমি তাহার দ্বারা শ্যামলাল বাবুর জন্য ভাল বিছানা ও অন্যান্য জিনিষ-পত্র খরিদ করিও। টাকা মাসীর নিকট পাইতেছ ছাড়া আর কিছুই বলিও না। এ স্থানটা অতি কদর্য্য, এখানে থাকিলে শ্যামলাল বাবুর কঠিন পীড়া হওয়াও অসম্ভব নহে। একটা ভাল বাসায় তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইবে। যদি কাশীর ভিতরে থাকিতে তাঁহার ভাল না লাগে, তাহা হইলে সিকরোলের দিকেও কোন বাড়ীতে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। খরচপত্রের কোন চিন্তা করিও না। আবশ্যক মত সমস্ত টাকাই রাজা দিবেন। আজি রাত্রিতে এ সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিবে।"

সারদা বলিল,—"যে আজ্ঞা! এ সকল কার্য্যই আমি ঠিক করিতে পারিব। মাসীর নিকট টাকা পাইতেছি, টাকার সহিত রাজার কোন সম্বন্ধ নাই, আর টাকা অন্য কোন লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনাও নহে, ইহা বলিলে কোন বিষয়েই তিনি কোন আপত্তি করিবেন না; সকল কথাতেই খুসী হইয়া রাজি হইবেন।"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"তোমার সহিত দেখা হওয়ায় আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। শ্যামলাল বাবুর জন্য আমাদের সকলেরই বড়ই উদ্বেগ ছিল। দেখিতেছি, তোমার সাহায্যে সে উদ্বেগ নিবারণের উপায় সহজেই হইবে। আমি এক্ষণে বিদায় হই; তুমি কল্য প্রাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভুলিও না।"

সারদা বলিল,—"রাধাকৃষ্ণ! বাবুর হিতার্থে কাজ করিতে আমার কি ভুল হয়? আমি নিশ্চয়ই প্রাতে মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইব।"

সারদা আবার প্রণাম করিল। নীলরতন বাবু প্রস্থান করিলেন।

সারদা মনে মনে ভাবিল,—"অনায়াসে জীবনপাত করিবার অতি উত্তম উপায় হইয়াছে। রাজার শ্বশুরের নিকট হইতে সহজেই মাসে মাসে অনেক টাকা আদায় হইবে; অথচ মাসীর নিকট পাইতেছি বলিয়া চাপিয়া

রাখিব। বেশ উপায় বটে; কিন্তু সে হতভাগা শ্যামলাল যে আমার হাতছাড়া হইল। আমার নিকট থাকিলে তাহার সকল দিকেই ভাল হইত।”

তাহার পর আবার ভাবিল,—“কথা তো চাপা থাকিবে না। শীঘ্রই শ্যামলাল জানিতে পারিবে—রাজা তাহাকে টাকা দেন। তখন নিশ্চয়ই বড় গোল বাধিবে। না, এত গোলে কাজ কি? একশ টাকা, আর এই দশ টাকা—মন্দ কি? ইহাই এখন যথেষ্ট।”

পরদিন প্রাতে নীলরতন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সারদা কথামত একশত টাকা গ্রহণ করিল। কিন্তু সে আর সে বাসায় ফিরিল না; কাহাকেও কোন কথা জানাইল না। কাশীতে সারদা আর কাহারও চক্ষুতে পড়িল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবদর্শন।

যে দিন প্রাতে নীলরতন বাবুর নিকট হইতে টাকা লইয়া সারদা প্রস্থান করে, তাহার পর দিন প্রত্যূষে তিনি বারাণসীর দক্ষিণ-পশ্চিম-সামান্তস্থিত এক ক্ষুদ্র অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অরণ্য মধ্যে একটু মনোহর পরিস্কৃত স্থানে মহাত্মা ঘনানন্দ অবস্থান করেন।

দুইজন শিষ্য ঘনানন্দের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আশ্রমের আবশ্যক কর্ম্মসমূহ নির্ব্বাহ করিয়া, এক্ষণে গুরুদেবের সমীপে বসিয়া, পাতঞ্জল দর্শনের পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়েরই সম্মুখে হস্তলিখিত পুঁথি খোলা রহিয়াছে। ঘনানন্দের পুঁথির প্রয়োজন হয় না; তিনি মুখে মুখেই সূত্র সমূহের আবৃত্তি ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমাধি-পাদের ২য় সূত্রের ব্যাখ্যা চলিতেছে। সূত্রটী এই :—"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা স্মৃতয়ঃ।" মহাত্মা ঘনানন্দ উৎসাহ সহকারে বুদ্ধিমান ও উপযুক্ত শিষ্যদ্বয়কে তন্ন তন্ন করিয়া শাস্ত্রার্থ বুঝাইতেছেন। এইরূপ সময়ে

নীলরতন বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, দূর হইতে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, কয়দিন আপনার সাক্ষাৎ পাই নাই। বাটীর সমস্ত কুশল।"

নীলরতন বলিলেন,—"আপনার কৃপায় অকুশলের কোনই কারণ দেখিতেছি না।"

তাহার পর ঘনানন্দ শিষ্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বোধ হয় এক্ষণে আর পাঠের সুবিধা হইবে না। তোমরা কর্ম্মান্তরে গমন করিতে পার, অথবা আপনারা পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা করিতে পার।"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য। যে স্থানের এক্ষণে আলোচনা চলিতেছিল, তাহার মর্ম্ম আমরা একরূপ পরিজ্ঞাত আছি। আজি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের মুখে তাহার তাৎপর্য্য শুনিতে পাইয়া ধন্য হইবার আশা করিয়াছিলাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনি নাকি বড় প্রতারিত হইয়াছেন?"

নীলরতন সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সে কি কথা! এরূপ আজ্ঞা কেন করিতেছেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কথা সত্য। কল্য সারদা নাম্নী এক ব্যভিচারিণী নারী শ্যামলাল বাবুর হিতার্থ আপনার

নিকট একশত টাকা এবং পূর্ব্ব দিন বৈকালে দশ টাকা লয় নাই কি ?”

নীলরতন বাবু বলিলেন,—“আজ্ঞা হাঁ, টাকা লইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহাতে প্রতারণার কথা কি ঘটিয়াছে ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,— “ঐ নারীর সহিত শ্যামলালের কোনই সম্বন্ধ নাই। শ্যামলাল তাহারই ভয়ে আশ্রয় ছাড়িয়া পলাইয়াছেন এবং দুর্গাবাটীর নিকট গাছতলায় পড়িয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সারদা সে টাকা লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে।”

নীলরতন সবিস্ময়ে বলিলেন,—“বলেন কি প্রভো !”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“ঐ দেখুন, দূরে শ্যামলাল আসিতেছেন। আমার আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।”

নীলরতন দেখিতে পাইলেন, অদূরে অতীব বিনীতভাবে শ্যামলাল দণ্ডায়মান। তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া ভূপৃষ্ঠে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং বহুক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলে, তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন। অন্য কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি না থাকায়, তিনি এতক্ষণ নীলরতন বাবুকে দেখিতে পান নাই। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলেন।

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কে? আমার নিকট কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি কে, তাহা বলিতে আমার সাধ্য নাই; কারণ আমার কোন পরিচয় নাই, আমি জানি, আপনি আমার গুরুর গুরু; আপনাকে দূর হইতে দর্শন করাই আমার অভিপ্রায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ঐ স্থানে উপবেশন করুন।"

শ্যামলাল, ছিন্ন বস্ত্রে আপনার চরণ ঢাকিয়া, সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি কি আর মরুয়াডির নিকট সে ঘরে থাকেন না?"

"আজ্ঞা না। যে দিন সত্রে আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিবার প্রার্থনায় মহাশয়ের নিকট আসিয়া ছিলাম, তাহার পূর্ব্ব দিন হইতে সে আবাস আমি পরিত্যাগ করিয়াছি।"

নীলরতন বলিলেন,—"ছয় সাত দিন আপনার কোন সন্ধান না পাইয়া, আমি পরশু বৈকালে সেই স্থানে গিয়াছিলাম। আপনাকে দেখিতে পাইলাম না; সারদা নাম্নী একটী স্ত্রীলোককে সেখানে দেখিতে পাইলাম।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সে এতদিন সেখানে রহিয়াছে! ভাবিয়াছিলাম, আমি চলিয়া আসিলে, সেও সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবে!"

নীলরতন বলিলেন,—"সে আপনার সম্বন্ধে অনেক আত্মীয়তার কথা বলিল। আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, আপনার খরচের জন্য তখনই তাহার হাতে দশ টাকা এবং পরদিন প্রাতে এক শত টাকা দিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সাত দিনের মধ্যে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ নাই ; তাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। সে নিশ্চয়ই টাকা ঠকাইয়া লইয়াছে। আমার কোন প্রয়োজন হইলে আমি মহাশয়ের নিকট স্বয়ং চাহিয়া লইতাম। এক সঙ্গে এক শত টাকা দূরের কথা, দশ টাকারও প্রয়োজন আমার এ জীবনে উপস্থিত হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যদি টাকা নষ্ট হওয়ায় মহাশয়ের কষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে সারদার সন্ধান করা উচিত।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে চেষ্টা অনাবশ্যক। টাকা নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই এ অবস্থায় সৎপরামর্শ।" শ্যামলালকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি এখন কোথায় থাকেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কোথায়ও থাকি না বলিলেই হয়। রাত্রিতে প্রায়ই দুর্গাবাড়ীর নিকট এক গাছতলায় পড়িয়া থাকি। দিনমান এদিক ওদিক করিয়া কাটিয়া যায়।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপে বাস বড়ই কষ্টকর ও

অসুবিধাজনক। একটা নির্দ্ধারিত ঘরের মধ্যে বাস করা আবশ্যক।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“কেন এরূপ মনে করিতেছেন? আমার দেহে এই যে গামছা ও এই ছেঁড়া কাপড় দেখিতেছেন, ইহা ছাড়া এ সংসারে আমার আর কোন্ পদার্থ নাই। সুতরাং জিনিষ-পত্র রাখিবার জন্য একটা স্থানের কোন প্রয়োজন দেখি না। তাহার পর আশ্রয় থাকিলেই উপসর্গ জুঠিতে আইসে। আমি এ অবস্থায় আরও সুখী হইয়াছি।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“সংসারে আপনার কে আছেন?”

শ্যামলাল অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“যে যে লোককে মনুষ্য আপনার লোক বলিয়া উল্লেখ করে, আমার সেরূপ কোন আত্মীয় এ সংসারে নাই। তবে অনেক মনুষ্য যাহাকে সকলের অপেক্ষা আপনার লোক বলিয়া জ্ঞান করে, আমার সে স্ত্রী আছেন।”

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—“আপনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ভাবে একাকী কাল কাটাইতেছেন কেন?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি তাঁহাকে ত্যাগ করি নাই। তিনিই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিলে অসঙ্গত হয় না।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“সেই দুঃখেই কি আপনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন?”

শ্যামলাল বলিলেন,—"আজ্ঞে না। সে জন্য দুঃখ করিবার কোনই কারণ নাই। তিনি আমাকে অন্যায়রূপে বা অকারণ ত্যাগ করেন নাই। আমি কাহারও দয়ার যোগ্য পাত্র নহি।"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনার নাম কি?"

"শ্যামলাল।"

"আপনিই কি পূর্ব্বে সোণাপুরের জমিদার ছিলেন?"

"না জানিয়া, অকারণ অনেক দিন আমি সেই পদ অধিকার করিয়াছিলাম বটে।"

"আপনার স্ত্রী বিধুমুখীর আপনি কোন সংবাদ রাখেন কি?"

না। "শুনিয়াছি রাজার আশ্রয়ে তিনি সুখ-স্বচ্ছন্দে আছেন।"

"তিনি সম্প্রতি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। রাজার আশ্রয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে ছিলেন সত্য, কিন্তু সহসা কোন দুষ্ট লোক সে স্থান হইতে তাঁহাকে হরণ করিয়াছে।"

"নিশ্চয়ই ইহা সেই হরিচরণের কার্য্য। সে আর একবার কাশীতে এইরূপ কাণ্ড করিয়াছিল। যে স্ত্রীলোক এক শত দশ টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে সেবার সন্ধান পাইয়া আমি বিধুমুখীর উদ্ধার করিয়াছিলাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—এবারও বিধুমুখীর উদ্ধারের জন্ম আপনার চেষ্টা করা উচিত নহে কি ?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। আমি সংসারের একটা অতি সামান্য কীট। আমার সাহায্যে কাহারও কোন উপকার হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ বিধুমুখী যাঁহাদের আশ্রয়ে আছেন, তাহারা সকলেই মহাত্মা। তাঁহারা নিশ্চয়ই এজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমি তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী কি উপায় করিব ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“আমি জ্ঞাত আছি, বিধুমুখী আপনার দর্শন কামনায় নিতান্ত ব্যাকুলা। সে কারণেও তাঁহার সন্ধান করা আপনার উচিত নহে কি ?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“তাঁহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমি যখন পাপের সাগরে গা ভাসাইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি, তখন তাঁহার সহিত কোন পরামর্শ করি নাই। তিনি যখন পাপে মজিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন তখন সে সম্বন্ধে আমার সহিত কোন মন্ত্রণা করেন নাই। আমরা উভয়ে উভয়কে ইচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছি। এখন আর তাঁহার জন্য আমার ব্যাকুলতা, বা আমার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা অনাবশ্যক।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“ভরসা করি আপনার সহিত

আরও অনেকবার সাক্ষাৎ হইবে। তখন এ বিষয়ে আবার কথাবার্ত্তা হইবে। এক্ষণে আমি আপনার ও নীলরতন বাবুর কথা শুনিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে, আপনি সংপ্রতি যে অবস্থায় আছেন, তাহা আপনার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর। আপনাকে অনেকেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনি কেন একটু ভালভাবে কাল কাটাইতে আরম্ভ করুন না?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"ভগবান্ কি বুঝিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। আমি কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় পরম সুখে আছি। এত সুখ জীবনে আর কখন ভোগ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। এরূপ স্বচ্ছন্দতা, এরূপ নিশ্চিন্ততা, এরূপ সদানন্দ ভাব আমার জীবনে কখন ছিল না। কেবল একটী মাত্র কষ্ট আমাকে এখনও সময় সময় ব্যথিত করে। আমি তাহারই প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল আছি। সেই অসুখ পরিহার করিতে পারিলে, আমি নিষ্কণ্টক হইয়া সুখ ভোগ করিতে পারিব সন্দেহ নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কি অসুখ?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বে অনেক পাপ করিয়াছি; তাহার তালিকা প্রদান করা অসম্ভব। কোন প্রকার পাপেই আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। অল্পমাত্র

কারণে, অথবা অকারণে আমি লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। ক্ষণিক সুখের জন্য আমি সংসারে হাহাকার শব্দ উঠাইয়া দিয়াছি। সংসারের সকল সুখ-দুঃখই আমাকে এখন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু সেই পূর্ব্বকৃত পাপের স্মৃতি আমাকে এখনও ছাড়ে নাই। এখনও সেই সকল পাপের কথা যখন তখন আমার মনে হয় এবং আমাকে বড়ই জ্বালাতন করে। এই একমাত্র অসুখে আমি কাতর আছি। আর সর্ব্বপ্রকারেই আমি পূর্ণ সুখী।"

নীলরতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঘনানন্দ বলিলেন,—"আমাদের যে বিষয়ের পাঠ চলিতেছিল, শ্যামলাল বাবু সেই বিষয়ের কথাই উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আজি বেলা অধিক হইল; আপনাদের সকলেরই এ সময়ে অসুবিধা উপস্থিত হইবে; সুতরাং সে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এক্ষণে সম্ভবপর নহে। আমি সংক্ষেপে শ্যামলাল বাবুকে কয়েকটী মাত্র কথা বলিতেছি। মানুষের চিত্তে অনেক প্রকার বৃত্তি আছে। তৎসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিতে পারাই সুখের পূর্ণ অবস্থা। সেই সকল বৃত্তিই একটী স্মৃতি। এই সকল বৃত্তি-নিরোধ করা অনেক প্রক্রিয়া, অনেক প্রণালী ও অনুশীলন সাপেক্ষ। তাহার উপদেশ আপনি জানিতে বাসনা করিলে, আমি ধারাবাহিকরূপে তাহা আপনাকে বলিব।

আপাততঃ সংক্ষেপে একটী সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় আপনাকে বলিয়া দিতেছি। আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাঁহার কথা আমি কখন ভাবিয়া দেখি নাই; কোন আবশ্যকও বোধ করি নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"উমাশঙ্কর আপনার গুরু, আমি তাঁহারও গুরু। আমাদিগের উপর আপনার কিরূপ বিশ্বাস আছে?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি জানি আপনারা মানুষ। সাধনা, চেষ্টা, শিক্ষা প্রভৃতি উপায়ে আপনারা অন্যান্য মানুষের অপেক্ষা প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ইহা কি আপনার মনে হয়, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আমরা লাভ করিয়াছি? আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহার উপর আর জ্ঞান নাই?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তাহা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়, জ্ঞান অশেষ; আপনারা তাহার অনেক লাভ করিয়াছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহা হইলে ইহা আপনি জানেন, অশেষ হইলেও, কোন না কোন স্থানে সেই জ্ঞানের অবশ্যই শেষ আছে এবং আমি, বা রাজা, বা আপনি, বা নীলরতন বাবু, বা আমার এই শিষ্যদ্বয় অশক্ত

হইলেও, কোন না কোন ব্যক্তি সেই জ্ঞানের পূর্ণাধিকার লাভ করিয়াছেন ?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“ইহা অসম্ভব নহে। কোথায় কেহ পূর্ণজ্ঞানী থাকিলেও থাকিতে পারেন।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তাহাই আছেন। ঘটনাসূত্রে আপনি রাজাকে জানিতে পারিয়াছেন। আবার সেই সূত্র অবলম্বনে আমাকে জানিতে পারিয়াছেন। আরও চেষ্টা করুন, ক্রমে সেই পূর্ণজ্ঞানীরও সন্ধান পাইবেন। সেই পূর্ণজ্ঞানী পুরুষই-ভগবান্। তিনি দয়াময়, শান্তিময়, কার্য্যময় এবং সর্ব্বময়। আপনি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। আপাততঃ আপনি এই বারাণসী পুরাধীপ বিশ্বেশ্বর অথবা বৃন্দাবনবিহারী গোপীনাথের রূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহাকে হৃদ্‌গত করিতে অভ্যাস করুন। তাহা হইলেই আপনি ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, এ সংসারে আমরা কিছুই করি না। আমরা কর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে ফাটিয়া মরি বটে, কিন্তু কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আমাদের শক্তি নাই। সকল কার্য্যই সেই সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বকার্য্যময়, ভগবানের বাসনায় সম্পন্ন হয়। ক্রমে এই বোধ হৃদয়ে উপজাত হওয়ার পর, আপনি বুঝিতে পারিবেন, কোন পুণ্যের গৌরবেও আপনার অধিকার নাই, কোন পাপের আক্রমণেও আপনার আশঙ্কা নাই। যে কিছু পাপ বা পুণ্য সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটিয়াছে।

আপনি পাপ করেন নাই। করিতে আপনার কোন সাধ্যও নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"মহাপুরুষের প্রদর্শিত উপায়ে আমি অদ্য হইতেই ভগবানকে সন্ধান ও বিশ্বাস করিতে চেষ্টা এবং অভ্যাস করিব। ফল যেরূপ হয়, তাহা আপনার চরণে নিবেদন করিব।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনার যখন ইচ্ছা তখনই আমার নিকট আসিবেন। যতক্ষণ ইচ্ছা আমার নিকট থাকিবেন। আমি তাহাতে সুখী হইব। আপনার মনে যে সামান্য ক্লেশ আছে, তাহা অচিরে তিরোহিত হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি ভগবানের কৃপায় অনুগৃহীত হইলাম। প্রার্থনা করি, এ কৃপায় যেন আমাকে বঞ্চিত হইতে না হয়।"

নীলরতন বলিলেন,—"এক্ষণে বেলা অধিক হইল; আমি বিদায় প্রার্থনা করি। শ্যামলাল বাবুর সহিত কথা উপলক্ষে অনেক তত্ত্বকথা শুনিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। পাতঞ্জলের ঐ অংশ কখন আলোচিত হইবে জানিতে পারিলে, সেই সময় শ্রীচরণ সমীপে আগমন করিতাম।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শিষ্যগণ হয় তো অদ্যই ঐ অংশের পাঠ সমাপ্ত করিবে। কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কি? আপনি যে সময় আগমন করিবেন, তখনই উহার পুনরালোচনা হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এ অধমও এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।"

কথা সমাপ্তের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলাল ভূপৃষ্ঠে পূর্ব্ববৎ দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন,—"যাও বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার চিত্তচাঞ্চল্য অচিরে বিনষ্ট হইবে।"

নীলরতন বাবু ভক্তিভাবে ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। শ্যামলাল ও নীলরতন এক সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।

অন্নপূর্ণা।

ষষ্ঠ খণ্ড—জ্যোতিঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চতুর।

আজিমগঞ্জে ভাগীরথী তীরে মহারাণী যে বস্ত্র দান ও দরিদ্রভোজন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিন দিনে প্রায় দুই লক্ষ লোক বিবিধ উপকরণসহ অন্নাদি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছে। চতুর্থ দিবসে মণ্ডপাদি উঠাইতে আরম্ভ করা হইল। বাঁশ, দরমা প্রভৃতি সামগ্রী নিলামে বিক্রীত হইল এবং অন্যান্য সামগ্রী শকটযোগে চন্দ্রমালায় প্রেরিত হইল। এই কাণ্ডে যাহাতে কোনরূপ বিঘ্ন বা দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস সাহেব অন্যান্য কর্ম্মচারী-সহ, ক্রিয়াস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পর মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

চতুর্থ দিবস সন্ধ্যার সময় সে স্থানে দুইটী মাত্র ক্ষুদ্র মণ্ডপ ব্যতীত আর সকলই উঠাইয়া ফেলা হইল। যে দুইটী মণ্ডপ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার

একটীতে মহারাণী করুণাময়ী এবং তাঁহার সেবিকাগণ এবং অপরটীতে দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ বাবু, পরিচারিকগণ, রক্ষীগণ প্রভৃতি অবস্থান করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর একখানি গাড়ির চারি পাইয়ের উপর জীবনকৃষ্ণ বাবু একাকী বসিয়া আছেন; তাঁহার নিকটে আর কোন লোক নাই। দ্বারবান্ আসিয়া সংবাদ দিল, যে বাবু পরশু সন্ধ্যার সময় আসিয়াছিলেন, তিনি এখন দেখা করিতে আসিয়াছেন। জীবন বাবু তাহাকে আনিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

মাথায় চাদর বাঁধা, গায়ে পাঞ্জাবী জামাধারী হরিচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে, তাঁহার চরণদ্বয় একটু চঞ্চল। তিনি আসিয়াই বলিলেন,—"কথাটা মনে আছে তো? সেই—সেই মোকদ্দমার কথা? ভুলিয়া গিয়াছেন বুঝি? সেই যে বিধুমুখীর স্বাক্ষী দেওয়ার কথা।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"না মহাশয়, আমি কোন কথাই ভুলি নাই। বিধুমুখীর সম্বন্ধে আপনি আমাদিগকে কি করিতে বলিতেছেন?"

হরিচরণ বলিল,—"তবেই তো আপনি সবই ভুলিয়া গিয়াছেন। যে মোকদ্দমা সম্প্রতি চলিতেছে, তাহার জন্য যদি বিধুমুখীকে হাতে করিতে পারেন, তাহা হইলে জয়ের পক্ষে কোনই সন্দেহ থাকে না।"

জীবন জিজ্ঞাসিলেন,—"বিধুমুখী কোথায় আছেন ?"

হরিচরণ বলিলেন,—"তাহা আমি আগেই আপনাকে বলিব কেন ? ধরুন বিধুমুখী আমার হাতেই আছে।"

জীবন বলিলেন,—"মোকদ্দমায় জয়লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাহাতে বিধুমুখীর লাভ কি ?"

হরিচরণ বলিল,—"আপনি এত বড় ষ্টেটের দেওয়ানী করেন, আর এই তুচ্ছ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না! বিধুমুখীর এখন কিছু নাই—আপনারা তাহাকে কিছু সাহায্য করিবেন। আর রাজা উমাশঙ্কর, বুঝিয়া দেখুন না কেন, আমাদের প্রবল শত্রু ; তাঁহাকে জব্দ করাও আমাদের একটা দরকার।"

জীবন বলিলেন,—"তাহা আমি বুঝিলাম। কিন্তু কাহাকেও ঘুষ দিয়া বা কাহারও সহিত শত্রুতা সাধিবার সহায়তা করিয়া, মোকদ্দমা করা বোধ হয় আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিধুমুখী কোথায় আছেন, এ সংবাদ আপনি জানাইলে, আমরা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করিতে পারিতাম।"

হরিচরণ বলিল,—"আপনার কিছু মতলব আছে কি ? বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ বটে। আমি অনেক দিন হইতে রাখিয়াছি। এখন আর বড় ভাল লাগে না। তা আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে না পাইতে

পারেন এমন নহে; কিন্তু টাকার কর্ম্ম দাদা। সে নিজে টাকা চাহিবে না। আমার হাতে টাকা দিয়া বাবস্থা করিতে হইবে।”

এই পাষণ্ডের এই সকল ঘৃণাজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া জীবন বাবুর মনে অতিশয় ক্রোধ হইতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া তিনি এই নরাধমের সহিত কথা কহিতে থাকিলেন। বলিলেন,—“বিধুমুখী তো ছিলেন রাজা উমাশঙ্করের আশ্রয়ে। আপনি তাহাকে পাইলেন কোথা? শেষে পাছে বিধুমুখী লইয়া মোকদ্দমা করিতে গিয়া আমরা সকল দিক নষ্ট করিয়া ফেলি, এই জন্যই ভয় হয়।”

হরিচরণ বলিল,—“আপনি এবারে একটা দেওয়ানী চাইলের কথা কহিয়াছেন বটে। আমি একবার জালের মোকদ্দমায় পড়িয়া সাজা পাইয়াছি, কাজেই আপনি সন্দেহ করিতেছেন। তা দাদা, বড় বড় মোকদ্দমা করিতে গেলেই এক আধটা গোলমাল হইয়া পড়ে। সেটা কিছু নয়। একটা দলিল জাল হইয়াছিল বলিয়া যে একটা মানুষ জাল হইবে এমন কোন কথা হইতে পারে না। আপনি বলিতেছেন, বিধুমুখী উমাশঙ্করের কাছে ছিল, আমি তাহাকে পাইলাম কোথা? কথাটা ঠিক। কিন্তু কি জানেন, অনেক দিনের ভাব। তা যাহাই হউক, সে কথায় আর কাজ নাই। অনেক

কাণ্ডের পর বিধুমুখী আমার হাতে পড়িয়াছে। আপনি কি তাহাকে দেখিতে চাহেন?"

জীবন বলিলেন,—"আমি দেখিতে চাহি না। তবে আমি জানিতে চাহি, যাহার কথা আপনি বলিতেছেন, তিনিই প্রকৃত বিধুমুখী কি না। তিনি যদি প্রকৃত হন, তাহা হইলে আপনার সহিত অন্যান্য বন্দোবস্ত স্থির করিয়া, তাঁহাকে হস্তগত করার আপত্তি নাই।"

হরিচরণ বলিল,—"আপনি যদি দেখিতে না চাহেন, তবে বুঝিবেন কিরূপে, তিনি আসল কি নকল?'

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"তাহার অতি সহজ উপায় আছে। বিধুমুখী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে মহারাণী মাতার সহিত দেখা করিতে পারেন। মহারাণী মাতা বুঝিলেই সব ঠিক হইবে। তিনি আজ্ঞা করিলেই আমি মহাশয়কে টাকা-কড়ি দিয়া আবশ্যকমত বন্দোবস্ত শেষ করিব।"

হরিচরণ বলিল,—"আরে ছ্যাঃ। আপনি বুঝি এই রকমের দেওয়ানী করেন? সকল কাজই বুঝি আপনাকে মুনিবের হুকুম লইয়া করিতে হয়? আমরাও দেওয়ানী করিয়াছি। সে ষ্টেট এত বড় না হইলেও, প্রায় ইহারই মত। তা মহাশয়, আমি যাহা করিতাম তাহার উপর কথা কহে কাহার সাধ্য! আমার হুকুমই বলবান ছিল। প্রতি কথায় মুনিবের মত জানিয়া কাজ করিতে হইলে চলে কি?"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"সকল মানুষ সমান কাজের লোক হয় না। আপনি অতি যোগ্য লোক বলিয়া হয় তো আপনাকে মুনিব স্বাধীন ভাবেই কাজ করিতে দিতেন। আমাদের তত সাহস হয় না। আপনি শেষ সাক্ষাতের দিন বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার মতামত আপনি শুনিতে চাহেন না; আমার মুনিবের মতামত জানাই আপনার দরকার। তবে এ বিষয়ে আপনি আমাকে আবার স্বাধীন-ভাবে মত দিতে বলিতেছেন কেন? সে যাহা হউক, এখন বিধুমুখীর সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

হরিচরণ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"বিধুমুখী আমার হাতেই আছে। আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বিধুমুখীকে একবার দেখাইয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনাদের মহারাণীর কাছে তাহাকে আসিতে দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না।"

"কেন?"

"তাহাকে হাতছাড়া করিতে আমার সাহস হয় না। অনেক কষ্টে এবার আমি তাহাকে হাতে পাইয়াছি। এক কথায় যে তাহাকে আবার হাতছাড়া করা, সেটা আমি ভাল বুঝি না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। এ সম্বন্ধে যে টাকার আপনি প্রস্তাব করিতেন, তাহা দিতে আমরা নারাজ হইতাম না। কিন্তু আসল কি

নকল মানুষ তাহা ঠিক না করিয়া, আমরা টাকার কথা কহিতে পারি না। আপনার যেরূপ বিবেচনা, তাহাই করুন।”

হরিচরণ বলিল,—“তবে মহারাণীর কাছে বিধুমুখী আসিয়া আলাপ না করিলে আপনারা এ বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, কেমন? ভাল, আমি এ বিষয়টা একবার ভাবিয়া দেখি, তাহার পর আপনাকে সংবাদ দিব। সংবাদই বা দিব কখন? আপনারা তো কালি প্রাতেই চলিয়া যাইতেছেন?”

জীবন বাবু বলিলেন,—“কালি প্রাতেই আমাদের যাইবার কথা ছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় যাওয়া ঘটিবে না। এখানে দুই একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ উপস্থিত হওয়ায়, আমাদিগকে কালি থাকিয়া যাইতে হইবে।”

হরিচরণ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—“তাহা হইলে যেরূপ স্থির করি কালি প্রাতেই আপনি তাহার সংবাদ পাইবেন। এখন আসি দাদা।”

হরিচরণ প্রস্থান করিলে, জীবনকৃষ্ণ সংবাদ পাঠাইয়া মহারাণী করুণাময়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহারাণী তখন একখানি মৃগচর্ম্মের উপর সমাসীনা। জীবনকৃষ্ণ দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

করুণাময়ী বলিলেন,—“সেই দুর্বৃত্ত হরিচরণ আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল?”

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"হাঁ মা। সে পাষণ্ডের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমার বড়ই লজ্জা হইতেছে।"

মহারাণী বলিলেন,—"তা হউক, বিধুমুখীর সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছ বল?"

জীবন বলিলেন,—"বিধুমুখীকে এই নরাধম লইয়া আসিয়াছে; নিকটেই কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কালি প্রাতে হরিচরণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। আমি টাকার লোভ দেখাইয়াছি। হয় তো বিধুমুখীকে মহারাণী মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেও দিতে পারে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"তাহার কথায় নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। যেমন করিয়া হউক, বিধুমুখীকে হস্তগত করা চাই। তুমি এজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখ—লোক নিযুক্ত কর। কালি আর আমাদের যাওয়া হইবে না।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"আমি তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি এবং তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছি।"

মহারাণী বলিলেন,—"সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত আছ; এক্ষণে যাও, আহারাদি করিয়া বিশ্রাম কর গিয়া।"

জীবনকৃষ্ণ পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

বালুচরের এক জঘণ্য পল্লীতে একখানি অতি সামান্য ঘরের মধ্যে এক সুন্দরী নতবদনে বসিয়া আছেন। সুন্দরী একাকিনী নহেন; তাহার নিকটে আর এক নারী বসিয়া রহিয়াছে। সুন্দরী আমাদের সুপরিচিতা বিধুমুখী; যে নারী তাহার নিকট বসিয়া আছে সে সেই বাড়ীর অধিকারিণী—গোলাপ। গোলাপ এক সময়ে কি ছিল তাহা আমরা জানি না; কিন্তু এখন সে ঘেঁটু ফুলও নহে। তাহার বয়স এখন পঁয়ত্রিশ হইবে। যাহার রূপ থাকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার সে রূপের অপচয় হয় না; বয়সের সহিত রূপ ভাবান্তর ধারণ করে এবং ক্রমেই গাম্ভীর্য্য ও ধীরতা সহকৃত অপূর্ব্ব শোভায় পরিণত হয়। গোলাপের দেহে রূপের কোন লক্ষণই নাই, কখন ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কোনই নিদর্শন নাই। গোলাপ হীনবৃত্তি দ্বারা জীবিকাপাত করে; চরিত্রহীনা স্ত্রীলোক-দের আশ্রয় প্রদান করে; অল্পবয়স্কা বালিকাদিগকে কন্যারূপে পালন করে ইত্যাদি বিবিধ সদুপায়ে সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এই গোলাপ অনেকক্ষণ বিধুমুখীর নিকট বসিয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে অনেক কথা বলিতেছে। সে বলিতেছে,—"তোমার যে রূপ আছে তাহার সিকি আমাদের থাকিলে আমরা দেশ তোলপাড় করিয়া দিতাম। এত রূপের পসরা থাকিতে চুপচাপ বসিয়া থাকা কি ভাল?"

বিধুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। এ কথার কোন উত্তর দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। গোলাপ আবার বলিল,—"ঐ রূপের জোরে সংসারের অর্দ্ধেক লোককে তো গোলাম করিয়া রাখা যায়, আর টাকা লইয়া খেলা করিতে পারা যায়। কেন তুমি ইচ্ছা করিয়া হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছ?"

বিধুমুখী কোন কথা কহিলেন না। গোলাপ বলিল,—"কথা কহিতেছ না কেন? আমি তো ভাল কথাই বলিতেছি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সকল ভাল কথা সকল সময়ে লোকে ভাল বলিয়া বুঝিতে পারে না। তোমার কথা ভাল হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেছি না।"

গোলাপ বলিল,—"ইহার আর বোঝাবুঝি কি? অনেক মানুষ বাধ্য থাকা, অনেকের উপর জুলুম করিতে পাওয়া, অনেকের সহিত আলাপ থাকা ভাগ্যের কথা।

এ কথা তুমি কেন, একটা পাঁচ বছরের মেয়েও বুঝিতে পারে। আর টাকা? টাকা তো আপনি আসিয়া তোমার পায়ে গড়াইয়া পড়িবে। টাকা রোজগার করিতে পারা যে একটা সৌভাগ্য, এ কথা বলিয়া বুঝাইতে হয় কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমার সহিত এ বিষয়ের কোন বাদানুবাদ করিতে আমার প্রয়োজন নাই। তথাপি তুমি বলিতেছ বলিয়া আমি তোমার কথার জবাব দিতেছি। টাকায় আমার কোন দরকার নাই; কেন না আমার কোন অভাব নাই। আমি অনেক টাকা নাড়াচাড়া করিয়াছি, অনেক টাকা হাতে করিয়া খরচ করিয়াছি। কাজেই টাকার সুখ-দুঃখ আমার জানা আছে। টাকার জন্য আমার আর লোভ হইতে পারে না। তুমি কি কটা টাকার কথা বলিতেছ? লক্ষ লক্ষ টাকা আমি কথায় কথায় খরচ করিয়াছি। তত টাকা তোমরা কখন দেখ নাই, তত টাকাওয়ালা কোন লোকের সহিত তোমরা কখনও কথাও কহ নাই। তাহার পর তুমি বলিতেছ, অনেক লোককে বাধ্য করা একটা ভাগ্য। লোক বাধ্য করিতে তো নারীর জন্ম নয়। একজনকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়া তাহার চরণের দাসী হইয়া থাকা, সংসারধর্ম্ম করা, সন্তান পালন করা, এইরূপ কাজই নারীর ধর্ম্ম। ধর্ম্মদ্বারা এইরূপে লোককে বাধ্য করিতে পারিলে, নারীর গৌরব

হয়, সুখ হয় বটে। অনেক লোককে আমি বাধ্য করিতে চাহি না।”

গোলাপ বলিল,—“তা তুমি যে সকল বলিতেছ, সে সব ধর্ম্মের কথা বটে ; বুঝিলাম তুমি খুব টাকার মানুষ ছিলে, টাকায় তোমার আর লোভ নাই। কিন্তু তুমি যে একজনের দাসী হইতে চাহিতেছ, তাহার আর উপায় কি ? আমি শুনিয়াছি তোমার স্বামী আর তোমাকে লইবেন না। তবে কেন বৃথা আশায় বসিয়া রহিয়াছ ?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“তিনি আমাকে লইবেন না— লইতে পারেনও না। কিন্তু তাঁহার দাসী হইয়া থাকিতে কেহই তো আমাকে বারণ করিতে পারে না। তিনি আমাকে লউন বা না লউন, আমি মনে প্রাণে তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব। তাহাই আমার ধর্ম্ম, তাহাই আমি করিব।”

গোলাপ বলিল,—“এত ধর্ম্মের পটপটানি তোমার মুখে আর ভাল শুনায় না। সে একজনকে ছাড়িয়া যখন আর এক জনকে ভজিয়াছ, তখন আর সে বড়াই কেন করিতেছ ?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“ঠিক বলিয়াছ। আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহার পর ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলে লোকের হাসি আসিতে পারে বটে। কিন্তু একদিন মানুষ চুরি করিলে তাহাকে চিরকালই চুরি করিতে হইবে, এমন

কোন কথা আছে কি? আমি পাপীয়সী। পাপের জ্বালায় আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। আর পাপের মাত্রা বাড়াইয়া কাজ নাই।"

গোলাপ বলিল—"আমরা এত কথা জানি না। আমরা জানি একবার পাপও যা দশবারও তা।"

এই সময় কোথা হইতে হরিচরণ ব্যস্তভাবে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

বিধুমুখীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি মুখ ফিরাইয়া নত বদনে বসিয়া রহিলেন। গোলাপ বলিল,—"তুমি আসিয়াছ দাদা? লও ভাই, তোমার মানুষ; যাহা বলিতে হয় তুমি বল। আমি ভাই, হারি মানিয়াছি।"

হরিচরণ বলিল,—"কথা শুনিতে চাহে না বুঝি? সোজা কথায় ওকি কথা শুনিবে? ঝাঁটা আনিয়া ঘা কতক দিতে পার নাই?"

গোলাপ বলিল,—"তা কি ভাই, আমরা পারি? তোমার মানুষ, তুমি যা ভাল বুঝ কর।"

হরিচরণ বলিল,—"আমাকেও আর চাহে না, আমিও উহাকে চাহি না। সে জন্য কোন গোলের কথা নাই। আমি উহাকে ভাল কথাই বলিতেছি। তোমার এখনও রূপ আছে, বয়স আছে, আমি ভাল লোক আনিয়া দিতেছি, তাহাতে তোমার ভাল হইবে, সঙ্গে

সঙ্গে আমারও উপকার হইবে। এমন কথাও শুনে না কেন, বল তো গোলাপ দিদি ?”

গোলাপ বলিল,—“জানি না ভাই। এ পথে নামিয়া আবার ধর্ম্মের ছড়াছড়ি শুনিলে গা জ্বলিয়া যায়। উনি ভাই সতী-সাবিত্রী, আমরা বেশ্যা। আমরা আর কি বলিব ?”

তখন হরিচরণ বিধুমুখীর নিকটে গিয়া বলিল,—“তুমি আমাদের কথা শুনিবে কি না বল ?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“না।”

হরিচরণ বলিল,—“কি স্পর্দ্ধা। আমার কথার উপর সমান জবাব। জানিস্ তোর অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি আছে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—“জানি। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার অপেক্ষা দুর্গতি আর হইতে পারে না। তাহা আমি জানি।”

হরিচরণ বলিল,—“মারিয়া তোর হাড় ভাঙ্গিয়া দিব, জানিস্ ?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। যাহাই কর হরিচরণ, পাপের পথে আমাকে কোন মতেই তুমি আর লইয়া যাইতে পারিবে না।”

হরিচরণ বলিল,—“আচ্ছা, তোরই এক দিন, কি আমারই এক দিন। দেখিব তোর এই অহঙ্কার চূর্ণ হয় কি না।”

দারুণ ক্রোধের সহিত হরিচরণ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। গোলাপও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল।

বাহিরে একটি হিন্দুস্থানী পুরুষ অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মাথায় একটা তাজ, গায়ে জরির বেলদার আবরোঁয়ার পাঞ্জাবী, গলায় সোণার চেন হার, পরিধান কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে বার্ণিষ করা পম্পা সু, বাম স্কন্ধের উপর হইতে যজ্ঞসূত্রাকারে এক বেনারসী ওড়না বিলম্বিত।

এই ব্যক্তির নিকটে আসিয়া হরিচরণ অনেকক্ষণ কথা কহিল। তাহার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং যে ঘরে বিধুমুখী আছেন, সেই ঘরে তাহাকে প্রবেশ করিতে বলিয়া আপনি বাহিরে বসিয়া রহিল। তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

হিন্দুস্থানী যুবা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। হরিচরণ বাহির হইতে শুনিতে পাইল, হিন্দুস্থানী যুবা নানাপ্রকার কথা কহিতেছে। বিধুমুখীর কোন কথাই তাহার কর্ণগোচর হইল না। তাহার পর দুই তিন মিনিট কোন কথাই হরিচরণ আর শুনিতে পাইল না। তাহার পর হরিচরণ শুনিতে পাইল, বিধুমুখী উচ্চ শব্দে হিন্দুস্থানী পুরুষকে অনেক গালি দিতেছেন, তাহার পর সহসা হিন্দুস্থানী পুরুষ কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সয়তানী, মেরা জান লিয়া।"

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্ত্তনাদ। বাটীর চারিদিকে অনেক লোক জমিয়া গেল। হরিচরণ ও গোলাপী দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং দেখিল হিন্দুস্থানীর বাম পার্শ্বে এক ছুরিকা বিদ্ধ রহিয়াছে, তাহার দেহ হইতে রক্ত বাহির হইয়া বহিয়া যাইতেছে, এবং সে অতিশয় যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। আর বিধুমুখী উন্মাদিনীর ন্যায় ভয়ঙ্কর ভাবে ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

হরিচরণ বলিল,—"রাক্ষসী, সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্; আমি তোকে খুন করিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সাবধান! আমার গায়ে হাত দিতে আসিয়া ঐ পাষণ্ডের এই দুর্গতি হইয়াছে। তোমার অদৃষ্টেও ঐরূপ ঘটিবে।"

তখন হরিচরণ ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিয়া একখানি মোটা কাঠ লইয়া গেল এবং বিধুমুখীর মাথা লক্ষ্য করিয়া তাহা মারিতে উঠাইল। গোলাপী তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে সেই কাষ্ঠখণ্ড চাপিয়া ধরিল এবং বলিল,—"আমার বাড়ীতে একি কাণ্ড বাবু! যাহা হইয়াছে তাহার দায়ে এখনই হাতে দড়ী পড়িবে। আবার কেন হেঙ্গাম বাধাইতেছ? ভাল লোক ভাবিয়া তোমাদের জায়গা দিয়াছিলাম। এখন কি সর্ব্বনাশ তোমরা ঘটাইলে দেখ দেখি।"

তখনই বাহিরে তুমুল কোলাহল উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বাগ্রে পুলীসের ইনিস্পেক্টর, তাঁহার পশ্চাতে দারোগা, জমাদার, কনেষ্ট-বল, জীবনকৃষ্ণ বাবু এবং অন্যান্য অনেক লোক।

ইনস্পেক্টর বলিলেন,—"হরিচরণ কাহার নাম?"

জীবনকৃষ্ণ বাবু হরিচরণকে দেখাইয়া দিলেন। ইনিস্পেক্টর তাহাকে হাতকড়ি দিতে আদেশ করিলেন। তখনও হরিচরণের হাতে সেই কাঠ রহিয়াছে। ইনিস্পে-ক্টর বলিলেন,—"এখানে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া একে? এ যে ধরমচাঁদ বাবু। ইনি এদেশের একজন প্রধান ধনী? এ স্থানে ইনি কেন আসিলেন? ইঁহার এ অবস্থা কে ঘটাইল? বোধ হয় হরিচরণ কৌশলে ইঁহাকে এখানে আনিয়া খুন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পর ঐ স্ত্রীলোককে মারিতে যাইতেছিল।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না মহাশয়, ঐ হিন্দুস্থানী পুরুষ বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিতে আসিয়াছিলেন। আমি রক্ষার আর কোন উপায় না পাইয়া উহার দেহে ছুরি মারিয়াছি।"

ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনারই নাম কি বিধুমুখী?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"হাঁ।"

ইনিস্পেক্টর ধরমচাঁদ বাবুর নিকটস্থ হইলেন। ধরম-

চাঁদ বাবুর আঘাত গুরুতর হইয়াছে, কিন্তু সাংঘাতিক হয় নাই। ইনিস্পেক্টর ছুরি খুলিয়া লইলেন। পঞ্জরাস্থির উপর দিয়া চর্ম্মমাত্র ভেদ করিয়া ছুরি চলিয়া গিয়াছে। সহজেই তিনি সারিয়া উঠিবেন বলিয়া সকলের বোধ হইল। অতি সাবধানে ইনিস্পেক্টর ও জীবন বাবু তাঁহার ক্ষতস্থানে কাপড় বাঁধিয়া দিলেন। ধরমচাঁদ বাবু একটু সুস্থ বোধ করিলেন। ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—"কিসে কি হইল আপনি ঠিক করিয়া বলুন।"

ধরমচাঁদ বলিলেন,—"বড় লজ্জার কথা। আজি আমার সুশিক্ষা হইয়াছে। আমার যে শাস্তি হইয়াছে তাহার জন্য আমি দুঃখিত নহি। এ জন্য আমি কাহারও নামে কোনও নালিসও করিতেছি না। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমি আপনাদের নিকট অকপটে বলিতেছি। এই হরিচণ আমাকে এক প্রভূত ধনশালিনী সুন্দরী নারীর কথা বলে। ইহাও বলে যে, সে কোথাও যাইবে না, আপাততঃ সে কুস্থানে আছে, সেখানে আসিয়াই তাহার সহিত আলাপ করিতে হইবে। সহজে স্ত্রীলোক আমার কথায় সম্মত হইবে না। একটু ছলে, কলে, কৌশলে ও বলে তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে। আমার এরূপ অখ্যাতি আপনাদের অবিদিত না থাকিতে পারে। আমি বড় পাপী, হরিচরণের কথায় আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কুস্থানে পড়িয়াছি।"

ধরমচাঁদ নীরব হইলেন। ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল?"

ধরমচাঁদ একটু বিশ্রামের পর বলিলেন,—"তাহার পর এই শাস্তি। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, এ কথা স্বীকার করিয়াছি। কখনই পাপ কার্য্যে আমার আশা নিষ্ফল হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম এবারও তাহাই হইবে। আমি হরিচরণের মুখে শুনিয়াছিলাম ঐ নারী কুলটা। আমি সেই সাহসে, টাকার বলে, দেহের শক্তিতে উহার গায়ে হাত দিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। উনি আমার মা, উহার নিকট পরম শিক্ষালাভ করিয়াছি। উহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। উনি পরমা সতী তাহার সন্দেহ নাই।"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"এক্ষণে আপনার কি অভি-প্রায়?"

ধরমচাঁদ বলিলেন,—"এক্ষণে আপনারা দয়া করিয়া কোন উপায়ে আমাকে আমার বাটীতে পাঠাইয়া দিউন। আমি তথায় উপযুক্ত ডাক্তারাদি ডাকাইয়া চিকিৎসা করি। আমি মা ঠাকুরাণীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহি না। উনি উচিত কাজ করিয়াছেন।"

তখনই ইনিস্পেক্টরের আদেশে কনষ্টবল পাল্কী

আনিতে ছুটিল। ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—"দেওয়ানজি মহাশয়, এক্ষণে বিধুমুখীর সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য ?"

জীবন বাবু বলিলেন,—উনি মহারাণী করুণাময়ীর নিকট থাকিবেন, তাঁহারই ব্যবস্থায় হরিচরণ ধরা পড়িল; বিধুমুখীর উদ্ধার হইল। যদি পুলিসের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে মহারাণীর কাছে উপস্থিত হইলেই বিধুমুখীকে পাওয়া যাইবে। মহারাণী উহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। যদি সাক্ষাতের পর উনি সেখানে থাকিতে ইচ্ছা না করেন, তাহা হইলে উহার ইচ্ছামত স্থানে উহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং যথাসময়ে সে সংবাদ পুলিসের গোচর করা হইবে।"

ইনিস্পেক্টর বিধুমুখীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি ইচ্ছা করেন ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি মারাণীর নাম শুনিয়াছি; তাঁহার অনেক অলৌকিক গুণের কথাও শুনিয়াছি।' কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি তাঁহারই ব্যবস্থায় আমার উদ্ধার হইল। নদীর অপর পারে তাঁহার দানকাণ্ড চলিতেছে এবং তিনিও এখানে আছেন, এ সংবাদও আমি এখানে আসিয়া জানিতে পারিয়াছি। এরূপ সুযোগ আমার অদৃষ্টে আর ঘটিবে কি না বলিতে পারি না, তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে আমার থাকা ঘটিবে কি না, এখন তাহা বলিতে পারি না।"

ইনিস্পেক্টর জিজ্ঞাসিলেন,—"দেওয়ানজি মহাশয়, আপনি কিরূপ ব্যবস্থায় বিধুমুখীকে লইয়া যাইতে চাহেন ?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"সমস্ত ব্যবস্থাই স্থির আছে। আমাদের দ্বারবানেরা এক্ষণই পাল্কী লইয়া আসিবে। দুইজন দাসী ও চারিজন বরকন্দাজ পাল্কীর সঙ্গে যাইবে। বোধ হয়, কোনই অসুবিধা হইবে না।"

তাহার পর ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"এই হতভাগী গোলাপী মাগীকেও চালান দিতে হইবে। এ পলাইয়া যাইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি, ইহার এই বাটীতে অনেক কুলবালা ধর্ম্ম হারাইয়াছে। এ অনেক নারীকে ফুসলাইয়া পাপ পথে আনিয়াছে। অনেক দুষ্ট পুরুষ সতী নারীকে আনিয়া ইহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। ইহাকে হঠাৎ ছাড়িয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি না। হরিচরণের সহিত ইহাকেও আজি থানায় চালান দেওয়া হউক। তাহার পর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই হইবে।"

হাতকড়ি নিবদ্ধ হরিচরণ ঠিক দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু গোলাপী কাঁদিয়া ফেলিল।

কনষ্টবল পাল্কী লইয়া আসিল। অনেকে ধরাধরি করিয়া ধরমচাঁদকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিল। তিনি গৃহে গমন করিলেন।

জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—"মা লক্ষ্মী আপনি পাল্কীতে উঠুন। ঐ ঝিরা পাল্কীর পাশে দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারবানেরা সঙ্গে যাইবে। আপনার কোন চিন্তা নাই।"

বিধুমুখী ইনিস্পেক্টরের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি যাইতে পারি কি?"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"আপনাকে যে লোক লইয়া যাইতেছেন, তাহার ব্যবস্থার উপর জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবও কোন কথা কহিবেন না। আপনি স্বচ্ছন্দে গমন করুন। কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই আপনার জবানবন্দীর দরকার হইবে। এই হতভাগার বিরুদ্ধে যে সঙ্গীন মোকদ্দমা এবার খাড়া হইয়াছে, তাহার প্রধান স্বাক্ষীই আপনি।"

জীবন বাবু বলিলেন, "জোবানবন্দী দেওয়ার কোন অসুবিধা হইবে না। বোধ হয় মহারাণী মাতা কমিসনে স্বাক্ষী দেওয়াইতে ইচ্ছা করিবেন। যথাসময়ে তাহার ব্যবস্থা করিলেই হইবে।"

ধীরে, নম্রভাবে রাজ রাজমোহিনীর ন্যায় পাদবিক্ষেপে বিধুমুখী সে পাপপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, পাল্কীসহ বাহকগণ, দ্বারবানগণ এবং ঝি দুইজন প্রস্থান করিল।

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—"এক্ষণে জমাদার এবং আট জন কনষ্টবল এই আসামী হরিচরণ এবং গোলাপীকে

থানায় লইয়া যাও। কল্য প্রাতে ইহাদিগকে হাকিমের নিকট পাঠাইতে হইবে।"

জীবন বাবু বিহিত শিষ্টাচারাদির পর ইনিস্পেক্টরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আসামীদের লইয়া পুলিসের লোকেরা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলন।

সকল গোলই মিটিয়া গিয়াছে। মহারাণী করুণাময়ী-দেবী আজিমগঞ্জ হইতে বীরভূমিতে আপনার রাজধানী চন্দ্রমালায় প্রস্থান করিয়াছেন। বিধুমুখীর কমিসনে জোবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। হরিচরণ দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। বিধুর মা নিম্ন আদালতে স্বাক্ষ্য দিয়াছে। যে দস্যুদল বিধুমুখীর বাটীতে পড়িয়া বিধুমুখীকে হরণ করিয়াছে, রায় বাহাদুরকে জখম করিয়াছে, বিধুর মাকে মরণাপন্ন অবস্থায় ফেলিয়াছে, আরও অনেক সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, নিম্ন আদালতে বিধুর মা হরিচণকে তাহার কর্ত্তা বলিয়া চিনিয়া দিয়াছে। বিধুমুখীও সুস্পষ্টরূপে হরিচরণকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং যে যে উপায়ে সে তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া লইয়া আসিয়াছে এবং তাহার পর তাঁহার যে যে দুরাবস্থা ঘটাইয়াছে, সকলই তিনি পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ বাবুকেও স্বাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। তিনি আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন যে হরিচরণ বিধুমুখীকে

নানাভাবে মহারাণীর নিকট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল এবং বিধুমুখী যে তাহার হস্তে আছে, এ কথা হরিচরণ বার বার বলিয়াছিল, আর তাঁহার রূপ যৌবনের প্রলোভন দেখাইয়া ঘৃণিত প্রস্তাব করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। রায় বাহাদুর হরকুমারকেও স্বাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। চণ্ডী, ভবসুন্দরী প্রভৃতি আরও অনেক লোককে স্বাক্ষ্য দিতে হইয়াছে।

মোকদ্দমার সময় আদালতে রায় হরকুমার বাহাদুরের সহিত জীবন বাবুর সাক্ষাৎ হয়। দেওয়ানজির মারফৎ বিধুমুখী দুই খানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। একখানি রায় বাহাদুর ও আর একখানি রাজার নামে লিখিত। উভয় পত্রেই অসংখ্য প্রণাম ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, বিধুমুখী কিছুদিন চন্দ্রমালায় মহারাণী করুণাময়ী দেবীর নিকট অবস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রাজা বা রায় বাহাদুর সে প্রস্তাবে কোন আপত্তি করেন নাই। বিধুমুখী দুই পক্ষ কাল চন্দ্রমালায় বাস করিতেছেন।

চন্দ্রমালায় বিধুমুখী অনেক সময় মহারাণীর নিকট অবস্থান করার অধিকার লাভ করিয়াছেন। করুণাময়ীর আকার প্রকার, শিক্ষা, ক্ষমতা, ত্যাগ স্বীকার, অনাশক্তি, উদারতা, মহত্ব প্রভৃতি দেখিয়া বিধুমুখী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। মানুষের, বিশেষতঃ ধনশালিনী স্বাধীনা স্ত্রীলো-

কের, এরূপ অত্যাশ্চর্য্য দেবভাব জন্মিতে পারে, ইহা বিধুমুখী না দেখিলে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এই দেবীর সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিবার অধিকার লাভ করিয়া বিধুমুখী আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে, আহ্নিকাদি সমাপ্ত হইলে মহারাণী দাসীর দ্বারা বিধুমুখীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তৎক্ষণাৎ বিধুমুখী আসিয়া দূর হইতে মহারাণীকে প্রণাম করিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"আজি সমস্ত দিন তোমার সহিত কথা কহিবার সময় পাই নাই। অনেক বৈষয়িক কার্য্যে আজিকার দিন কাটিয়া গিয়াছে। তুমি বইস। এখন সময় পাইয়া তোমাকে ডাকিয়াছি। তুমি স্বচ্ছন্দে আছ তো?"

বিধুমুখী সেই স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"মহারাণী মাতার দেহের বায়ু কপাল ক্রমে যাহার গায়ে লাগিতেছে, তাহার আর কি অস্বচ্ছন্দতার কারণ থাকিতে পারে? আমি বড়ই আনন্দে আছি। আমার এই আনন্দ দেখিয়া আমি নিজেই নিরন্তর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি।"

মহারাণী বলিলেন,—"কেন মা?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহা শুনিলেও নারীর পাপ হয়। এই পাপে সংসারের সকলের ঘৃণাভাজন হইয়া হীনভাবে কালপাত করাই আমার

পক্ষে সমুচিত ব্যবস্থা। পরকালে অনন্ত নরক, ইহকালে অবিশ্রান্ত যন্ত্রণা আমার অদৃষ্টের একমাত্র নিয়তি হওয়া উচিত। তাহার পরিবর্ত্তে পাপীয়সীর একি সৌভাগ্য! এই জন্মেই সজীব শরীরে দেবতার অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ, নিরন্তর সন্তোষ ও আনন্দভোগ কেন ঘটিতেছে ইহা ভাবিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হই। রাজা উমাশঙ্কর প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়াই আমার মনে হয়। আর মহারাণী মাতার কথা কি বলিব? বোধ করি দেবালোকেও এমন দেবী নাই। এই সকল দেবচরণের আশ্রয় লাভ পরম পুণ্যশীল সাধুগণের অদৃষ্টেও ঘটে কিনা সন্দেহ। আমার মত অভাগিনীর এ সৌভাগ্য কেন হয় না?"

মহারাণী বলিলেন,—"তোমার চিত্ত সন্তোষ ও আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে শুনিয়া পরিতোষলাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি ক্রমে তুমি পূর্ণানন্দের অধিকারিণী হইবে। বুদ্ধির ভ্রমে মনুষ্যের পদস্খলন নিয়তই হইয়া থাকে; দেবতা-দেরও অনেক সময়ে সেরূপ ঘটে। যে ব্যক্তি আপনার দুষ্কৃতি আপনি বুঝিয়া জীবনের গতি ফিরাইয়া লইতে পারে, এবং আপনার অতীত কুকার্য্যে আন্তরিক সন্তপ্ত হয়, তাহার চিত্ত ক্রমেই নির্ম্মলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। চিত্তের নির্ম্মলতা হইলেই পাপের তাড়না, অতী-তের যন্ত্রণা, তাহাকে আর কাতর করিতে পারে না। আর মা, তুমি যে ঘৃণার কথা বলিতেছ, আমি তাহার

কোন কারণ দেখিতে পাই না। এ সংসারে কোন পদার্থই ঘৃণাজনক নহে। ঘৃণা একটা সংস্কার মাত্র। পাপ একটা ঘৃণার বস্তু বটে, কিন্তু মা তাহারও সার্থকতা আছে। পাপ আছে বলিয়াই, পুণ্যের মহিমা গৌরব আমরা প্রণিধান করিতে পারি। পাপ পাশাপাশি চলে বলিয়াই পুণ্যের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে। পুণ্যের কমনীয় কান্তি দেখিতে পাই বলিয়া আমরা পাপকে ঘৃণা করিতে পারি। পাপ নিশ্চয়ই ঘৃণিত পদার্থ; সুতরাং পাপীও ঘৃণিত। কিন্তু মা, কিরূপ পাপী ঘৃণার সামগ্রী? পাপেই যাহার উল্লাস, পাপকে যে প্রাণের সঙ্গী করিয়া লইয়াছে; পাপের অনুষ্ঠানে যে গৌরব ও আনন্দ অনুভব করে, পাপকে যে পুণ্যের অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে সেই পাপী নিশ্চয়ই ঘৃণার আস্পদ। যে পাপী পাপানুষ্ঠান করিয়া তাহার জ্বালায় অস্থির হয়, যে পাপী পাপকে স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া থাকে, যে পাপী পাপাচরণের পর প্রাণের কলুষরাশি ধৌত করিবার জন্য পাগল হইয়া বেড়ায়, যে পাপী অতীত পাপের কথা চিন্তা করিয়া শিহরিতে থাকে ও মরণাপন্ন হয়; তাহাকে ঘৃণা করিবার কোনই কারণ নাই। আমি বিশ্বাস করি অচিরে তোমার পূর্ণ সন্তোষ জন্মিবে।"

বিধুমুখী অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"কি ভাবিতেছ মা?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"একই কারণে আমার পূর্ণ সন্তোষ কখন জন্মিবে না।"

"কি কারণ?

"আমার স্বামী—আমি তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ অত্যাচার করিয়াছি, তাহা কল্পনাতীত। সুতরাং তাঁহার ক্ষমা বা কৃপালাভের প্রার্থনা আমার নাই। আমি যদি দূর হইতে তাঁহাকে একবার করিয়া দেখিতে পাই, তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, অন্তত সে স্থানের নিকটস্থ হইতে অধিকার পাই, তাহা হইলেই বোধ হয় আমার সন্তোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।"

মহারাণী বলিলেন,—"তাহাও হইবে। নিশ্চয়ই মা, অচিরে তুমি তোমার স্বামীকে যাহাতে দেখিতে পাও, তাহার ব্যবস্থা করিব।"

বিধুমুখী সজলনয়নে বলিলেন,—"ভগবতীর এই আশ্বাস বাক্যে দাসী চরিতার্থ হইল।"

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজা উমাশঙ্করের সহিত তুমি কতদিন আলাপ করিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি জীবনে সাত আট দিন তাঁহার সহিত অল্পাধিক কথা কহিয়া ধন্য হইয়াছি।"

মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন,—"রাজাকে কেমন লোক বলিয়া তুমি বুঝিয়াছ?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"রাজাকে লোক বলিয়া উল্লেখ

করিতে আমার সাহস হয় না। আহা! যে দিন কাশীতে প্রথমে সেই দেবতা ভিক্ষার নিমিত্ত দয়া করিয়া আমাকে দর্শন দিলেন, সে দিন আমার জীবনের কি শুভ দিন! তাঁহার চরণধূলার কৃপায় আমার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। তিনিই আমার গুরু।"

"আর রায়বাহাদুরের সহিত তোমার পরিচয় আছে?"

"তিনি যে আমার পিতা। এমন মিষ্টভাষী, এমন সদাশয়, এমন সুব্যবস্থাপক, এমন সর্ব্বজনরঞ্জন লোক আমি আর কখন দেখি নাই।"

করুণাময়ী জিজ্ঞাসিলেন,—"আর রাণীর সহিত তোমার পরিচয় আছে?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না মা, আমি একদিন দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছি, তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতীর সম্মুখে এ পাপ মুখ দেখাইতে আমার ভরসা হয় নাই। রাণীর অনেক সদ্‌গুণের কথা লোকমুখে শুনিয়াছি, রাজার ভগ্নীরও অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি, কিন্তু লজ্জায় ও ঘৃণায় তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পারি নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"তুমি শুনিয়াছ কি, তোমাদের রাজা এ দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া, অলঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না মা, আমি এ কথা শুনি নাই। তাঁহার পক্ষে এ কার্য্য অসম্ভব নহে। কিন্তু মা, সর্ব্বস্বই এ কার্য্যে লাগিবে কি ?"

করুণাময়ী বলিলেন,—"আমি যত দূর জানি ও বুঝি, তাহাতে আমার বোধ হয়। তাঁহার সকলই একার্য্যে নিঃশেষ হইবে। বোধ হয় তাঁহাকে স্ত্রীপুত্র লইয়া গাছ-তলায় দাঁড়াইতে হইবে।"

বিধুমুখী অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"এজন্য চিন্তা করিতেছ কি মা ? চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আমি যতদূর জানি তাহাতে আমার বিশ্বাস, অবস্থান্তর হেতু রাজা উমাশঙ্কর কথনই বিচলিত হইবেন না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তাহা না হইলেও, রাণীর ও রাজকুমারের নিশ্চয়ই বিশেষ কষ্ট হইবে।"

মহারাণী বলিলেন,—"যদিই হয়, কে তাহার অন্যথা করিবে ? তুমি এক সময়ে আমার নিকট যে বিষয় বিক্রয় করিয়াছিলে তাহার দখল দিতে রায় বাহাদুর আপত্তি করায় রাজার সহিত আমাদের মোকদ্দমা হয়। সে মোকদ্দমায় রাজাকে আমার নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়ী হইতে হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তিনি একে সর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন, তাহার উপর এই দায়। আপনি কি টাকা আদায় করিবেন ?"

মহারাণী বলিলেন,—"নিশ্চয় আদায় করিব। ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এই টাকার জন্য ধর্ম্মতঃ আমি দায়ী। আমি অনর্থক এই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রাজাকে দায়গ্রস্ত করিলাম। মা, আপনি দেবী। আমার প্রতি আপনার কৃপার সীমা নাই। আমি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া রাজাকে এই দায় হইতে মুক্ত করিতে পারেন না কি?"

মহারাণী বলিলেন,—"না মা, কেন তাহা পারিব? সত্য বটে, তোমার জন্য রাজার এ দায় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু রাজা যখন বিষয়ের অধিকারী হইলেন তখন প্রথ সেই যে সম্পত্তি লইয়া বিরোধ, তাহার দাবী ছাড়িয়া দিলেই পারিতেন। তিনি বিষয় পাইবেন বলিয়া কখন ভাবেন নাই। যে অবস্থায় যে বিষয় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া তুষ্ট থাকা তাঁহার উচিত ছিল। এ সম্বন্ধে তোমারও কোন দোষ আমি দেখিতেছি না। তুমি যখন বিষয় নিজের বলিয়া জানিতে এবং কালে বিষয়ের এরূপ পরিণাম দাঁড়াইবে ইহা যখন তুমি স্বপ্নেও মনে কর নাই, তখন তুমি তাহার ইচ্ছামত ব্যবহার করিয়াছ। ইহাতে তোমার কোন দোষ হইতে পারে না।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"দোষ যাহারই হউক, রাজার

সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, এ সময়ে আপনি ক্ষান্ত থাকিলে হইত না?"

মহারাণী বলিলেন,—"না মা, তাহা তো সঙ্গত ব্যবস্থা নহে। যখন তাঁহার সমস্ত বিষয়ই যাইতেছে, তখন আমি ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার বিষয় থাকিবে না বুঝিতেছি, তখন আমি কেন আমার ন্যায্য প্রাপ্য ত্যাগ করিব? এজন্য দুঃখিত বা চিন্তিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তুমি এজন্য চিন্তাত্যাগ কর।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"যে আজ্ঞা। আপনি যখন ইহা চিন্তাজনক নহে বলিয়া মনে করিতেছেন, তখন আমি এজন্য কেন চিন্তিত হইব?"

মহারাণী বলিলেন,—"আমি শীঘ্র তীর্থ দর্শনে যাইব। ইচ্ছা করিলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গে লইলে চরিতার্থ হইব।"

মহারাণী বলিলেন,—"তোমার আহারের কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কল্য তোমার সহিত ইহার পরামর্শ করিব।"

বিধুমুখী প্রণাম করিয়া নিতান্ত চিন্তিতভাবে প্রস্থান করিলেন। পরম্পরাগত বিবিধ দুর্ঘটনাপাতে বিধুমুখীর হৃদয় ও মন অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল। তাহার পর জিয়াগঞ্জে সহসা উন্মাদ ভাবে ধরমচাঁদ বাবুর দেহে অস্ত্রাঘাত করার পর, তাঁহার অন্তর নিতান্ত বিচলিত হইয়াছিল।

অন্ত মহারাণীর মুখে পরম পুণ্যশীল রাজা উমাশঙ্করের এই দশা বিপর্য্যয়ের বার্ত্তা শ্রবণে তিনি বড়ই ব্যথিতা হইলেন। এই সকল বিবিধ কারণে বিধুমুখীর হৃদয় ও মন ক্রমেই বিকৃত হইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা ।

সপ্তম খণ্ড—ছায়া ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজা।

রাণী অন্নপূর্ণা দেবী অদ্য রাজার প্রতিষ্ঠিত শঙ্করনাথ মহাদেবের পূজা করিতে গমন করিয়াছেন। সঙ্গে ভব-সুন্দরী এবং দাসী ব্যতীত আরও দুই জন পরিচারিকা আছে। খোকারাজাকে ক্রোড়ে লইয়া একজন দাসী সঙ্গে চলিয়াছে। দেবালয় রাজবাটী হইতে অধিক দূর-বর্ত্তী নহে। তথাপি অনেক অস্ত্রধারী রক্ষী ও দৌবারিক রাণীর শিবিকার অগ্রে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে চলিয়াছে। নৈবেদ্য, পূজার বিবিধ সামগ্রী ও পুষ্প-চন্দনাদি লইয়া অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা অগ্রে গমন করিয়াছেন।

বেলা নয়টার সময় রাণী দেবালয়ে উপনীত হইলেন। পুরুষ প্রহরী, অনুচর ও ব্রাহ্মণগণ দূরে চলিয়া আসিলেন। শিবিকা মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাণী দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কেবল দেব-পুরোহিত মহাশয় মন্দির মধ্যে থাকিতে পাইলেন, তাঁহাকে মন্ত্রাদি পাঠ করাইয়া যথারীতি পূজা করাইতে হইবে, এজন্য তাঁহার তথায় অবস্থান অপহার্য্য। অন্যান্য যাবতীয় পুরুষ মন্দিরের

বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভব, দাসী, অন্যান্য পরিচারিকাগণ ও ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ মন্দির মধ্যে রাণীর নিকটে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। খোকারাজা মাতার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইল।

আজি রাণী অন্নপূর্ণা অপূর্ব্ববেশে সজ্জিতা। মকমলের উপর সাচ্চা কাজের শোভাময় পাইড়যুক্ত পীতবর্ণের এক চিনের রেশমী কাপড় তিনি পরিধান করিয়াছেন। স্বর্ণ-বর্ণ ফুলমালা সংযুক্ত জামা তিনি গায়ে দিয়াছেন; আর তাঁহার উপর হরিদ্রা বর্ণের অতি সূক্ষ্ম এক ওড়না তিনি ধারণ করিয়াছেন। অঙ্গে ভূষণের বাহুল্য নাই। প্রকোষ্ঠে হীরকের বলয়, কণ্ঠে মুক্তামালা, কর্ণে অত্যুজ্জ্বল দুলমাত্র তিনি ধারণ করিয়াছেন। এখনই স্নান করিয়া তিনি দেবদর্শনে আগমন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার কেশরাশি এখন অবেণী সংবদ্ধ। এই বেশে সুন্দরী শিরো-মণি অন্নপূর্ণাকে আজি অলৌকিক শোভাময়ী বলিয়া বোধ হইয়াছে। তিনি অচিরস্নাতা; সদ্য স্নান জনিত লবণ্য তাঁহার বদনকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। আর ভক্তি ও নম্রতা তাঁহার বদনের অপূর্ব্ব শ্রী-বিধান করিয়াছে।

যে ব্রাহ্মণ এই দেবালয়ের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত, তিনি বয়সে প্রবীণ না হইলেও, বহু শাস্ত্রার্থবিৎ। তাঁহার নাম ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি। তাঁহার বয়স ত্রিশ অতিক্রম করি-য়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই বয়সে এই যুবা দর্শনাদি

অনেক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রকৃত পণ্ডিত-রূপে পরিচিত হইবার যোগ্য হইয়াছেন। বিবাহাদি করিয়া, সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে তাঁহার বাসনা হয়,নাই। তাঁহার এরূপ বৈরাগ্যের কোন কারণই কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই। রাজার দেবপ্রতিষ্ঠার সমসময়ে ঘনশ্যাম আসিয়া পৌরহিত্যের প্রার্থী হইলেন। রায় হরকুমার বাহাদুর এই শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত যুবার সহিত আলাপ করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে রাজ সংসারে কোন উপযুক্ত পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বিদ্যানিধি তাহাতে সম্মত হইলেন না। দূরে একান্তে অনন্যমনে শিবপূজাই তাঁহার অতি প্রিয় কার্য্য; তিনি সম্মান বা যশের প্রার্থী নহেন; সুতরাং অন্য পদে তাঁহার প্রয়োজন নাই। রায়বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা-মত বেতনাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে দেবসেবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অতীব সন্তোষজনকরূপে দেব-সেবা চলিতে লাগিল। রাজা উমাশঙ্কর ও রায় বাহাদুর অনেক সময়েই দেবপূজা করিতে যাইতেন। যখন যাইতেন, তখনই বিদ্যানিধির ব্যবহারে ও তাঁহার সদালাপে তাঁহারা একান্ত প্রীত হইতেন। বিদ্যানিধি মহাশয় দেবালয় ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতেন না, আহূত না হইলে রাজদর্শনেও আসিতেন না, আপনার কর্ত্তব্য পালনে অনুমাত্র অবহেলা করিতেন না।

অন্নপূর্ণাদেবী আরও দুই এক দিন শঙ্করনাথের পূজা করিতে আসিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি তত্তৎকালে একান্ত আগ্রহ সহকারে রাণীর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং রাণীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত বহুবিধ আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে রাণী বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে অনেক পারিতোষিক প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। ঘনশ্যাম কোন পারিতোষিকই গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "অর্থাদি কোন পারিতোষিকে তাঁহার আবশ্যক নাই। যথোপযুক্ত সময় হইলে তিনি ইচ্ছানুরূপ পুরস্কার চাহিয়া লইবেন।" রাণী বুঝিয়াছিলেন, অবশ্যই এ বিপ্র বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ কোন পুরস্কারের প্রার্থনা করিবেন। অসাধ্য না হইলে, নিশ্চয়ই তখন তাহা প্রদান করিতে হইবে।

কোন পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিতে রাণী অন্নপূর্ণার সঙ্কোচ ছিল না এবং রাজা বা রায় বাহাদুরের তাহাতে নিষেধও ছিল না। যে স্থানে বাক্যালাপ করা আবশ্যক বলিয়া রাণী স্থির করিবেন, সে স্থানে তিনি স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিবেন, ইহাই রাজা ও রায়বাহাদুরের অভিপ্রায়। রাণীর চরিত্রবলের উপর তাঁহাদের এতই বিশ্বাস যে, এ সম্বন্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনা নিতান্ত লজ্জাজনক ও ঘৃণাজনক বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তথাপি কোথায় যাইতে হইলে,

রাণীর শিবিকার সহিত বন্দুক ও ঢাল তরবারধারী বীরগণ ধাবিত হইত এবং দাসীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। সে কেবল ধনশালীগণের ন্যায় লৌকিক আড়ম্বর বজায় রাখিবার জন্য। এরূপ স্বাধীনতা থাকিলেও, রাণী কখনই অকারণ কোন পুরুষান্তরের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন না এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। দেবালয়ের পূজকের সহিত কথোপকথন নিতান্ত আবশ্যক। রাণী যে দুইবার দেবপূজার নিমিত্ত মন্দিরে গিয়াছিলেন, সে দুইবারই ঘনশ্যামের সহিত তিনি কথা কহিয়াছিলেন। বিদ্যানিধির অনেক কথাই প্রহেলিকার ন্যায় দুর্বোধ ও বিবিধ রহস্যজালে জড়িত বলিয়া রাণীর মনে হইয়াছিল। রাণী মনে করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তির জীবনে নিশ্চয়ই কোন বিষাদজনক ঘটনা প্রচ্ছন্ন আছে এবং এই দেব-পূজক কোন না কোন দিন তাহা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে এবং তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিবে।

অদ্য পূজারম্ভের পূর্ব্বে ঘনশ্যাম অনেক ক্ষণ রাণীর বদনের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কি আমাকে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করেন?"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"বলিতে ইচ্ছা করি বটে; কিন্তু বলিতে পারি কই?"

রাণী বলিলেন,—"কেন বলিতে পারেন না? আপনার কথা অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়, ইহাই কি আপনার অভিপ্রায়?"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"তাহাই আমার অভিপ্রায় বটে। কিন্তু থাকুক আজি; আর এক দিন আমি মনের কথা দেবীর নিকট নিবেদন করিব।"

রাণী বলিলেন,—"আমার বোধ হয় আপনার জীবনে বিশেষ কোন বিষাদজনক গুপ্ত ব্যাপার আছে। আমার দ্বারা যদি তাহার কোন প্রতিকার সম্ভব হয়, তাহা হইলে আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, নিতান্ত অসাধ্য না হইলে, আমি আপনার উপকারার্থ সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিব।"

ঘনশ্যামের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন,—"আপনার এই আশ্বাস বাক্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ হইলাম। আমার ক্লেশ দূর করা আপনারই সাধ্য এবং আপনি বাসনা করিলে অনায়াসেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন।"

রাণী বলিলেন,—"তাহা হইলে আপনি সে কথা ব্যক্ত করুন। আমি তাহা এখনই সম্পাদন করিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"এখন থাকুক—আজি থাকুক!

আমি সুযোগ মতে তাহা আপনাকে জানাইব। আপনার করুণা ব্যতীত আমার জীবনের দুঃখনাশের অন্য কোন উপায় নাই।"

রাণী বলিলেন,—"তবে আপনি সে কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? যদি আর কেহ না শুনিতে পাওয়াই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে অনুমতি করুন, আমি এখনই তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

ব্রাহ্মণ নীরব—অধোমুখ। তিনি অনেক দূরে দাঁড়াইয়া রাণীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। রাণী সঙ্গিনীদিগের নিকট হইতে সরিয়া ব্রাহ্মণের নিকটস্থ হইলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আপনি কি প্রার্থনা করেন?"

অন্নপূর্ণা নিকটস্থ হইলে ব্রাহ্মণ একটু বিচলিত হইলেন। তিনিও অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আমি যে ধনের প্রার্থনা করি, তাহা অমূল্য; কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলেই তাহা দিতে পারেন। আপনি দয়া করিয়া তাহা দিবেন কি?"

ব্রাহ্মণের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণার মন একটু সংশয়াকুল হইল। তিনি আবার সরিয়া সঙ্গিনীগণের নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন,—"আপনার যাহা প্রার্থনা থাকে, তাহা আপনি যখন ইচ্ছা আমার নিকট ব্যক্ত করিবেন। আমি আবার বলিতেছি, আমার দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, আপনি

কখনই বিফল-মনোরথ হইবেন না। আপাততঃ বেলা অধিক হইয়া উঠিল, আর বিলম্ব করিতে আমার সাধ্য নাই। এক্ষণে পূজার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইব।”

রাণী পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সমাহিত চিত্তে তত্রত্য আসনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ, একটু অগ্রসর হইয়া এবং অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া, মন্ত্র পাঠ করাইতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘনশ্যামের সকল মন্ত্র ভাল মনে পড়িল না। নিত্য অভ্যস্ত মন্ত্রাবৃত্তিতে তাঁহাত ভ্রান্তি দেখিয়া, অন্নপূর্ণা বিস্ময়াবিষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বজাত সংশয় বড়ই বাড়িয়া উঠিল। এরূপ প্রমাদ হেতু লজ্জিত না হইয়া ঘনশ্যাম নিরন্তর অতৃপ্ত নয়নে রাণী অন্নপূর্ণার ইন্দীবর বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শিবপূজার সকল মন্ত্রই রাণীর সুন্দররূপ অভ্যস্ত এবং তাহার যাবতীয় প্রণালী, প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ। সুতরাং ব্রাহ্মণের ভুল হইলেও, রাণীর মন্ত্র পাঠের ব্যাঘাত হইল না। ঘনশ্যাম মন্ত্র ভুলিয়া গেলেও, অন্যান্য অনুষ্ঠান বিষয়ে রাণীকে নানা নিদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও ঘনশ্যামের বড়ই ভ্রম হইল। যখন বিল্বপত্র হাতে লইতে হইবে, তখন ঘনশ্যাম তুলসী লইতে বলিলেন এবং যখন নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে, তখন অন্ন নিবেদন করিতে

উপদেশ দিলেন। রাণী, একটু বিরক্ত হইয়া, ব্রাহ্মণকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার পর আপনার যথাজ্ঞান পূজা ও স্তব পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া পুত্রসহ দেবচরণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তাহার পর দেব-নিবেদিত পুষ্প ও বিল্বদল লইয়া খোকার মস্তকে প্রদান করিয়া, মন্দির হইতে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত পরিচারিকাগণকে ইঙ্গিত করিলেন। খোকা রাজার পরিচারিকা আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিল। রাণী দেব-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আসিবার সময় ঘনশ্যামের সহিত তিনি কোন কথা কহিলেন না। অদ্য নিতান্ত অতৃপ্ত চিত্তে পূজা সমাপ্ত করিয়া, রাণীকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল।

রাজবাটীতে পুনরাগত হইয়া রাণী কোন কক্ষে প্রবেশ না করিয়া, অঙ্গন মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুহাসিনী আজি রাজার জন্য পাক করিতেছিলেন, এই জন্যই রাণী নিশ্চিন্ত মনে দেব-পূজায় যাত্রা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। রাণী দেবালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছেন, জানিয়া সুহাসিনী তাঁহার হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং রাণীকে গৃহ-প্রবেশ করিতে বলিলেন। রাণী তদুত্তরে বলিলেন,—"আমার দেব পূজা এখনও শেষ হয় নাই। পূজা করিতে করিতে অন্য কোন কার্য্য নিষিদ্ধ।"

সুহাসিনী বলিলেন,—"কি করিলে তোমার পূজার শেষ হইবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"তোমার দাদা না আসিলে আমার পূজার সমাপ্তি হইবে না।"

রাণীর আদেশে পরিচারিকাগণ তাঁহার নিকটে পুষ্প-চন্দনাদি পূজার উপকরণ আনিয়া দিল এবং তাঁহার সম্মুখে এক রজত-সিংহাসন স্থাপন করিল।

সুহাসিনী বলিলেন,—"তবে দাদার নিকট সংবাদ পাঠাইলেই হয়। কতক্ষণ এমন করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিবে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"যতক্ষণ তিনি না আইসেন, ততক্ষণ আমাকে এই স্থানেই থাকিতে হইবে। এজন্য তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইবে না। জুলুম করিয়া তাঁহাকে আনিলে, আমার সঙ্কোচ হইবে, পূজা ভাল হইবে না।"

পরিচারিকাগণ, আত্মীয় নারীগণ, ব্রাহ্মণীগণ অঙ্গনের চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। সুহাসিনীও খোকাকে কোলে লইয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খোকা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ বাবা—ঐ বাবা।"

সকলেই খোকার প্রদর্শিত পথে নেত্রপাত করিলেন সত্যই রাজা উমাশঙ্করের দেবমূর্ত্তি সকলের নয়নে পড়িল রাজার স্নান সমাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার পরিধানে কোষেয়

পীতাম্বর, চরণে মুক্তাজড়িত মকমলের জুতা। দূর হইতে রাজাকে দর্শন মাত্র অন্নপূর্ণা ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন।

রাজা নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আজি তুমি কি শঙ্করনাথের মন্দিরে গিয়াছিলে রাণী?"

রাণী বলিলেন,—"হাঁ; আমি এতক্ষণ অনর্থক পাথরের ঠাকুর পূজা করিয়া আসিলাম, কিন্তু যে দেবতা আমার প্রাণের প্রত্যক্ষ সঙ্গী, কৃপাময়, প্রেমময় ও নিরন্তর আমার সহিত বাক্যালাপ-নিরত, তাঁহার পূজা না করিলে, পূজা সাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না; তুমি এই আসন গ্রহণ কর।"

রাজা আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"মনে মনে পূজা করিলে কি তৃপ্তি হয় না? তোমার এ পূজার কি শেষ নাই?"

রাণী বলিলেন,—"আমার পূজার শেষ সর্ব্বদাই হয়। যে দেবতার পূজা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই কর্ত্তব্য নহে, তাঁহার পূজা ত্যাগ করিয়া যখন নিয়তই কার্য্যান্তরে লিপ্ত হই, তখন এ পূজার শেষ নিয়তই ঘটিতেছে। আর মনে মনে পূজার কথা বলিতেছ? তোমার মত জ্ঞানী হইলে আমি এরূপ পূজার উদ্যোগ হয় তো করিতাম না। কিন্তু লৌকিক উপকরণ লইয়া, লৌকিক পূজা না করিলে, আমার মত অজ্ঞ নারীর

কখনই হৃদয়ের তৃপ্তি হয় না। কিন্তু আমি পূজা করিতে বসিয়া এত বকাবকি, এত তর্ক করিতে পারি না।”

তখন অন্নপূর্ণা সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রাজার চরণে বার বার সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। চারিদিক হইতে পরিচারিকাগণ শঙ্খ বাদন ও হুলুধ্বনি করিতে থাকিল। পূজা শেষ হইলে রাণী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া রাজার চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে যখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, তখন নয়ন জলে তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসিতেছে। সুহাসিনী ও অন্যান্য অনেক নারীর চক্ষুও জলভারাকুল হইল।

সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে, রাণী বলিলেন,—“এতক্ষণে আমার চিত্তের শান্তি হইল। আজি শঙ্করনাথের মন্দির হইতে বড় অশান্ত চিত্তে আমি বাটী ফিরিয়াছিলাম।”

রাজা বলিলেন,—“কেন?”

রাণী বলিলেন,—“সে অনেক কথা। তুমি ঘরে চল, আমি সকল কথা বলিতেছি।”

তখন রাজার চরণস্থিত পুষ্পাদি পদার্থ গ্রহণ করিয়া রাণী এক রজতপাত্রে স্থাপন করিলেন। একটী নির্ম্মাল্য কুসুম আপনার কেশ রাশির মধ্যে বিন্যাস করিলেন। যে স্থানে রাজার চরণ ছিল, তত্রত্য কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া মুখে দিলেন।

রাজা তখন সুহাসিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

বলিলেন,—"আজি বোধ হয় তোমাকেই পাক করিতে হইয়াছে সুহাস! তুমি দুই চারি দিনের জন্য এ বাটীতে আসিয়া কেন এত পরিশ্রম কর, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

সুহাসিনী তখন খোকাকে রাজার কোলে দিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন ভব, দাসী প্রভৃতি বহু নারী চারিদিক হইতে রাজাকে প্রণাম করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন,—"আমি সকলকেই, মনস্কামনা পূর্ণ হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আর ব্রাহ্মণ-কন্যাগণকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতেছি।"

সকলের শুভাশীর্ব্বাদরাশি গ্রহণ করিতে করিতে রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সমুচিত সময়ে অন্নপূর্ণা অদ্য শঙ্করনাথের মন্দিরে যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহা রাজা ও সুহাসিনীকে জানাইলেন। তাঁহারা উভয়েই মনে করিলেন, হয় তো সহসা কোন কারণে ব্রাহ্মণের উন্মাদবিকার উপস্থিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দানবীর।

দুর্ভিক্ষ অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এ দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। রাজা উমাশঙ্কর এজন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। জেলায় জেলায় তিনি অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। সকল স্থানে সুদক্ষ ব্যক্তি-গণের তত্ত্বাবধানাধীনে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে তণ্ডুল সংগৃহীত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলায় প্রেরিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র রাজা উমাশঙ্করের জয় ঘোষিত হইতে থাকিল। ভারতের নানা স্থানে অন্নাভাবে হাহাকার শব্দ উঠিল বটে, কিন্তু রাজা উমা-শঙ্করের দয়ায় কোন দুঃখী লোকই উপবাসী থাকিতে পাইল না। যে সকল রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তি সত্রে আগ-মন করিতে অশক্ত, অথবা মানের দায়ে যাহারা সত্রে আসিয়া অন্ন গ্রহণে অনিচ্ছুক, তাহাদের বাটীতে অন্ন প্রেরিত হইতে লাগিল। রাজা উমাশঙ্কর আদেশ করিয়া-ছেন, যদি কোথায় অন্নাভাবে কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে শুনা যায়, তাহা হইলে তাঁহার ক্লেশের

সীমা থাকিবে না। রাজার নিয়োজিত প্রভু-ভক্ত ব্যক্তি-বৃন্দ অতিশয় সাবধানতা সহকারে কর্ত্তব্য পালন করিতে থাকিলেন।

সকল জেলাতেই সত্রের নিমিত্ত বহু স্থান ব্যাপিয়া স্থায়ী মণ্ডপসমূহ নির্ম্মিত হইল। সত্রের সন্নিকটে আতুর, রুগ্ন, শিশু, স্ত্রীলোক প্রভৃতির অবস্থান স্থানও সংস্থাপিত হইল। কেবল অন্নদান করিয়া রাজ-কর্ম্মচারীগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সর্ব্বত্র দুঃখীগণকে আবশ্যক মত বস্ত্রদানেরও ব্যবস্থা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগ-কাতর ব্যক্তিগণকে ঔষধ দানেরও আয়োজন হইল। চারিদিকেই দানকাণ্ড সুনির্ব্বাহিত হইতেছে জানিয়া, রাজা পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময়ে সদর হইতে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অন্নদাচরণ শীল রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমি জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাশয়ের নিকট আসিয়াছি।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার আগমনে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া আসন গ্রহণ করুন। আমার প্রতি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদেশ?"

অন্নদা বাবু বলিলেন,—"আদেশ তিনি কেন করি-বেন? তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন, কয়েক দিন পূর্ব্বে

আপনি তাঁহার নিকট দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যেরূপ দানের প্রস্তাব করিয়া ছিলেন, এখনও সে সম্বন্ধে আপনার সেইরূপ মনের ভাব আছে কি না।”

রাজা বলিলেন,-“মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইবার কোনই কারণ উপস্থিত হয় নাই। আপনি তাঁহাকে আমার সম্মান জ্ঞাপন করিয়া বলিবেন যে, এ সম্বন্ধে আমার মনের ভাব সমানই আছে এবং আশা করি, ভবিষ্যতেও অবিচলিত থাকিবে। কিন্তু আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি সহসা এ বিষয় জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন কেন?”

অন্নদা বাবু বলিলেন,—“আপনি তাঁহার সমক্ষে যেরূপ দানের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়জনক। আমরা তাঁহার মুখে সে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উপন্যাসবৎ অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছি। এরূপ ব্যাপারে মহাশয়ের মত পরিবর্ত্তন হওয়া অসঙ্গত নহে, বরং সুসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি। এই জন্যই মাজিষ্ট্রেট সাহেব জানিতে ইচ্ছা করেন, এ সম্বন্ধে মহাশয়ের মনের ভাব এখনও স্থির আছে কি না।”

রাজা কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“এমন কি আশ্চর্য্য প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিয়াছি যে, আপনারা তাহা অসম্ভব মনে করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছেন। আমার স্বদেশীয় বহুসংখ্যক লোক অন্না-

ভাবে মরণাপন্ন হইয়াছে, অথচ আমার এরূপ অর্থ আছে যে, তদ্দ্বারা আমি তাহাদের দুর্দ্দশা কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করিতে পারি। আমি তাহারই সংকল্প করিয়াছি এবং তদনুযায়ী প্রস্তাব করিয়াছি। ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে তাহা তো আমি এখনও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।”

অন্নদা বাবু বলিলেন,—“আপনি সর্ব্বস্ব দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনি, স্বকীয় গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যৎসামান্য এবং অনুগত ও আশ্রিত জনগণের নিমিত্ত যৎসামান্য মাত্র সম্পত্তি রাখিয়া, সমস্ত নগদ টাকা, সকল সম্পত্তি, রাজ-অট্টালিকা, হাতী-ঘোড়া প্রভৃতি সকলই এ কার্য্যে দান করিবেন শুনিয়াছি। এ প্রস্তাব আমরা অসঙ্গত বলিয়া মনে করি।”

রাজা বলিলেন,—“কেন আপনারা এরূপ মনে করেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি নিতান্ত স্বার্থপরের ন্যায় আপনার এবং আপনার অনুগত লোকজনের উদরের চিন্তা করিয়া পরে অন্য লোকের চিন্তা করিয়াছি। ধিক্ আমাকে! আপনি সাহেবকে বলিবেন, আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য আয়ও আমি রাখিব না। আবশ্যক হইলে তাহাও এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মে প্রদত্ত হইবে। আমি দৈহিক শ্রমে সক্ষম। নিশ্চয়ই আবশ্যক হইলে, শ্রমসাধ্য কর্ম্ম দ্বারা

আপনার ও স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে পারিব। আপনি আরও বলিবেন, আমার স্ত্রী পুত্রের সকল অলঙ্কার এবং রাজবাটীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ও তৈজসাদি আবশ্যক হইলে সমস্তই নিঃশেষরূপে এই হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে।”

অন্নদা বাবু বলিলেন,—“বড়ই ভয়ানক প্রস্তাব। রাজা মহাশয়, আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনি আরও কিছু সময় লইয়া এ বিষয়টী উত্তমরূপে বিবেচনা করুন।”

রাজা বলিলেন,—“সময় লইতে বলিতেছেন কেন? আর আপনাদের এ বিষয় জানিবার জন্য এত আগ্রহই বা কেন?”

অন্নদা বাবু বলিলেন,—প্রস্তাবটা প্রথমে ছোট লাট বাহাদুরের নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং তাহার পর গেজেটে ঘোষিত হইবে। এই জন্যই আপনাকে এই বিষয় পুনরায় আলোচনা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—“এ সম্বন্ধে ছোট লাটের ধন্যবাদ বা প্রশংসায় আমার প্রয়োজন নাই। লোকে ক্ষুধার সময় আহার করিয়া, নিদ্রার সময় নিদ্রাগত হইয়া, আপনার স্ত্রী-পুত্রকে অন্নবস্ত্র দিয়া কাহারও প্রশংসা শ্রবণ, বা গেজেটে আপনার কীর্ত্তির ঘোষণা দর্শন করিবার প্রত্যাশা করে না। এ কার্য্য কোন মতেই তাহার অপেক্ষা

গুরুতর নহে। আপনারা যাহাই মনে করুন, আমি ইহা অতি সামান্য কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। এ তুচ্ছ কথা ছোট লাটের গোচর করিবার প্রয়োজন কি? অথবা ইহা গেজেটে ঘোষণা করিবারই বা আবশ্যক কি?”

অন্নদাবাবু অবাক্। তিনি কি বলিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। রাজা বলিতে লাগিলেন,—“এ কার্য্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং আপনারা নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন শুনিয়া, আমি দুঃখিত হইতেছি। আপনারা যাহাই মনে করুন, আমি ঘোষণা বা প্রশংসার লোভে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। আপনি আসিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ বিষয় জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঘোষণার ব্যবস্থা করিবার অগ্রেই কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন এ দেশের জেলায় জেলায় অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ হইতেছে। আমার তহবিলে যে নগদ টাকা ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এইবার আমাকে অন্যান্য সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিতে হইবে। আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিবেন, এ তুচ্ছ কার্য্যের জন্য কোনরূপ ঘোষণা নিষ্প্রয়োজন। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র ব্যাপারের নিমিত্ত এরূপ আগ্রহযুক্ত হইয়াছেন, এ জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। এ সম্বন্ধে যখন যেরূপ

ব্যবস্থা হয়, আপনারা ইচ্ছা করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।”

অন্নদা বাবু বলিলেন,—“আমার আর বলিবার কোন কথা নাই। আমি এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি। বিদায় কালে, রাজা বাহাদুর! আমি আবার সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, আপনি যেরূপ বাহুল্য ভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহা আর একটু কমাইয়া করিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে। আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি। মাজি-ষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এত-দ্বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিবেন স্থির ছিল; কিন্তু হঠাৎ একটা গুরুতর তদারকে লিপ্ত হওয়ায়, তিনি আসিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছেন।”

রাজা বলিলেন,—“তাঁহাকে আমার সবিনয় সম্মান জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ করিবেন। বোধ হয় শীঘ্রই আমার সদরে যাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। আমি সে সময় সাহেবের সহিত এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব।”

অন্নদা বাবু প্রস্থান করিলেন। রাজা হৃষ্ট মনে রায়-বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ কামনায় তাঁহার প্রকোষ্ঠাভি-মুখে গমন করিলেন।

রাজার তহবিলে যে টাকা ছিল তাহা প্রায় শেষ

হইয়া আসিল ; কিন্তু হাতে সর্ব্বদাই পাঁচ সাত লক্ষ টাকা থাকা আবশ্যক। রাজা তদর্থে একটী পরগণা বিক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। মহারাণী করুণাময়ী তাহার খরিদদার হইলেন। সাত লক্ষ টাকা দর স্থির হইল। মহারাণীর পক্ষ হইতে তাঁহার দেওয়ান জীবন বাবু টাকা দিয়া বিষয় খরিদ করিয়া লইলেন।

দান-কার্য্য অব্যাঘাতে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সহধর্ম্মিণী।

রাজা উমাশঙ্করের দরিদ্রসেবা বহুবিস্তৃত ও বিভিন্ন স্থানব্যাপী হইয়া পড়িল। এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানের সত্রের কার্য্যাধ্যক্ষগণ সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন যে, দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ অচিরে আরও বর্দ্ধিত হইবে; যেহেতু ভোজনার্থী দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে এবং উত্তরোত্তর আরও বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজা উমাশঙ্করের উৎসাহের সীমা নাই। তিনি সর্ব্বত্র কার্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন যে, যত দুঃখী লোকের সমাগম হইবে, তাহাদের প্রত্যেকেই যেন নিত্য স্বচ্ছন্দে পরিতোষ সহকারে আহার করিতে পায়; বস্ত্রহীনগণ যেন প্রত্যেকেই এক এক খণ্ড বস্ত্র পায়; পীড়িত ব্যক্তিগণ যেন রীতিমত ঔষধ ও পথ্য পায়; নর-নারী যেন একসঙ্গে এক স্থানে বসিয়া আহার না করে; জাতি বিচার করিয়া সকলের যেন পৃথক্ পৃথক্ আহারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়;

কাহারও যেন কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। অর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া আশঙ্কার কোন প্রয়োজন নাই।

সোণাপুরে প্রায় একলক্ষ মণ চাউল মজুত হইল, আর ভিন্ন ভিন্ন জেলার সত্রে প্রায় লক্ষাধিক মণ চাউল মজুত আছে সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু হাতের সমস্ত টাকা প্রায় শেষ হইয়াছে। একটা মহাল সাত লক্ষ টাকায় বীরভূমের মহারাণী করুণাময়ী খরিদ করিয়াছেন। আবার আর একটা মহাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল। আবার মহারাণী তাহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলেন। আবার যথোপযুক্ত মূল্য অবধারণ করিয়া জীবনকৃষ্ণ বাবু তাহা মহারাণীর নামে ক্রয় করিলেন। মহালের মূল্য হইল চারি লক্ষ টাকা। চারি লক্ষ টাকায় কয়দিন চলিবে? নিত্যব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকায় দাঁড়াইল। সকলেই বুঝিতে লাগিলেন, শীঘ্র প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ পড়িবে তাহার ভুল নাই।

এক উদ্বেগ ব্যতীত রাজার আর কোন চিন্তা নাই। পাছে কোন স্থানে কোন মানব অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, ইহাই তাঁহার বিষম চিন্তা। অর্থ-ব্যয় হইতেছে, সর্ব্বস্ব যায় যায় হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে তাঁহার একটুও দৃক্‌পাত নাই। আর চারিমাস অতীত হইলেই নূতন ধান্য জন্মিবে। এবার ফসলের অবস্থা ভাল।

দাসীর স্বামী রামহরি বলিয়াছে, এবার ষোল আনা ধান জন্মিবে। তাহা হইলেই ভারতের অন্নাভাব ঘুচিয়া যাইবে। সকল লোক পরিশ্রম করিয়া চাউলের দাম উপার্জ্জন করিতে পারিবে। দেশ আবার আনন্দময় ও সুখময় হইবে। এই আনন্দে রাজা উমাশঙ্কর উন্মাদ-প্রায়।

গবর্ণমেণ্ট ও দেশের জন-সাধারণ রাজার এই অদ্ভুত দান-ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছেন। দরিদ্রগণ তাঁহাকে হৃদয়ভেদ করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতেছে সত্য, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন, নিশ্চয়ই রাজা উমাশঙ্কর শীঘ্রই সর্ব্বস্বান্ত হইবেন। তাঁহার এ দান-ব্যাপারের পরিণাম বড়ই ভয়াবহ হইবে। অনেক বন্ধু নানাদেশ হইতে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। অনেকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখনও ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন। রাজা বিনীত ভাবে সকলের পরামর্শ শ্রবণ করিলেন; সকলেরই নিকট তাঁহাদের হিতৈষিতা হেতু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, তাঁহারা এই কাণ্ডের

পরিণাম তাঁহার পক্ষে যেরূপ ভয়ানক হইবে বলিয়া কল্পনা করিতেছেন, তিনি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি একজন ধনশালী ব্যক্তি বলিয়া এক্ষণে পরিচিত আছেন, না হয় পরিণামে তিনি একজন দরিদ্র বলিয়া পরিচিত হইবেন। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ঠ বা অশুভ কি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর এইরূপ সময়ে একদিন উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে এই অত্যদ্ভুত দানব্যাপারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, অতঃপর এ কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সকলকে যাহা বলিয়া আসিতেছেন, রাজা উমাশঙ্কর বিনীত ভাবে লাট সাহেবকেও তাহাই বলিলেন। লাট সাহেব বুঝিলেন যে, এই কার্য্য হইতে রাজা এক্ষণে কোন মতেই নিরস্ত হইবেন না।

কেবল এক ব্যক্তি রাজার এই কাণ্ডে কোনই কথা কহিতেছেন না। রায় হরকুমার বাহাদুর ভালমন্দ সকল কথাতেই নীরব। এক দিন রাজা তাঁহার সহিত একাকী মিলিত হইয়া বলিলেন ;—

"খুড়া মহাশয়! আমাকে অনেকেই এই অন্নদান কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু আপনি একদিনও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতেছেন না কেন?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"আমি এ বিষয়ে কোন

পরামর্শ প্রদান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি না। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সাধুচূড়ামণি। তোমার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করাই আমার অভিপ্রায়। তোমাকে চালিত করিতে বাসনা নাই, বোধ হয় সাধ্যও নাই। তুমি যাহা করিতেছ, তাহার পরিণাম দেখিবার জন্য আমি উৎসুক রহিয়াছি।”

রাজা বলিলেন,—“অনেকেই অনুমান করিতেছেন, আমি অচিরে সর্ব্বস্বান্ত হইব। আমিও বুঝিতেছি, তাহার আর বিলম্ব নাই। কিন্তু সে অবস্থা কি আপনি বিশেষ ভয়াবহ বলিয়া মনে করেন না?”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“না বাবা, তাহা কেন মনে করিব। তোমার জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধুতা কেহই কাড়িয়া লইবে না। প্রভূত দানেও তাহার ক্ষয় হইবে না। তোমার ধনের নিমিত্ত তুমি আমাদের আদর ভাজন নহ। তোমার হৃদয়ের মহত্ত্ব হেতু তুমি আমাদের শ্লাঘার বস্তু। সে মহত্ত্বের যখন কোনই অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন কোন পরিণামেই ভয়াবহ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না।”

রাজা বলিলেন,—“আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“আমার আর এখানে থাকি-

আর বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। তথাপি আমি তোমার এই সকল অনুষ্ঠান দেখিবার নিমিত্তই এ স্থানে রহিয়াছি। তোমার কোন গর্হিত কার্য্য এ পর্য্যন্ত দেখি নাই ; বুঝিয়াছি ভবিষ্যতেও তাহা দেখিতে পাইব না। সুতরাং কোন কার্য্যেই আপত্তি বা প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন দেখিতে পাই না।”

তাঁহার চরণে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া রাজা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়।

রাজা আসিয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র রাণী অন্নপূর্ণা হাসিতে হাসিতে তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং হাত তুলিয়া একটী রহস্তের প্রণাম করিয়া বলিলেন,—সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তা এখন প্রাতঃপ্রণাম করাই ভাল। দাসীর প্রাতঃপ্রণাম রাজা মহাশয়! দাসীর ভাগ্যে আজি এ উপরি লাভ কেন সন্ন্যাসী ঠাকুর? এরূপ সময়ে এদিকে তো এক দিনও শুভাগমন ঘটে না।”

রাজা বলিলেন,—“সুহাস কি আজি এখানে আছেন?”

রাণী বলিলেন,—“ও তুমি ঠাকুরঝির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ। তবে এখন আমার আসাটা ভাল হয় নাই। আমি এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। তুমি এই বিছানায় একটু বইস।”

রাণী যাইতেছেন দেখিয়া রাজা তাঁহার অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "তুমি যাইও না। সুহাসের সহিত দেখা করাও আমার প্রয়োজন বটে। তুমি তাঁহাকে ডাকিবার জন্য আর কাহাকেও পাঠাও।"

তখনই একজন দাসী সুহাসিনীকে ডাকিতে গেল। রাণী বলিলেন,—"স্ত্রী আর ভগ্নী দুজনকেই এক সঙ্গে দরকার না হইলেই ভাল হয়। আগে ঠাকুরঝির পালা শেষ হউক না কেন? তাহার পর শ্রীচরণের দাসী আসিয়া চরণধূলা লইয়া চরিতার্থ হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"ক্রমেই তোমার দুষ্টামি বাড়িতেছে। তোমাকে একদিন ভারী রকম জব্দ করিব জান?"

তখনই খোকারাজাকে ক্রোড়ে লইয়া সুহাসিনী তথায় উপস্থিত হইলেন, রাজা বলিলেন,—"রাণী শুন, সুহাস শুন, আমি আজি একটা ভয়ানক কথা জানাইবার নিমিত্ত তোমাদের নিকট আসিয়াছি।"

রাজার কথার সুর শুনিয়া ও তাঁহার ভঙ্গী দেখিয়া সুহাসিনী ও রাণী একটু চিন্তাকুল হইলেন এবং উভয়েই প্রায় একস্থানে গম্ভীরবদনে স্থির হইয়া রহিলেন।

রাজা বলিলেন,—"তোমরা অবশ্যই শুনিতে পাইতেছে, আমার বিষয় সম্পত্তি সকলই প্রায় যায় যায় হইয়াছে।"

সুহাস বলিলেন,—"তাহার কোন কোন কথা শুনিতেছি বটে। কিন্তু সে জন্য কি হইয়াছে?"

রাণী বলিলেন,—"সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্যই ভগবান অর্থ প্রদান করেন। যখন সৎকার্য্যে বিষয় যাইতেছে তাহাতে চিন্তার কথা কি আছে?"

রাজা বলিলেন,—"কিন্তু ইহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা তোমরা কখন চিন্তা করিয়াছ কি? এখন দিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়া যাইতেছে। আর দুই মাস পরে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইব। আমাদের ঘর বাড়ী কিছুই থাকিবে না।"

সুহাস কোন কথা কহিলেন না। তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন,—"তাহার পর?"

রাজা বলিলেন,—"তাহার পর আমাদের বড়ই দুরবস্থা হইবে। আমরা কোথায় যাইব, কি খাইব, তাহার কোন ঠিকানা থাকিবে না।"

সুহাস এখনও নিরুত্তর। রাণী আবার জিজ্ঞাসিলেন, —"তাহার পর?"

রাজা বলিলেন,—"তাহার পর আর কি? এই রাজৈশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইলে হয় তো তোমাদের বড় কষ্ট হইবে। আমার সুখ দুঃখের সহিত তোমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই জন্যই তোমাদের নিকট এই কথা আজি উত্থাপন করি-

তেছি। যদি তোমরা ভবিষ্যতের নিমিত্ত সাবধান হইতে ইচ্ছা কর, যদি তোমরা আগতপ্রায় দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া কাতর হও, যদি তোমরা এই স্বচ্ছন্দতার অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে অনিচ্ছা কর, তাহা হইলে এখনও সাবধান হওয়ার উপায় আছে। এখনও যে সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে, তাহাতে আমাদের অনায়াসে প্রায় এইরূপ স্বচ্ছন্দ-তায় জীবন কাটিয়া যাইতে পারে। তোমাদের কি ইচ্ছা আমি জানিতে চাহি।”

রাণী বলিলেন,—“বড়ই নিষ্করুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার কার্য্য সম্বন্ধে আমার কি ইচ্ছা তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে, আর আমার ইচ্ছা বুঝিয়া তোমাকে কার্য্যের গতি ফিরাইতে হইবে। শুন সন্ন্যাসী রাজা, আমার কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। এ সংসারে এই যে অট্টালিকা, এই যে রাজৈশ্বর্য্য, এই যে অলঙ্কার রাশি, এই যে দাসদাসী, তোমার পদরেণুর তুলনায় সে সকল অতি অকিঞ্চিৎকর। তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার আনন্দ। তুমি যদি দারিদ্রদুর্দ্দশায় পতিত হও, তাহাতে আমি তোমার পদধূলি ভোগে বঞ্চিত হইব না। সুতরাং আমার সুখের, আমার আনন্দের একবিন্দুও অপচিত হইবে না। কাজ কি এ অনর্থক ভোগে। ধর্ম্মের নিমিত্ত, পরোপকারের নিমিত্ত, তোমার সহিত বৃক্ষ-তলবাসী হইতে হইবে, ইহার অপেক্ষা গৌরবের কথা

কি আছে? তুমি সন্ন্যাসী দেখিয়াই তোমার শ্রীচরণের আমি দাসী হইয়াছি। তোমার ঐশ্বর্য্যের কখন কামনা করি নাই। এখন তাহা ছাড়িতে হইবে বলিয়া দুঃখ করিব কেন? চল সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি অগ্রসর হও, তোমার চরণাঙ্ক দেখিতে দেখিতে অনুগামিনী দাসী এখনই খোকার হাত ধরিয়া বনবাসিনী হইবে। এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে আছে ঠাকুর? তুমি সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেও, দাসী দুর্দ্দশায় পড়িয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াও তোমাকে কখন বিরক্ত করিবে না।"

রাণী বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজার চক্ষুও জলভারাকুল হইল। সুহাসের নেত্র বহিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাজা বলিলেন,—"সুহাস, তুমিতো কোন কথাই বলিলে না। তোমার অভিপ্রায় না বুঝিলে আমি তো কিছুই স্থির করিতে পারি না।"

সুহাস বলিলেন,—"আমি কি বলিব? আমার ভাই সকল অবস্থাতেই রাজরাজেশ্বর। তুচ্ছ অর্থাগম হেতু, এই অট্টালিকার জন্য, কতকগুলা স্বর্ণরজতের জন্য আমার ভাই রাজা নহেন। আমি সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ভগ্নী হইতে পাইয়াছি। ঘটনাক্রমে যদি তাঁহাকে বনবাসী, সন্ন্যাসী, দরিদ্র হইতে হয়, তাহাতে তাঁহার রাজত্ব লোপ করিতে পারে বসুন্ধরায় এমন শক্তি কিছুরই নাই। তবে কেন

দাদা, তোমার বিষয় সম্পত্তি যায় যায় হইয়াছে শুনিয়া কথা কহিব? কেনই বা আমি সে চিন্তায় বিচলিত হইব?"

রাজা বলিলেন,—"তোমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার সুখ দুঃখে তোমাদের সুখ দুঃখ মিশিয়া আছে বলিয়াই আমি তোমাদিগকে আগ্রহ সহকারে এ বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘটনাক্রমে আমার যে কোন দশাই কেন উপস্থিত হউক না, আমি তাহাতে সুখদুঃখ বোধবিরহিত-ভাবে অবিচলিত থাকিবার উপদেশ বাল্যকাল হইতে লাভ করিয়াছি। তোমাদের স্থিরতাই আমার প্রার্থনীয়।"

তাহার পরে রাজা আদরে খোকাকে কোলে লই-লেন। খোকা পিতার ক্রোড়ে গিয়া সানন্দে তাঁহার চুল ধরিয়া বলিল,—"আমি টোর সঙ্গে গাছটলায় যাব।"

রাজা শিশুর মুখ চুম্বন করিয়া সাদরে বলিলেন,— "আমি যদি গাছতলায় যাই বাবা, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে আমার সঙ্গে গাছতলায় যাইতে হইবে।"

তাহার পর খোকাকে রাণীর ক্রোড়ে দিয়া রাজা সায়ংসন্ধ্যা সমাপনের নিমিত্ত কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভণ্ড।

রাজা উমাশঙ্করের বিষয় সম্পত্তি প্রায় সকলই গেল। জমিদারী প্রায় সকলই বিক্রীত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় মহারাণী করুণাময়ী একাই সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। কোন সম্পত্তিই অন্য হস্তে যাইল না। দান্কাণ্ড সমানই চলিতে লাগিল। উপর্য্যুপরি দুই বৎসরের অজন্মা হেতু এ দেশে যে প্রকার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ ও আলোচনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু রাজা উমাশঙ্করের সুব্যবস্থায় ও অপ্রাকৃত দানশীলতায় সে দায় হইতে এ দেশ রক্ষা পাইল। সকলেই বুঝিল, এক অসাধারণ মহাত্মার অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারে একটা দেশের সর্ব্বনাশ তিরোহিত হইয়া গেল। এ দেশের একটী মানবও অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল না। দুর্ভিক্ষরাক্ষস রাজা উমাশঙ্করকে গালি দিতে দিতে এ দেশে প্রবেশের আশা ত্যাগ করিল।

সমস্ত ভারত; এবং ইংলণ্ড ব্যাপিয়া রাজা উমাশঙ্করের

এই কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষিত হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র সংবাদ পত্রাদিতে এই অত্যদ্ভুত দান ব্যাপারের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতে থাকিল। স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া স্বহস্তে লিখিত এক পত্রদ্বারা রাজা উমাশঙ্করকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এ দেশের তাবৎ নরনারীর মুখে রাজা উমাশঙ্করের নাম দেবতার ন্যায় সমাদরে সংঘোষিত হইতে লাগিল। দেশের আবালবৃদ্ধ বণিতা তাঁহার নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করা পরম পুণ্যানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসা ও কীর্ত্তি ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কখন অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

রাজার এই সুনামের সঙ্গে সঙ্গে রাণী অন্নপূর্ণার নামও সমস্ত সভ্যজনপদে প্রচারিত হইল। তিনি প্রতিদিন বেলা একটা হইতে দুইটার মধ্যে সহস্র সহস্র নারী ও শিশুকে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া ভোজন করাইতেন। অন্তঃপুরসংলগ্ন প্রশস্ত প্রান্তরে বিশাল মণ্ডপ মধ্যে এই ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন হইত। শতাধিক ব্রাহ্মণী ও বহুসংখ্যক পরিচারিকা পাক ও পরিবেশন নির্ব্বাহ করিতেন। রাণী স্বয়ং সকল কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন, আগতা দরিদ্রা নারী ও শিশুসমূহ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ব্যতীত পায়স পিষ্টকাদি ও ভোজন করিত। ভোজনান্তে তাহারা

যখন উচ্চকণ্ঠে লক্ষ্মীরূপা রাণী অন্নপূর্ণার কল্যাণ ঘোষণা করিত, তখন রাজা উমাশঙ্কর বহির্বাটী হইতে সেই স্বর শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেন।

রাণীর এই ব্যাপারে কোনই পুরুষকে সহায়তা করিতে হইত না; এবং কোন পুরুষ সেদিকে যাইতে পাইত না; কেবল স্ত্রীলোক দ্বারা এই বৃহৎ ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহিত হইত। অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্তকুলের নারী ঘটনাচক্রে দুরাবস্থায় নিপতিত হইয়া রাণী অন্নপূর্ণার এই সত্রে ভোজন করিতে আসিতেন। পুরুষের সম্মুখে পড়িতে অথবা পুরুষের সম্মুখে আহার করিতে তাঁহাদের সাতিশয় সঙ্কোচ হইবে বিবেচনায়, অপিচ রাণী পুরুষান্তরের সম্মুখে দেখা দিবেন না; সুতরাং তাঁহার তত্ত্বাবধান জনিত পরিতৃপ্তির ব্যাঘাত হইবে মনে করিয়া রাণী এ কার্য্যে পুরুষের কোনই সংশ্রব থাকিতে দেন নাই।

অতি প্রত্যুষ হইতে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত রাণী এই দানকাণ্ডের বিবিধ ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকেন। তাহার পর স্নানাদি শেষ করিয়া রাজারজন্য পাক করিতে প্রবৃত্ত হন। রাজার পাক বড় বাহুল্য ভাবে আর সম্পন্ন হয় না। যাহা হয়, রাজা তাহাই তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া স্বকীয় কার্য্যোদ্দেশে প্রস্থান করেন। তাহার পর প্রায় দ্বিপ্রহর কালে রাজার ভোজনাবশিষ্ট অন্নাদি যৎসামান্য ভাবে আহার করিয়া রাণী দানব্যাপারের তত্ত্বাব-

ধানার্থ ধাবমানা হন। তথায় প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হয়।

অদ্য সুহাসিনী রাজার জন্য পাক করিতেছেন। এজন্য রাণী অনেক বেলা পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থলে থাকিতে পাইয়াছেন। তিনি যথাসময়ে আসিয়া রাজার চরণ প্রক্ষালন ও পাদোদক পান ও পরিশেষে তাঁহার পাত্রাবশেষ ভোজন করিয়া পুনরায় দানব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণার্থ প্রস্থান করিলেন।

সারি সারি কত নারীই কত স্থান অধিকার করিয়া ভোজন করিতে বসিয়াছে তাহার সীমা নাই। এক স্থানে একটী ঈষৎ দীর্ঘকায়া নারী অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখস্থ পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু সে তাহার কিছুই ভোজন করিতেছে না। রাণী চারিদিকে দেখিতে দেখিতে এবং যে যাহা চাহে তাহার ব্যবস্থা করিতে করিতে ক্রমে সেই অবগুণ্ঠনবতী নারীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ সময়ে সুহাসিনীও সাংসারিক কর্ম্ম এবং আহারাদি শেষ করিয়া অন্নপূর্ণার নিকটে আসিলেন। রাণী যদিও সকল নারীর নাম ও পরিচয় জানেন না, কিন্তু বহুদিন বারবার দর্শন হেতু সকলের আকার প্রকার তাঁহার সুপরিচিত। এই অবগুণ্ঠনবতীকে আর কোনদিন তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নারী আহার করিতেছেন না দেখিয়া অন্নপূর্ণা উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি আহার করিতেছেন না কেন? কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে কি?"

নারী ঘাড় নাড়িল; কিন্তু কোন কথা কহিল না, বা মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিল না। রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ভাত খাইবেন না—অন্য কোন খাদ্য খাইবেন কি?"

নারী আবার ঘাড় নাড়িল; বাক্যে কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার নিশ্বাস শব্দ শুনিয়া এবং তাঁহাকে চক্ষু মার্জ্জনা করিতে দেখিয়া রাণী বড় বিচলিত হইলেন। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার নিকট অন্য কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন কি?"

নারী এবার সমর্থনসূচক মস্তকান্দোলন করিল; কিন্তু কোন কথা কহিল না। রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি প্রার্থনা বলুন!"

নারী একবার বামে এবং একবার দক্ষিণে অবনত হইল। রাণী মনে করিলেন, এই নারী সম্ভবতঃ কোন বিশিষ্ট পরিবার ভুক্ত। অবশ্যই ইহার বিশেষ কোন প্রার্থনা আছে! পাছে মুখ দেখিলে আপনাকে চিনিতে পারে, অথবা তাহার প্রার্থনা পাছে কেহ শুনিতে পায় এই আশঙ্কায় এ নারী মনের কথা বলিতে পারিতেছে না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমাকে নির্জ্জনে আপনার প্রার্থনা জানাইতে চাহেন কি?"

নারী ঘাড় নাড়িয়া এই প্রশ্নে সম্মতি ব্যক্ত করিল। রাণী বলিলেন,—“আপনি আসুন, ঐ কক্ষে গিয়া আপনার কথা শুনিব। ঠাকুরঝি, তুমি ভাই ভাল করিয়া সকলের তত্ত্বাবধান কর।”

অন্নপূর্ণা অগ্রসর হইলেন। নারী তাঁহার অনুসরণ করিল। সুহাসিনী কোন তত্ত্বাবধান না করিয়া যে কক্ষে রাণী ও সেই অবগুণ্ঠনবতী প্রবেশ করিলেন, তাহারই দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া অবগুণ্ঠনবতী প্রবেশদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সুহাসিনীর চিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। অনেক কারণে তিনি এই কাণ্ড বিপজ্জনক ও অশুভ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি সাবধানে ও উৎকর্ণভাবে দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নারী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। রাণী সভয়ে দেখিলেন, এ ব্যক্তি নারী নহে—পুরুষ; আর কেহ নহে—শঙ্করনাথের সেই পূজারি ঘনশ্যাম বিদ্যানিধি। রাণীর মুখ হইতে একটা অব্যক্ত অস্ফুট-ভীতিব্যঞ্জক শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন? আপনি কেন স্ত্রীলোক সাজিয়া এই নারীগণের ভোজন স্থলে প্রবেশ করিয়াছেন?”

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলিলেন,—“আপনি ভয় পাইতে-

ছেন কেন? আমি এখানে আসিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, সেজন্য আপনার নিকট বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনার নিকট আমার এক ভিক্ষা আছে। সে ভিক্ষা চাহিবার আর সুযোগ না পাওয়ায়, আমাকে অগত্যা স্ত্রীলোক সাজিয়া এখানে আসিতে হইয়াছে।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“এরূপভাবে, আপনার প্রার্থনা আমি শুনিতে পারিব না। আপনার যদি কোন কথা থাকে, আপনি দাসীদিগের দ্বারা তাহা আমাকে জানাইবেন। পথ ছাড়িয়া দিউন, আমি চলিয়া যাই।”

ঘনশ্যাম সবিনয়ে বলিলেন,—অধীনের একটা কথা শুনিয়া যান। আমি সংক্ষেপে বলিব। আপনি দয়াময়ী। কোন ভিক্ষার্থী আপনার নিকট বিমুখ হয় না। আমার প্রতি কেন আপনি বিরক্ত হইতেছেন?”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“বলুন আপনার কি কথা! শীঘ্র শেষ করুন।”

ঘনশ্যাম বলিল,—“মনে করিয়া দেখুন, আপনি শঙ্করনাথের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যাহা আমি প্রার্থনা করিব, তাহাই আপনি পূরণ করিবেন।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“মিথ্যা কথা। এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি কখনই করি নাই। যাহা আমার সাধ্য হইবে, তাহা আমি আপনার জন্য করিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা আমি বলি নাই।”

ঘনশ্যাম বলিল,—"তাহাই হইবে, যাহা আমি প্রার্থনা করিব, তাহা আপনার সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত।

রাণী বলিলেন,—"বলুন আপনি কি চাহেন!"

ঘনশ্যাম বলিল,—"প্রতিজ্ঞা, বিশেষতঃ দেবসমক্ষে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে চিরদিন নরকস্থ হইতে হয়।"

রাণী বলিলেন,—"আপনার নিকট ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করিবার আমার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আপনি যাহা বলিতে চাহেন, তাহা শীঘ্র বলিয়া ফেলুন। আপনি অকারণ এরূপ বিলম্ব করিলে আমাকে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।"

সুহাসিনী দ্বারের পার্শ্ব হইতে সকল কথা সুস্পষ্টরূপে শুনিতে না পাইলেও, অনেক কথা বুঝিতে পারিলেন, তিনি বুঝিলেন, যে ব্যক্তি রাণীকে সঙ্গে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে নারী নহে—পুরুষ। এ সন্দেহ তাঁহার মনে প্রথমেই উদিত হইয়াছিল; এবং এই জন্যই তিনি অন্য কোন কর্ত্তব্যপালনে মনঃসংযোগ না করিয়া দ্বারপার্শ্বে অপেক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

রাণীর মুখ হইতে ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইবামাত্র, সুহাসিনী ইঙ্গিতে এক দাসীকে নিকটে ডাকিলেন এবং তাহাকে অতি সত্বর দেউড়ি হইতে জমাদার ও

পাঁচ সাত জন দ্বারবানকে রাজভগ্নীর নাম করিয়া ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তাহারা যেন মণ্ডপ দ্বারে অপেক্ষা করে এবং ডাকিবা মাত্র এখানে উপস্থিত হইতে পারে এরূপ আদেশও তিনি প্রদান করিলেন। দাসী বেগে চলিয়া গেল। আর এক দাসীকে ডাকিয়া তিনি বলিয়া দিলেন, দশ বারো জন পরিচারিকা যেন সকল কর্ম্ম ফেলিয়া এখনই তাঁহার নিকট আইসে। বারোজন দাসী তখনই সুহাসিনীর নিকট আসিল। যে দেউড়ি হইতে জমাদার প্রভৃতিকে ডাকিতে গিয়াছিল, সেও ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সকলই ঠিক হইয়াছে।

তখন কক্ষ মধ্যে ঘনশ্যাম বলিতেছে—"আপনি দয়া-ময়ী—সকলের সকল প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। এ অধমের সামান্য ভিক্ষা আপনি যদি না দেন, তাহা হইলে আজি আপনার সম্মুখে আমি আত্মহত্যা করিব। আপ-নাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকে পড়িতে হইবে।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"আমি তোমার প্রার্থনা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি না। তুমি দ্বার হইতে সরিয়া যাও। আমি চলিয়া যাইব।"

ঘনশ্যাম বলিল।—"এই কি আপনার দয়া? ভিক্ষা-র্থীকে এইরূপে বিমুখ করাই কি আপনার ধর্ম্ম। সুন্দরি! আমার সামান্য প্রার্থনা আমি বলিতেছি।"

অন্নপূর্ণা অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করি-

বেন—এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

ঘনশ্যাম বলিল,—"অন্নপূর্ণা, আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছি, কাশীতে আমি পাঠ করিতাম। সেই পঠদ্দশায় আমি অনেকবার তোমাকে দেখিয়াছি। তখন হইতে তোমার ঐ রূপের শিখা আমাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। তোমাকে দেখিতে পাইব এবং কখন না কখন তোমার কৃপা লাভ করিতে পারিব বলিয়াই আমি এই ঘৃণিত নীচকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে না পাইলে আমার মৃত্যু হইবে। তুমি আমাকে রক্ষা কর।"

নরাধম কাতরভাবে অন্নপূর্ণার চরণ সমীপে নিপতিত হইল। লজ্জায়, ক্রোধে, ঘৃণায় অন্নপূর্ণার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"নরাধম, ঘৃণিত কীট, আমার নিকট এইরূপ কথা কহিতে তোর সাহসে কুলাইল ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! আমি আদেশ করিতেছি, তুই এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা, আর তোর একটিও পাপ কথা যেন আমাকে শুনিতে না হয়।

তখন ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বস্ত্র মধ্য হইতে এক উজ্জ্বল ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল,—"দেখ অন্নপূর্ণা যদি তুমি আমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত না হও,

তাহা হইলে এখনই তোমার সম্মুখে এই ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

ব্রাহ্মণ ছুরিকা উত্তোলন করিল। এমন সময় বিষম শব্দে সেই দ্বার খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছয় জন ভোজপুরী এবং বারো জন দাসী, সর্ব্বশেষে সুহাসিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবানেরা ঘনশ্যামকে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর রাণীমায়ীকে প্রণাম জানাইয়া ধাক্কা মারিতে মারিতে ঘনশ্যামকে লইয়া বাহিরে চলিল।

অন্নপূর্ণা তখন নিতান্ত অবসন্নভাবে এক ভিত্তিতে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা। সুহাসিনী তখনই তাহার নিকটে গমন করিলেন। দাসীরা তখন জল ও পাখা লইয়া আসিল। সকলে তাঁহাকে গৃহের মধ্যস্থলে আনিয়া নানাপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এদিকে জমাদার ও দ্বারবানগণ নরাধম ঘনশ্যামকে লইয়া রাজার কাছারীতে উপস্থিত হইল। এই নরাধমের সম্বন্ধে কি দণ্ডবিধান করা উচিত, সকলে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল। জমাদার বলিল,—"দণ্ড আর কি? আমি এ শুয়ারের শির উড়াইয়া দিতে চাহি।"

আর একজন প্রস্তাব করিল,—"উহাকে কূয়ায় ফেলিয়া মাটী চাপা দাও।"

আর এক জন বলিল,—"ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাট।"

সদর নায়েব, মুহুরি, গোমস্তা, আমিন প্রভৃতি বহু লোক সে স্থানে সমবেত হইল। নায়েব বলিলেন,—ব্রাহ্মণ বলিয়া এরূপ নরাধমকে মাপ করা কথনই হইবে না। ইহাকে মারিয়া ফেলিলে কোন ক্ষতি নাই; আমি বলি একবারে এক-কোপে ইহাকে মারা হইবে না। ইহাকে ধীরে ধীরে মারিতে হইবে। ডালকুত্তা দিয়া থাওয়ানই সুব্যবস্থা।"

আর একজন বলিল,—"হাতীর পায়ে ফেলিয়া দিলেও হয়।"

আর এক ব্যক্তি বলিল,—"আমি বলি একথানি জুড়ি পূর্ব্বমুখে, আর একথানি জুড়ি পশ্চিম মুখে জুড়িয়া দুই গাড়ীর মাঝথানে এক গাড়ীতে এই হতভাগার হাত, আর এক গাড়ীতে পা বাঁধিয়া ঘোড়াকে চাবুক মারিলে যাহা হইতে পারে, তাহাই ইহার ঠিক সাজা।"

অনেকে এ প্রস্তাব শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং প্রস্তাব-কারীর প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজার নিকট সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার আগমন না হইলে অথবা তাঁহার কোন আদেশ না পাইলে কিছুই করিতে পারা যাইতেছে না। সকলেই আগ্রহে রাজার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজা আসিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরও আছেন। রাজা আসিয়া দেখিলেন,—"লোকেরা দড়া দিয়া ব্রাহ্মণকে কঠিনরূপে বন্ধন করিয়াছে এবং তাহাকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করিতেছে। সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। রায় বাহাদুর ও রাজা আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

জমাদার অগ্রসর হইয়া করজোড়ে বলিল,—"ধর্ম্মাবতার! ইহাকে এই মেয়ে মানুষের সাজে অন্দরের এক ঘরে হাতে এই ছুরি সমেত, রাণীমায়ির সম্মুখে আমরা ধরিয়াছি। আমি ইহার শির উড়াইয়া দিতে চাহি। হুজুরের হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

যে ব্যক্তি দুই গাড়ীর মধ্যে বাঁধিবার কথা বলিয়াছিল তাহার কথাও রাজাকে একজন শুনাইল।

রাজা বলিলেন,—"জমাদার এখনই সর্ব্বাগ্রে এই ব্রাহ্মণের বন্ধন খুলিয়া দাও।"

জমাদার অবাক্ হইল, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। কিন্তু কেহই প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। রাজাজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহস না হওয়ায় সে অগত্যা বন্ধন খুলিয়া দিল। তখন রাজা বলিলেন,—"বিদ্যানিধি মহাশয় আমি আমার স্ত্রী ও ভগ্নীর নিকট সকল কথাই শুনিয়াছি। আপনি বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। আপনার এরূপ মতিভ্রম কেন হইল তাহা আমি বুঝিতে পারি-

তেছি না। আপনি অবশ্যই জানেন, ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও প্রেম স্বতন্ত্র পদার্থ। আপনি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রাবল্যে নিতান্ত অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। যে নারী আপনার নহে, তাহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা কাহারও উচিত নহে, এ তত্ত্ব অবশ্যই আপনি বুঝেন। তথাপি সহসা আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ায় আমি নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। আমি আপনাকে কোন দণ্ড দিতে চাহি না। আপনি অবশ্যই চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া চলিবেন। এখানে অতঃপর কার্য্য করিতে বোধ হয় আপনার লজ্জা হইবে আপনার যদি বেতন বাকি থাকে খাজাঞ্চির নিকট হইতে লইয়া আপনি চলিয়া যাইতে পারেন। জমাদার! এ ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দাও।”

সকলের সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইল। বিনাশ করা দূরে থাকুক, রাজা ঘনশ্যামকে দুই ঘা প্রহার করিতেও আজ্ঞা করিলেন না। সকলেই দুঃখিত হইল। অনেকে একটু বিরক্তও হইল।

রাজা ও রায় বাহাদুর সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

——— ——

অন্নপূর্ণা ।

অষ্টম খণ্ড—মাধুর্য্য ।

—"তাহা হইতে পারে, একটী
'যা তাঁহার সাবধান হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহাশয়, ভাবিয়া আর
বা বুঝে, কত-

কর্ম্মফল।

ইবার তাহাই

তথাপি

নার

ঘনানন্দ স্বামী কাশীর সেই স্থানে প্রাত সমাধিমগ্ন অবস্থায় যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে· তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কলেবর হইতে যেন অধিকতর জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে। যে দুইজন শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকটস্থ থাকেন, তাঁহারা কেহই সেখানে নাই। একজন আশ্রমের নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে ব্যস্ত আছেন। আর একজন ভিক্ষায় গমন করিয়াছেন।

নীলরতন বাবু সেই স্থানে আগমন করিলেন। প্রতি দিন কোন না কোন সময়ে এই স্থানে আগমন করা ও সন্ন্যাসীকে প্রণাম করা তাঁহার নিয়মিত কর্ম্ম। তিনি দূর হইতে মহাপুরুষকে সমাধিমগ্ন দেখিয়া নীরবে ও নিঃশব্দে সেই স্থানে স্থির হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে ঘনানন্দের সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সুপ্তোত্থিত ন্যায় অবশভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীল-রতনকে দেখিতে পাইয়া তিনি নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

য়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করি-
। করিলেন। সন্ন্যাসী আসন
গাত্রোত্থান করিলেন। একবার
বস্তৃত করিলেন। একবার বামে ও
হইলেন। তাহার পর বলিলেন,—
সমস্ত কুশল?"

রতন বলিলেন,—"যাহারা ভাগ্যবলে মহাশয়ের
। ভাজন, তাহাদের অকুশলের সম্ভাবনা কোথায়?"

ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—"সোণাপুরের সংবাদ পাইয়াছেন?"

নীলরতন বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু যেরূপ সংবাদ পাইতেছি তাহাতে আমাদের একটু চিন্তার কারণ হইয়াছে।"

ঘনানন্দ বলিলেন—"কেন? রাজা উমাশঙ্কর সর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছেন, ইহাই এক চিন্তার কারণ?"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আমরা বিষয়াসক্ত অধম মানব। আমরা বাস্তবিক এ সংবাদে একটু বিচলিত হইয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনার জামাতা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসে তাঁহার যত আনন্দ, বোধ করি আর কিছুতেই সেরূপ নহে। রাজাগিরী তাঁহার বুঝি পোষাইতেছে না।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাহা হইতে পারে, একটী পুত্র হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, ভাবিয়া আর কি হইবে? মানুষ ভাবিয়া কতটুকুই বা বুঝে, কত-টুকুই বা স্থির করিতে পারে? যাহা হইবার তাহাই হইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাহা যদিও সত্য, তথাপি মানুষকে একটু সাবধান হইয়া চলা মন্দ নয়। আপনার যাহা হইবে ভাবিলেও, সন্তানাদিকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়।"

ঘনানন্দ বলিলেন—"বৈবাহিক মহাশয়, আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, আপনার জামতা এক সময়ে ভিক্ষুক ছিলেন। তাঁহাকে এই অতুল রাজৈশ্বর্য্য দিল কে? যিনি ভিক্ষুককে রাজৈশ্বর্য্য দিতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করিলে রাজার ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া তাঁহাকে ভিক্ষুক করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে নিশ্চয়ই আপনার দৌহিত্রের অমঙ্গলেও মঙ্গল হইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"ভগবানের এ কথায় আর সংশয় নাই, কিন্তু সকল কাজের আতিশয্য গর্হিত বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কেবল পুণ্যের বা, সদনুষ্ঠানের সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না।"

"কেন? অতি দানে বলি বদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহাও তো শুনা যায়।"

"মানব মাত্রেই যেন সেইরূপ বদ্ধ হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। সেরূপ বদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা নহে কি বৈবাহিক মহাশয়? আর একটা কথা বলি এবারকার এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ভারতের নানাস্থানে কত লোকই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অন্নপূর্ণার নিকেতন-স্বরূপ এই কাশীধামেও কি শোচনীয় অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল, শুনা যাইতেছে প্রয়াগেও ভয়ানক অন্নাভাব ঘটিয়াছিল, কিন্তু একজন মনুষ্যের দানশীলতায় ও চেষ্টায় সমগ্র ভারতভূমির একটী মানবও অন্নাভাবে মরিতে পারে নাই, ইহা কি সামান্য আনন্দের কথা? একজনের দুঃখে ও ক্লেশে যদি বহুলোকের দুঃখ ও ক্লেশ বিদূরিত হয়, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? আরও মনে করিয়া দেখুন, উমাশঙ্কর কিছুই করিতেছেন না, কিছু করিতে তাঁহার সাধ্যও নাই। একটা দেশকে ধ্বংস করা বা রক্ষা করা বিশ্বনিয়ন্তার বাসনাতেই ঘটিয়া থাকে। তিনি এক একটা নিমিত্ত কারণ মাত্র উপলক্ষ করিয়া অনেক স্থলে কার্য্য সম্পাদন করেন। এ স্থলেও উমাশঙ্করকে নিমিত্ত কারণ মাত্র জানিবেন। আপনি

এ জন্য চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। কার্য্য স্বকীয় পথ স্থির করিয়া লইবে এবং নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইয়া সমাপ্ত হইবে।”

নীলরতন বাবু নীরব। তিনি সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“কয়দিন শ্যামলাল বাবুর সন্ধান পাই নাই। তাঁহার সংবাদ আপনার অবিদিত না থাকিতে পারে।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তিনি ভাল আছেন। আপনি এখনই এখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও তাঁহার কর্ত্তৃত্বে শ্যামলালের বিশ্বাস হইয়াছে। তাহার চিত্ত উত্তরোত্তর সুস্থ হইয়া আসিতেছে। এক সময়ে যে ব্যক্তি ঘোর পাপী ছিল, তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!”

নীলরতন বলিলেন,—“ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। মহাপুরুষ ও তাঁহার শিষ্যের প্রতি যাহার ভক্তি শ্রদ্ধা জন্মিবে সে যে ভাগ্যবান্ হইবে তাহার সন্দেহ কি?”

দূরে শ্যামলাল বাবুর মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। তিনি দূর হইতেই ভূতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। ঘনানন্দ তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্যামলাল অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিলেন এবং সেই স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—“দয়াময়,

ভগবানে সর্ব্বকর্ম্মফল নির্ভর করাই একমাত্র ধর্ম্ম। আমি যত গর্হিত বা হিত কার্য্য করিয়াছি, করিতেছি ও করিব সকলই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের কার্য্য, এই পরম ধর্ম্মে পূর্ণ বিশ্বাস আমাকে সুখী করিয়াছেন।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“এই নিষ্ঠায় তুমি পূর্ণভাবে ও অবিচলিত মনে নির্ভর করিয়া থাক। ইহাই প্রধান ধর্ম্ম নহে; ধর্ম্মের ইহা একটী সোপান। তুমি কামনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছ, সুখ দুঃখে তোমার সমান জ্ঞান হইয়াছে এবং সর্ব্ব বিষয়েই আসক্তি শূন্য হইয়াছ। বহু সাধনাতেও মনুষ্য, হৃদয়ের এই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। উমাশঙ্কর স্বল্পকালের উপদেশে তোমার এই অসম্ভব চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে পারিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ।”

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“প্রভো, এই স্থানে একটা কথা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি। যে অবস্থা বহু সাধনা ও বহু আয়াসে লব্ধ হয়, বহুকালের কর্ম্ম ও সাধনার বলে যে চিত্তশুদ্ধি সঞ্জাত হয় তাহা এরূপ সহসা স্বল্পকালে শ্যামলাল বাবুর জন্মিল কেন, তাহা স্থির করিতে আমি অক্ষম। কৃপা সহকারে ইহার মীমাংসা করিয়া আমাকে সুস্থির করুন।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“ইহার মীমাংসা অতি সহজ। শ্রীভগবান স্বয়ং ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

আপনি এই জন্মে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহার নষ্ট হইতেছে না, ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না বা লুপ্ত হইতেছে না। কর্ম্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির পরিণাম জ্ঞান। এ জন্মে কোন কর্ম্ম না করিয়া কোন কোন মহাত্মা সহসা জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, ইহার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম তাদৃশ জ্ঞান প্রাপ্তির হেতু। জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-দ্বারা যে চিত্ত শুদ্ধি বা জ্ঞান উপজাত হইয়াছে, তাহা সঞ্চিত থাকে। দেহ-রূপ পিঞ্জরাবদ্ধ মনুষ্য সহসা তাহা স্বয়ং বুঝিতে ও জানিতে পারে না। যে জ্ঞান তাহাদের সহজাত তাহার পরিচয়ও তাহারা আপনারা পায় না। এক জন সদ্‌গুরুর সহিত সম্মিলন হইলে, দৈবাৎ কোন দয়াপরবশ মহাত্মার দর্শন পাইলে, সহসা কোন জ্ঞানীজন প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিলে, জন্মান্তরীণ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত জ্ঞানবীজ সহজেই অঙ্কুরিত এবং অচিরে ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে।"

নীলরতন বলিলেন,—"এ কথা এক প্রকার বোধগম্য হইল, কিন্তু শ্যামলাল বাবু জীবনে বিবিধ পাপানুষ্ঠান কেন করিলেন? যাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত জ্ঞানের বীজ ছিল তিনি কেন বহুবিধ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলজাত জ্ঞানের

যখন উন্মেষ হইবে, তখনই মন পুণ্য ও পবিত্রতা এবং ক্রমোন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুল হইবে। তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ লব্ধ জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ার অগ্রে, মনুষ্য মনুষ্যই থাকে। পাপে ও পাপজনিত আপাত মনোহর আনন্দে তাহার স্বতঃপ্রবৃত্তি থাকে। সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে সে তাহাতে প্রমত্ত হয়। এইরূপ কারণে শ্যামলাল পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারেন। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলেও তাঁহার পাপভোগ ঘটিতে পারে।"

নীলরতন বলিলেন,—"সে কিরূপ? জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-ফলে চিত্তশুদ্ধি হইবে; পাপ প্রবৃত্তি কেন ঘটিবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"অনাসক্ত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম-ফলে চিত্তশুদ্ধি সঞ্চিত হইবে এবং আসক্ত বা সকাম কর্ম্মফলে জন্মান্তরে সেই প্রবৃত্তির পরিপোষক পরিণামই লব্ধ হইবে। আপনি দেখুন, ধ্রুব অতি বাল্যকাল হইতেই ভোগার্থী, ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলজাত অনুরাগ। কিন্তু তাঁহার ভোগাসক্তি ছিল বলিয়া পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইয়াও তাঁহাকে রাজত্ব ও রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইল। সাধনা দ্বারা, উপদেশ দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ অতি সহজেই ঘটিল; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব-জন্মের আসক্তি হেতু তাঁহাকে বিষয় ভোগরূপ পাশে বদ্ধ হইতে হইল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অতি অল্প বয়সেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বজন্মেই কর্ম্মজনিত

লব্ধজ্ঞান হইয়াছিলেন ; এজন্য অন্য কোন সাধনায় তাঁহার প্রয়োজন হইল না। শ্যামলাল বাবুর জ্ঞানের পথ সম্ভবতঃ পূর্ব্বজন্মেই স্থির হইয়াছিল ; সঙ্গে সঙ্গে ভোগের আসক্তিও ছিল। এজন্য তাঁহার জীবনে এইরূপ ঘটিয়াছে, এরূপ অনুমান অসম্ভব নহে।”

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“তাহা হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই একসঙ্গে থাকিতে পারে?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে, অজ্ঞান তাঁহার সমীপেও যাইতে পারে না। তাঁহার পাপরূপ দুঃখজ্বালা কিছুই থাকে না। তিনি তখন পূর্ণানন্দের অধিকারী হইয়া পরম সুখভোগ করেন। তিনি তখন ভগবানের স্বরূপ হইয়া পড়েন। সে অবস্থাপ্রাপ্তি বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু জ্ঞানের অল্পমাত্র—একটী কণিকামাত্র উপজাত হইলেও তাহার আর ক্ষয় হয় না ; তাহা থাকিয়া যায়। সাধনা, সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষা দ্বারা তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে তাঁহাকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করিতে থাকে। এইরূপ সামান্যমাত্র জ্ঞান যখন থাকে, তখন অজ্ঞানেই মনুষ্য পূর্ণ থাকে। তাহার অজ্ঞানের আতিশয্য স্বল্প জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাহার পশু প্রকৃতিই তখন বলবান্ থাকে। মনুষ্য সকল বিষয়েই পশুর সহিত সমান। কেবল এক জ্ঞানরূপ অমূল্য ধন তাহাকে পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে।

সেই কণিকামাত্র জ্ঞান যথন আচ্ছন্ন থাকে, তথন মনুষ্য পশুর ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠানেই আসক্ত হয় এবং তাহাই করে। সেই সামান্য জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই সে আপনার পথ চিনিয়া লইতে পারে, অতীত জীবনের পাপ তাহার লজ্জা ও যন্ত্রণার হেতু হইয়া পড়ে। বোধ হয় শ্যামলাল বাবুর জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকিতে পারে।”

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—“লব্ধ ও আচ্ছন্ন জ্ঞানের সহসা এরূপ উন্মেষ হয় কিরূপে?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“অতীত জীবনের সামান্য মাত্র জ্ঞানও সহসা ফুটিয়া উঠে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে কাহারও সহায়তা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত অধিকতর জ্ঞানীর সামান্য কথায়, অল্প উপদেশে বা তাঁহার কার্য্য প্রণালীর পর্য্যালোচনায় অতীত জীবনোপার্জ্জিত সামান্যমাত্র জ্ঞানও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রাদিতে সৎসঙ্গের বিবিধ মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সৎসঙ্গের প্রভাবে অতীত জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে পারে, মহৎ দৃষ্টান্তের আলোচনায় চিত্তে মহৎ ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে এবং জ্ঞানরূপ অতুলনীয় ধনলাভের নিমিত্ত আকিঞ্চন হইতে পারে।”

নীলরতন বলিলেন,—“আপনার কথা শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতেছি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—"পাপী অধম শ্যামলালের উপলক্ষে ভগবানের মুখে এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা; ইহা শ্যামলালের পরম সৌভাগ্য।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"অতঃপর শ্যামলাল বাবুর কি কর্ত্তব্য?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আপনি এবার কঠিন কথার অবতারণা করিয়াছেন। শ্যামলাল বাবুর হৃদয়ে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অত্যল্প সঞ্চিত জ্ঞান ছিল; তাঁহার ভাগ্যক্রমে সহসা তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সেই জ্ঞানকে বাড়াইয়া ক্রমেই পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"কি তাহার উপায়?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহার উপায় শিক্ষক দেখাইয়া দিতে পারেন। সাধারণতঃ সেই শিক্ষককে লোকে গুরু বলে। এই গুরু কথাটা এতই নিন্দনীয় ও ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে যে আমি তাহার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি না।"

নীলরতন বলিলেন,—"গুরু কথাটা লজ্জাজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"লোকসমাজে আজি কালি যাঁহাদের গুরু বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, তাঁহারা প্রায়ই নিতান্ত অজ্ঞান ও নিকৃষ্ট জীব। তাঁহারা শ্মশ্রু

গুম্ফ মুণ্ডন করিয়া, অঙ্গের বিবিধ স্থানে তিলক ধারণ করিয়া মানব সমাজের সর্ব্বনাশ সাধনের নিমিত্ত নানা স্থানে পর্য্যটন করেন। জ্ঞান বা শাস্ত্র কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানেন না, সাধনার কোন তত্ত্বই তাঁহারা বুঝেন না, পরকাল সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। তাঁহারা গাঁজা খাইতে জানেন, সুন্দরী বিধবা যুবতী তাঁহাদের বড়ই আদরের বস্তু, ঘন দুগ্ধ ও সন্দেশ তাঁহাদের বড়ই লোভজনক। তাঁহারা শিষ্যের মস্তকে পদস্পর্শ করাইয়া বার্ষিক গ্রহণ করেন, শিষ্যকে জ্ঞান দিতেছি বলিয়া অজ্ঞানের কূপে ফেলিয়া দেন, তাঁহারা বিবিধবিধানে সমাজের সর্ব্বনাশ করেন। এই শ্রেণীর গুরু নিতান্ত নিন্দনীয় এবং ইহাদের কৃপায় দেশে অজ্ঞানান্ধকার বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে।”

নীলরতন বলিলেন,—“সংসারে যত গুরু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই এইরূপ বটে। ইহাদের সাহায্যে কোনই হিত হয় না কি?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“কেমন করিয়া হইবে? যে পরমপদ শিষ্যকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত গুরুদেব দায়ী, তিনি স্বয়ং কখন তাহা দেখেন নাই। তাহার আকার, প্রকার, অবস্থান স্থান প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। তিনি কিরূপে অপরকে তাহা দেখাই-

বেন? অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ যেমন গর্ত্তে পতিত হয়, এইরূপ গুরুর সাহায্যে শিষ্যের সেই দুর্গতি হয়।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপ গুরু পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জ্ঞানীর পদাশ্রয় করাই উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে অতি প্রবল শাসন দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুত্যাগ মহাপাপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ শাসনও সেই ব্যবসাদার গুরুদিগের কৃত। তাহারা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছে, যে তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কালক্রমে লোকের অবজ্ঞার বিষয় হইবে। তখন নরসমাজ তাহাদিগকে দুর করিয়া দিবে এবং তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্যই তাহারা সময় থাকিতে গুরুত্যাগে মহাপাপরূপ মিথ্যা শাসন বাক্য প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এ সকল কথা ঐ ভণ্ড গুরুদিগের কল্পিত, অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য। এই জন্যই এই অধম গুরুগণ শিষ্যবিত্তাপহারক নামে অভিহিত হইয়াছেন।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে প্রভুর বিবেচনায় গুরুত্যাগে কোনই দোষ নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই কোন দোষ নাই। বরং তাহা নিতান্ত আবশ্যক কার্য্য। ছাত্র বাল্যকালে যে গুরু মহাশয়ের নিকট 'ক' 'খ' অভ্যাস করে, এণ্ট্রান্স পাস করিবার সময়ও কি সেই গুরু মহাশয় তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতে পারেন? এই লৌকিক শিক্ষাতেও গুরুর

পরিবর্ত্তন যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞানরূপ পরমধন লাভার্থে গুরুর পরিবর্ত্তন তদধিক আবশ্যক। যে গুরুর নিকট যতটুকু সাধনার উপায় শিক্ষা হওয়া সম্ভব, তাহা লব্ধ হওয়ার পর তাঁহার নিকট আর কি শিক্ষা হইবে? সদাশয় গুরু তখনই স্বয়ং শিষ্যকে অন্য কোন মহাত্মার শরণাগত হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিবেন। যে শিষ্য সাধনাপথে পূর্ব্বজন্ম হইতেই অগ্রসর হইয়া আছে, যে শিষ্য বর্ত্তমান জীবনেও অপূর্ব্ব সাধনাশক্তি লাভ করিয়াছে, সে কেমন করিয়া একমাত্র গুরুর অধীনে থাকিয়া আপনার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল করিবে? যে গুরুর নিকট যতটুকু শিক্ষা লাভের সম্ভাবনা, সেটুকু লাভ করার পরই অন্য কোন মহত্তর ব্যক্তির শরণাগত হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে গুরুত্যাগ করা সর্ব্বদা আবশ্যক হইয়া থাকে।”

নীলরতন বলিলেন,—“আপনার কথায় অনেক ভ্রম দূর হইল। মূল কথার এখনও শেষ হয় নাই। ভাগ্যবান্ শ্যামলাল বাবু এক্ষণে কি করিবেন?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তিনি এক্ষণে সদ্গুরুর কৃপাভাজন হইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকুন। শ্যামলাল বাবু বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। যাঁহার হৃদয়ে অল্পমাত্র জ্ঞানও থাকে, তিনি মহাত্মা। ভাগ্যক্রমে শ্যামলালবাবু

মহদ্ব্যক্তির আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে অবশ্যই শ্যামলালের ক্রমোন্নতি হইবে।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“দয়াময় সমস্ত কথাই আমি নীরবে শুনিলাম। কিন্তু আমার হৃদয়ে কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান আছে, একথা আপনার মুখ দিয়া বাহির না হইলে আমি নিশ্চয়ই পরিহাস বাক্য বলিয়া মনে করিতাম। আমি অধম, আমি হীন, আমি পাপী, আমি বেশ্যাপুত্র, আমার আবার জ্ঞান!”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তুমি যে আপনাকে তৃণাদপি সুনীচ জ্ঞান করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার জ্ঞানের ফল। যিনি সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বলিলেই হয়, সেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যেরও জন্মঘটিত দুর্নাম ছিল। আর যিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ জ্ঞানকল্প সেই ভগবান্ বেদব্যাসের জন্ম বৃত্তান্তও বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। জন্মঘটিত কুৎসিত ইতিহাসে জাতব্যক্তির কোন দোষ হয় না। যাও বৎস, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার শুভ হইবে। তুমি অবিচলিত চিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে থাক, ইহাই তোমার প্রথম সাধনা।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“দয়াময়, আপনাকে প্রণাম করিয়া আমি এক্ষণে বিদায় হই। আপনার শ্রীচরণে হস্তার্পণ করিয়া চরণধূলি গ্রহণের অধিকার লাভে এ অধম পাপী সাহস করিতে পারে কি?”

তখন ঘনানন্দ বলিলেন,—“নিশ্চয়ই পার। তুমি আমার শিষ্যের শিষ্য, সুতরাং পরম আদরের বস্তু।”

তখন শ্যামলাল মহাপুরুষের চরণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইলেন। মহাপুরুষ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; আনন্দে শ্যামলালের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মহাপুরুষ তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিলে, তিনি অবসিত কলেবরে ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

নীলরতন বলিলেন,—“অদ্ভুত ব্যাপার! চিরস্মরণীয় দৃশ্য! আমার সৌভাগ্য, আমি এই প্রেমলীলার অভিনয় দেখিতে পাইলাম।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“বৈবাহিক মহাশয়, আজি এই স্থানেই আমাদের সাক্ষাতের শেষ। শ্যামলাল, আজি তুমি প্রস্থান কর। কল্য প্রাতে উভয়েই আমার নিকট আসিও আমি আর এক গুরুতর কথার অবতারণা করিব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাকে একটা স্থান নিরূপণ করিয়া বাস করিতে বলিয়াছিলাম। তাহার ব্যবস্থা তুমি করিয়াছ?”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আজ্ঞা হাঁ; নীলরতন বাবুর কৃপায় তাহা স্থির করিয়াছি এবং গত তিন দিন সেখানেই বাস করিতেছি। এ অধম দাসও সাহস করিয়া একটা

কথা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। এরূপ ঘর পাতিবার কি প্রয়োজন ছিল?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“দেহ রক্ষা করিবার জন্য ঘরের আবশ্যক। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে অনেক দৈহিক সহিষ্ণুতা আবশ্যক, তৎসমস্ত সুদীর্ঘ অভ্যাসসাপেক্ষ। তুমি আজন্ম সুখী ও যত্নসেবিত। সহসা এরূপ কঠোরতায় তোমার পীড়া হওয়া সম্ভব।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“হইলেই বা ক্ষতি কি? পীড়া বা মৃত্যু কিছুই ভয়ের কারণ বলিয়া আমার মনে হয় না।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“সে কথা ভুল। এই দেহ রক্ষা করিতে না পারিলে সাধনা করিবে কে? মৃত্যু হইলে সকল সাধনাই শেষ হইল। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই সাধনা। মৃত্যু হইলে লোকান্তরে সুদীর্ঘকাল ফলভোগের পর আবার জন্ম হইবে। আবার তখন যে স্থানে সাধনার শেষ হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। সে বড় বিষম যন্ত্রণা। সুতরাং জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া যথাসাধ্য সাধনার পথে অগ্রগামী হইতে চেষ্টা করা আবশ্যক। এজন্য আহারাদি সম্বন্ধে যোগীর অনেক নিয়ম আছে। অনেক অভ্যাসবলে যোগী দেহকে সর্ব্ব-ক্লেশ-সহিষ্ণু করিতে সক্ষম হন। তুমি অনভ্যস্ত; সুতরাং তোমাকে বিবিধ উপায়ে দেহ রক্ষার ব্যবস্থা

করিতে হইবে। তোমার গুরুদেবের নিকট তুমি সময়-মত সকল শিক্ষাই লাভ করিবে।”

প্রণাম করিয়া নীলরতন ও শ্যামলাল প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্রিতা।

কাশীর উত্তর প্রান্তে এক জনশূন্য স্থানে নীলরতন বাবু শ্যামলালের জন্য একটী উত্তম ঘর স্থির করিয়া দিয়াছেন। শ্যামলাল তথায় তিনদিন হইতে বাস করিতেছেন। তথায় কোন দ্রব্য সামগ্রী নাই। নীলরতন বাবু অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু সামগ্রী আনিয়া দিবার নিমিত্ত অনেক আগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্যামলাল কোন মতেই কোন সামগ্রী লইতে সম্মত হন নাই। তিনি বলেন, তাহা হইলে দ্রব্যরক্ষার জন্য ঘরে তালা দিতে হইবে, তাহা হইলেই একটা চাবি রাখিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই একটা উদ্বেগের প্রয়োজন হইবে। মহাপুরুষের আজ্ঞায় তিনি ঘরে বাস করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না। তিনি আপনি কতকগুলি খড় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারই উপর তিনি শয়ন করেন, আর যে সত্রে তিনি আহার করেন, সেই স্থান হইতে একটা মৃৎভাণ্ড আনিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতেই গঙ্গাজল আনিয়া রাখেন। পিপাসা বোধ

হইলে তাহাই সেবন করেন। এই দুই সামগ্রী কেহ লইয়া যাইবে না, সাবধানতার কোন প্রয়োজন হইবে না এবং কোনরূপে নষ্ট হইলেও ক্ষতি হইবে না।

শ্যামলাল কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, দ্রুত পাদবিক্ষেপে আপনার এই আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে আসিয়া শ্যামলাল দেখিলেন, এক সুন্দরী নারী তাঁহার সেই ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। সুন্দরী নতবদনা; সুতরাং শ্যামলাল তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি? এখানে কেন আসিয়াছ?"

সুন্দরী বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া ধীরভাবে শ্যামলালের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিলেন। তাহার পর মুখ তুলিয়া শ্যামলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

সবিস্ময়ে শ্যামলাল কহিলেন,—"বিধুমুখী, তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?"

বিধুমুখী সজল নয়নে বলিলেন,—"অনেক স্থান ঘুরিয়া, অনেক চেষ্টায়, অনেকের সাহায্যে তোমার নিকট আসিতে পারিয়াছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কেন তুমি এখানে আসিয়াছ?

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

শ্যামলাল জিজ্ঞাসিলেন,—“এখন তুমি কোথায় থাক ?”

বিধুমুখী বলিলেন,—“আমি আগে এক দেবতার তাহার পর এক দেবীর আশ্রয়ে ছিলাম। এখন তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“শুনিয়াছি হরিচরণ তোমাকে আবার বিপদে ফেলিয়াছিল।”

“হাঁ। তোমার চরণকৃপায় সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমার নিকট কেন আসিয়াছ ?”

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল আবার জিজ্ঞাসিলেন, —“আমাকে তোমার কি প্রয়োজন ?”

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল আবার জিজ্ঞাসিলেন, —“আমার দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে ?”

বিধুমুখী নিরুত্তর। শ্যামলাল বলিলেন,—“কথা কহিতেছ না কেন ? কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট আসিয়াছ বল ?”

তখন বিধুমুখী উঠিয়া শ্যামলালের চরণসান্নিধ্য হইতে একটু দূরে দাঁড়াইলেন এবং গলায় কাপড় দিয়া যুক্তকরে কহিলেন,—“কি বলিব ? তোমার এসকল কঠোর প্রশ্নের কি উত্তর দিব ? আমি তোমার নিকট না আসিয়া আর

কোথায় যাইব ? আমি শুনিয়াছি, তুমি পরম জ্ঞানী হইয়াছ। তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার চরণ আশ্রয় ভিন্ন আমার আর স্থান কোথায় আছে ? তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার রক্ষক, তুমি চরণে স্থান না দিলে আমাকে কে স্থান দিবে ?”

বিধুমুখীর চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল পড়িতেছে। কি শোভা! সেই ঈষৎ সম্মুখনতা, গললগ্নীকৃতবসনা, যুক্তকরা সুন্দরীকে তখন পরম শোভাময়ী দেখাইতে লাগিল।

শ্যামলাল কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে বিধুমুখী বলিলেন,—“আমি পাপীয়সী, কল্পনাতীত পাপের পঙ্কে আমি প্রলিপ্তা, কিন্তু তুমি তো জ্ঞানময় মহাত্মা হইয়াছ। পাপীয়সীর পাপ ক্ষমা করিয়া, তাহার অন্তরাত্মা ধৌত করিয়া চরণে স্থানদান করাই তো মহাপুরুষের কার্য্য। তুমি যদি এ চরণাশ্রিতা দাসীকে উদ্ধার করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার গৌরব হইবে কেন ? দয়াময়, তোমার চরণে আমার স্বত্ব আছে। আমি কদাপি তোমার চরণাশ্রয় ত্যাগ করিব না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“বিধুমুখী, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—আমি অধম বেশ্যাপুত্র। তুমি আমাকে প্রণাম করিয়া, বার বার আমার দাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়া আমাকে বিষম পাতকগ্রস্ত করিতেছ। আমি, এজন্য তোমার

চরণে প্রণাম করি। তুমি পাপীয়সী কি না তাহা আমি জানি না। শুনিয়াছিলাম, তুমি কিছু দিন পাপের পথে ভ্রমণ করিয়াছ। তাহাতে আমার কোন অনিষ্ঠ হয় নাই, আমি সে জন্য কোন ক্লেশ বোধ করি নাই, সে কথা আমার আর মনেও নাই। পাপে যদি মনুষ্য বর্জ্জনীয় হইত, তাহা হইলে বিধুমুখী, এ সংসারে আমার তো স্থান হইত না। আমার তুল্য গুরুতর পাপ সংসারে কেহ কখন করিয়াছে কি? এত পাপের বোঝা স্কন্ধে লইয়াও আমি স্বচ্ছন্দে মনুষ্য সমাজে বিচরণ করিতেছি, আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করিতেছি। তুমি পাপের কথা ভুলিয়া যাও। যে পাপের সাগরে ভাসিতেছে, তাহার নিকট শিশির বিন্দুবৎ পাপের কথায় কাজ কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এমন কথা তুমি বলিও না। তুমি পুরুষ। তোমার পাপ আর আমার পাপে প্রভেদ বিস্তর। যে পাপ শুনিলে নারীর পাপ হয়, আমি সেই পাপে পাপী।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এ কথার কোন অর্থ নাই। ব্যভিচার নর ও নারী উভয়ের পক্ষেই সমান পাপ। অনিষ্ট ও অসুবিধা উভয়ের পাপেই সমান হয়। উভয়ের পাপেই সমাজের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু সে পাপের কথায় এখন কাজ নাই। আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি। আমার

স্থান নাই, আশ্রয় নাই, ভক্ষ্য নাই, সংস্থান নাই। আমি তোমাকে আশ্রয় দিব কিরূপে?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি কিছুই চাহি না। আমার জন্য তোমার কোন আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। আমি আমার সমস্ত অভাব অসুবিধা মিটাইয়া লইব। তোমার সে জন্য কখনও কোনপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে আমার আশ্রয়ে তোমার প্রয়োজন কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আমি তোমাকে দর্শন করিতে চাহি। আমি তোমার নিকটে আসিব না, তোমার সহিত কথা কহিব না, তোমাকে বিরক্ত করিব না। কেবল দূর হইতে তোমাকে দর্শন করিব। দয়াময়, তুমি জ্ঞানী। দুঃখীর দুঃখ দূর করাই তোমার ধর্ম্ম। আর্ত্তের উদ্ধার সাধন তোমার ব্রত, তুমি কৃপা করিয়া আমার এ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না কি?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"দেখ বিধুমুখী, তুমি রূপসী। এখনও তোমার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে। এক দিন তোমার এই রূপ দেখিয়া আমি অন্ধ হইয়াছিলাম। তুমি আমাকে উৎসাহ দেও নাই, আদর কর নাই, নিকটে বসিতে দেও নাই। তোমার সেই নিগ্রহ আমার পরমোপকারের হেতু হইয়াছে। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি,

তোমার নিকট আমি অসংখ্য উপকারে বদ্ধ। তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। তুমি রূপ দেখাইয়া মত্ত করিয়াছ, কিন্তু তাহা ভোগ করিতে দেও নাই। ইহাতে আমার চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে। বিষয় সম্পত্তি সমস্ত তোমাকে দিয়াছি, তুমি আমাকে সামান্য অন্ন পর্য্যন্ত দিতেও ইচ্ছা কর নাই, ইহাতে আমার অনেক ক্লেশসহিষ্ণুতা হইয়াছে। তোমার দ্বারবান প্রভৃতির নিকট নানাস্থানে নিগ্রহ ভোগ করিয়া আমার হৃদয় হইতে মানাপমানের বোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই কাশী-ধামে তুমি আগমন করায়, তোমার দর্শন কামনায় আমাকে কাশী আসিতে হইয়াছে। এখানে রাজপথে তোমার বলে বলবান্ হরিচরণের জুতা আমি খাইয়াছি, তাহাতে আমার চিত্ত সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছে। তাহার পর তোমার জন্য এখানে আসিয়াই আমি মনুষ্য-মধ্যে দেবতা, জ্ঞানের সমুদ্র, দয়ার উৎস, পরমপুরুষ উমাশঙ্করের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। শুনিয়াছি তুমিই তাঁহাকে আমার সন্ধান করিবার ভার দিয়াছিলে। ইহাও তোমার অসীম দয়া। সেই দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। পরমানন্দের পথ দেখিতে পাইয়াছি, জীবনে যে সন্তোষ কখন লাভ করি নাই, সে সন্তোষ ও তৃপ্তি আমি লাভ করিয়াছি। বিধুমুখী, তুমি হিতৈষিণী দেবীর ন্যায় কৃপা পরবশ হইয়া আমার এই সকল মহদুপকার

করিয়াছ। আমি তোমার চরণে চিরকৃতজ্ঞ। আমি বার বার তোমাকে প্রণাম করিতেছি।”

তখন বিধুমুখী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামলালের চরণে নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন,—“তুমিই যথার্থ সাধু। আমার যে সকল পাপ স্মরণ করিলে আত্মহত্যা করিতে হয়, তুমি সেই সকল পাপই তোমার কল্যাণের হেতুভূত বলিয়া আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ। ধন্য তুমি। এ পাপীয়সী কদাচ তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য নহে। কিন্তু দয়াময়, তুমি যখন এত দয়া শিখিয়াছ, যখন এত উদারতায় তোমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, যখন এত মহত্ত্বে তোমার অন্তর আচ্ছন্ন হইয়াছে, তখন কেন তুমি আমাকে চরণাশ্রয় দিবে না? এমন দয়াল প্রভু তুমি—তোমার চরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসী কোথাও যাইবে না।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমাদের ছাড়াছাড়ি অনেক দিন হইয়াছে। তুমিও আমাকে ছাড়িয়াছ, আমিও তোমাকে ছাড়িয়াছি। উভয়ের নিকট হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এ দূরত্ব ঘুচাইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। মিলনের আর কোন প্রয়োজন নাই। আমি আপন অবস্থায় বেশ সুখী আছি। তুমি যদি সুখী হইতে না পারিয়া থাক তাহা হইলে চেষ্টা কর, যত্ন কর, অবশ্য সুখী হইবে।”

বিধুমুখী বলিলেন,—"অনেক চেষ্টা করিয়াছি। তোমার চরণাশ্রয় ব্যতীত আমার আর সুখ নাই। আমাকে তোমার চরণ ধরিয়া থাকিতেই হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি যে ভাবে চিত্তকে দাঁড় করাইয়াছি, তাহাতে কাহারও সঙ্গ আমার আবশ্যক নহে। তুমি আমাকে দর্শন করিয়া যদি তৃপ্ত হও, তাহাতে আমার কোন নিষেধ নাই। কিন্তু আমার নিকট অবস্থান অসম্ভব। আমি অক্ষম। তোমাকে লইয়া বিব্রত হইবার আমার সাধ্য নাই। তোমার ন্যায় রূপসী সংসারে অনেকের হৃদয়ে লোভ উদ্দীপন করিবে। তাহাতে তোমার এবং আমার অনেক বিপদ হইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ছার রূপ—এ পোড়া রূপ আমি এখনই দ্রাবক দিয়া ধ্বংস করিতাম। যাহা একদিনও স্বামীর ভোগে লাগিল না, তাহা এখনই আগুনে পুড়াইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহা করিব না; তাহা করিতে আমার অধিকার নাই। এ দেহ তোমার বস্তু, এ রূপ তোমার সামগ্রী। তুমি জীবিত থাকিতে তোমার বস্তু ধ্বংস করিতে আমার অধিকার নাই। আমি তোমাকে দর্শন করিয়াই চরিতার্থ হইব। আমার জন্য খাদ্যাদি আয়োজন করিতে হইবে না। আমি এই গৃহের এক পার্শ্বে যথাকালে যাহা হয় পাক করিব। তুমি যখন এখানে থাকিবে, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দর্শন

করিব, তোমার সহিত একটী কথাও কহিব না। তুমি কৃপা করিয়া এই অনুমতি দিলেই আমি চরিতার্থ হই।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“অসম্ভব। বিধুমুখী আমি যে পথে যাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে স্ত্রীর সহিত বাস করা সম্ভবে না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি অধম, তোমার নিকট অশেষ উপকারে বাধ্য। তোমার জন্য অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করাও আবশ্যক। কিন্তু বিধু-মুখী, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার সহিত একত্রাবস্থান আমার পক্ষে অসম্ভব।”

তখন বিধুমুখী বলিলেন,—“তুমি জ্ঞানী হইয়া নিষ্ঠুর হইয়াছ, তুমি ধার্ম্মিক হইয়া পাপী হইয়াছ, তুমি মহৎ ইহা নীচ হইয়াছ। তুমি ত্যাগ করিলেও আমি কখন তোমাকে ত্যাগ করিব না। তোমার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া যতদিন মরিতে না পারিব, ততদিন তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ।”

তখন শ্যামলাল বেগে কক্ষের বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন,—“বিধুমুখী, যেখানে ছিলে সেখানেই যাও। বৃথা আশা ত্যাগ কর। তোমায় আমায় সাক্ষাতের এই শেষ।”

বিধুমুখী উঠিয়া বলিলেন,—“কখন না। তোমায় আমায় নিত্য সাক্ষাৎ হইবে। তোমার চরণাশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমি কোথায়ও যাইব না।”

শ্যামলাল বেগে প্রস্থান করিলেন। শ্যামলাল যে পথ গ্রহণ করিলেন, বিধুমুখী ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন।

আমাদের সেই সুরুচি মার্জ্জিত, সাম্যবাদী বন্ধুর কথা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। আজি বহুদিন পরে ভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিধুমুখীর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি বলেন,—"এই মহীয়সী মহিলার কি শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে। অবাধ প্রেমের পবিত্র নীতির অনুসরণ করিয়া আবার পাপপঙ্কিল বন্ধনের পথে আসিতে প্রয়াস করে, এরূপ রমণী বোধ হয় জগতে এই প্রথম। এরূপ কুদৃষ্টান্ত স্থাপনের পূর্ব্বে বিধুমুখীর মৃত্যু হইলে বোধ হয় সংসারের বিশেষ কল্যাণ হইত।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উৎক্রান্তি।

পরদিন অতি প্রত্যূষে শ্যামলাল আসিয়া নীলরতন বাবুর সহিত মিলিত হইলেন এবং যখন ঘনানন্দ স্বামী আজি স্বয়ং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন তখন না জানি কি কথা বলিবেন ভাবিয়া উভয়ে দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পথে নীলরতন বাবু বলিলেন,—"আপনি ধন্য। আপনি মহাপুরুষের কৃপাভাজন। আমরা আপনার সঙ্গ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"এমন কথা বলিবেন না। মহাপুরুষের কৃপালাভ কিছুই বিচিত্র ব্যাপার নহে। পূতি-পদার্থ ও চন্দনে যাঁহার সমজ্ঞান, সাধুত্তম উমাশঙ্কর ও ঘৃণিত পাপী শ্যামলালকে আলিঙ্গন দান তাঁহার পক্ষে সমানই বিষয়।"

নীতরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"আপনি এক্ষণে যে নূতন স্থানে বাস করিতেছেন, সেখানে কোন অসুবিধা ঘটিতেছে না তো?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"অসুবিধা ও সুবিধা সর্ব্বত্র সমান। যখন গাছতলায় থাকিতাম, তখনও বিশেষ কোন অসুবিধা দেখি নাই, এখানেও বিশেষ কোন সুবিধা দেখিতেছি না। কিন্তু যাহাই হউক, কল্য হইতে আমাকে এ আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইয়াছে।"

"কেন?"

"বিধুমুখীর নাম আপনি শুনিয়াছেন বোধ হয়?"

"হাঁ, তিনি তো আপনার স্ত্রী।"

"তাঁহার সহিত আমার ঐরূপ সম্বন্ধই ছিল। তিনি গতকল্য আমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমার আশ্রিতা হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন।"

"তাহার পর?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"সুতরাং আমি পলাতক।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাঁহার ব্যবস্থা কি করিলেন?"

শ্যামলাল বলিলেন—"ব্যবস্থা করিবার আমি কে? তাহার কার্য্য তিনিই করিবেন।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"তিনি কোথায় আছেন এখন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"জানি না। আমার বোধ হয় সে ঘরে তিনি আর এখন নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন, থাকিবার

স্থান ইত্যাদি বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া আপনার উচিত।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“কেন উচিত? আমি সংসারের কোন্ ব্যবস্থা করিতেছি যে, এই ব্যবস্থা না করিলে আমার ত্রুটি হইবে? যিনি বিশ্বের ব্যবস্থা করেন, তিনিই বিধুমুখীর ব্যবস্থা করিবেন। আর আপনি দেখুন, বিধুমুখী রাজার আশ্রিতা। রাজা ধর্ম্মময় দেবতা। তাঁহার আশ্রিতা লোকের জন্য কাহারও চিন্তা করা অনাবশ্যক।”

ঘনানন্দের আশ্রম সন্নিধানে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। কথা বন্ধ হইল। শ্যামলাল দূর হইতে ভূপৃষ্ঠে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। নীলরতনও প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ তখন এক বেদীর উপর একাকী বসিয়া আছেন। নিম্নে শিষ্যদ্বয় বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

আগন্তুকদ্বয়কে নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত ঘনানন্দ আহ্বান করিলেন। উভয়ে নিকটস্থ হইয়া ভূপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। ঘনানন্দ জিজ্ঞাসিলেন,—“শ্যামলাল, তুমি সে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছ? যাহা ইচ্ছা কর, তোমার পত্নী যাবজ্জীবন তোমার অনুসরণ করিবেন। তিনি বুঝিয়াছেন, স্বামীর কৃপা ও চরণসেবা ব্যতীত নারীর আর গতি নাই। তাঁহার মস্তিষ্ক নানাপ্রকার চিন্তায়

ক্লেশে ও মনস্তাপে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা। এ জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। বৈবাহিক মহাশয়, আপনার জামতা শুনিতেছি সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিলেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"সে জন্যও আমার আর চিন্তা নাই। আপনি যখন অবস্থার পরিবর্ত্তন চিন্তাজনক নহে বলিয়াছেন, তখন সেজন্য চিন্তিত হইবার আর প্রয়োজন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আমি একটা বিশেষ কথা বলিব বলিয়া আপনাদিগকে আসিতে বলিয়াছি। সেই কথাই এক্ষণে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে। আমার শিষ্যদ্বয় এস্থানে আছেন, আপনারাও আছেন। এই সময় কথাটা বলাই ভাল। আমার এই দেহ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

নীলরতন বলিলেন,—"সে কি! আমরা তো তাহার কিছুই লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা তো আপনার আকার প্রকার সমানই দেখিতেছি। আপনার ঐ পুণ্য-প্রদীপ্ত শরীরে কোন ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না। কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না বটে; কিন্তু এই দেহ আমার অবলম্বিত ও অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহের অনুপযোগী হইয়া আসিতেছে।"

নীলরতন বলিলেন,—"মহাত্মন্, কথাটা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আমি ভাল করিয়া আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, আমি নিত্য যে প্রাণায়াম করি, তাহা আমার পক্ষে পূর্ব্বে অনায়াস সাধ্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। আমি কথন কথন সমাধিস্থ হইয়া থাকি। পূর্ব্বে ব্যুত্থানের পর আমার কোনই কষ্ট হইত না। কিন্তু এক্ষণে আমার দেহ কিছু অবসন্ন হয়। আমি সময়ে সময়ে কদাচিৎ চিত্তকে যোগবলে বলীয়ান্ করিয়া কোন বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি। সেই কার্য্য সমাপ্তির পর পূর্ব্বে আমার কোনই ক্লেশবোধ হইত না; কিন্তু এক্ষণে তাহার পর আমার দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্যে আমি বুঝিতেছি যে, আমার শরীর কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে।"

নীলরতন বলিলেন,—"ইহা বাস্তবিকই চিন্তার কথা বটে। প্রতিকারের কোন চেষ্টা করা উচিত নহে কি? এ অবস্থায় কি করিলে ইহার শান্তি হইতে পারে, আমাদিগকে আজ্ঞা করিলে আমরা তাহার ব্যবস্থা করি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দেহে বিশেষ কোন ব্যাধি থাকিলে অবশ্যই ঔষধ সেবন বা অন্য কোন উপায়

দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু দেহে কোন ব্যাধি নাই। দৈহিক কার্য্যকলাপ যে সকল উপায়ে নির্ব্বাহিত হয়, তৎসমস্ত যন্ত্রমাত্র। দীর্ঘকাল ব্যবহারে কল-বলের অবশ্যই ক্ষয় হয় এবং তাহাদের শক্তির হ্রাস হয়। আমার বয়স অনেক, এতদিন অব্যাঘাতে একটা দেহ-যন্ত্রের কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এখন ইহা আর চলিতে চাহিতেছে না।”

নীলরতন বলিলেন,—“এ অবস্থায় উপায় কি ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“আমি এ দেহ ত্যাগ করিব।”

সকলেই চমকিত হইলেন। নীলরতন বলিলেন,—“এ কি কঠোর কথা আপনি বলিতেছেন ?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“কথা আপনারা যেরূপ কঠোর বলিয়া মনে করিতেছেন, বাস্তবিক সেরূপ কঠোর নহে। মৃত্যুর কথা বলিতে হইলেই মনুষ্যেরা বড় ভয় পায়, যেন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ভাবিয়া তাহাদের হৃৎকম্প হয়। কিন্তু বস্তুতঃ মৃত্যু কোন ভয়ানক ব্যাপার নহে। একটা বাটী হইতে বহির্গত হইতে হইলে যে স্থান দিয়া যাইতে হয়, তাহার নাম দ্বার। মৃত্যুও সেইরূপ একটা দ্বার মাত্র। মৃত্যু এ সংসারে নাই। রূপান্তর প্রাপ্তি বা স্থানান্তর গমন আছে বটে, কিন্তু নাশ তো নাই। শাস্ত্রকারেরা মৃত্যু শব্দেরই উল্লেখ করেন না ; আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাঁহারা তাহাকে উৎক্রান্তি বলেন। এই উৎক্রান্তির পর

সকলকর্ম্মী মনুষ্য স্বর্গাদি ফলভোগের অন্তে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। জলৌকা যেমন একটা তৃণ লক্ষ্য করিয়া আর একটা তৃণ ত্যাগ করে, জীবও সেইরূপ আর একটা দেহ লক্ষ্য করিয়া দেহ ত্যাগ করে। যাঁহারা সকাম সাধক, তাঁহাদের এই যাতায়াতের বিরাম নাই। সুতরাং মৃত্যু কোথায়? নানা দেশের মনুষ্য তীর্থ দর্শনার্থ কাশী আইসে, গয়া যায়, প্রয়াগ যায়, বৃন্দাবন যায়, আবার বাটির মানুষ বাটীতে ফিরিয়া যায়। মৃত্যুও তাহাই। মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্য বিবিধ স্থান পর্য্যটন করিয়া পুনরায় যেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরিয়া আইসে। ইহাতে চিন্তার কারণ কি আছে?"

শ্যামলাল সবিনয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"সকলকেই কি এইরূপ যাতায়াত করিতে হয়?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না বৎস, যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম-জনিত চিত্তশুদ্ধি প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সে ভাগ্যবানগণকে আর ফিরিতে হয় না। তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

নীলরতন বলিলেন,—"প্রভো! এইরূপ মৃত্যুর অকর্ম্মণ্যতা সম্বন্ধীয় বিবিধ কথা বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সে সম্বন্ধে হৃদয়ের দৃঢ়তা হয় না তো। আমরা মায়ামোহাচ্ছন্ন ঘোর অসক্ত ব্যক্তি। আমরা মৃত্যুর নাম শুনিলেই তো শিহরিয়া উঠি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সত্য কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধির পরও ভয় থাকা উচিত নহে। যদি কেহ বলে ঐ মাঠে বাঘ আছে, তাহা হইলে অবশ্যই সে দিকে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু যখন অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, বাস্তবিক সে মাঠে বাঘ নাই, যে বাঘের কথা প্রচার করিয়াছে সে মিথ্যাবাদী, তাহা হইলেও সে দিকে যাইতে লোকে আর ভয় পায় কি? আপনারা বিজ্ঞ, আপনাদের এ সম্বন্ধে ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।"

নীলরতন বলিলেন.—"আপনার বাক্য অভ্রান্ত সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু অভ্যাস দোষেই হউক, বা কুশিক্ষা হেতুই হউক, মরণের নামে আমরা বড়ই ভীত হই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"মনুষ্য যে মরণের নামে ভয় পায়, তাহার কোন ভুল নাই। কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধানের পর, প্রকৃত জ্ঞানলাভের পর সে ভয় থাকিতে দেওয়া অন্যায়। সাধারণতঃ ভোগাসক্ত মনুষ্যেরা স্রকৃচন্দন, কামিনীকাঞ্চন প্রভৃতি যে সমস্ত ভোগ্য পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিবার কল্পনাও তাহাদের পক্ষে ভয়াবহ। সুতরাং মরণের প্রসঙ্গে তাহারা ভয়ে অবসন্ন হয়। কিন্তু যদি তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের ভোগ্য কোন বস্তুই তাহাদিগকে ছাড়িবে না, মৃত্যুর পর

লোকান্তরে এবং জন্মান্তরে এইরূপ পদার্থরাশি তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। এই জ্ঞানের অভাব হেতু মনুষ্য মৃত্যুর নামে এতই বিচলিত হইয়া থাকে। তাহারা যে সকল পদার্থ পরম স্পৃহণীয় বলিয়া জ্ঞান করে, তৎসমস্তও যে নিতান্ত অসার ও হেয়, ইহাও তাহারা জানে না। ইত্যাকার নানারূপ অজ্ঞতাই মনুষ্যের মৃত্যু বিষয়ে ভীতির কারণ। আপনাদের ন্যায় বিজ্ঞ জনের সেরূপ ভীত হওয়া অসঙ্গত।”

নীলরতন বলিলেন,—“শিক্ষা এখন থাকুক। এক্ষণে আপনি কি অভিপ্রায় করিতেছেন, তাহা আর একবার বলুন। আমরা আপনার দয়া-বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় পরম সুখে বাস করিতেছি। আমরা স্বার্থপর ক্ষুদ্র মানব। এই অমূল্য দয়াধনে বঞ্চিত হইতে হইলে আমাদের বড়ই ক্ষতি হইবে, কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্যেও আপনার প্রস্তাব আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“এ দেহ হইতে আমার আত্মা উৎক্রান্ত হইবে, ইহাই আমি সংকল্প করিয়াছি।”

নীলরতন বলিলেন,—“আমাদের যত ক্ষতিই হউক, আর আমরা যাহাই বলি, আপনি যাহা সংকল্প করিয়াছেন তাহার অন্যথা করিতে পারে এমন সাধ্য কাহার আছে?

কিন্তু আজি আমাদের নিতান্ত কুপ্রভাত। প্রভুর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে না হইলেই ভাল হইত।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"বৈবাহিক মহাশয়, আপনার কি এ ঘটনা কখনই ঘটিবে না? আমি যে পথে যাইবার প্রস্তাব করিতেছি, আপনাকেও তো আজি হউক বা দশ দিন পরে হউক সেই পথেই যাইতে হইবে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কত দিনে দয়াময়ের দেহ ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাহা এখন স্থির করি নাই। তবে এক মাস অতীত হইবে এরূপ বোধ হয় না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"দয়াময়, আমি এজন্য বিশেষ চিন্তাকুল হইতেছি না। আপনার করুণায়, আপনার উপদেশে প্রাণে বড়ই শীতলতা অনুভব করিতেছিলাম। তাহাতে বঞ্চিত হইব, কিন্তু তাহাই যদি বিধাতার বাঞ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাই হউক।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তুমি যাঁহার অনুগৃহীত সেই উমাশঙ্করের কৃপায় তুমি বঞ্চিত হইবে না; সুতরাং তোমার চিন্তার কারণ কিছুই নাই।"

নীলরতন বলিলেন,—"দেহ ত্যাগ কিরূপে ঘটিবে? সম্প্রতি দেহে তো কোনই পীড়া নাই। যে সামান্য দুর্বলতা উপস্থিত হইয়াছে বলিতেছেন, তাহাতে দেহের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"না দেহে কোন পীড়া নাই। বিনা কারণে বা বিনা পীড়ায় প্রাণত্যাগ করা না যায় এমন নহে। কিন্তু তাহা আমি করিব না, একটা পীড়া ঘটাইতে হইবে।"

নীলরতন বলিলেন,—"যদি সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে পীড়ার প্রয়োজন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা লোক-শিক্ষার্থ এবং মরণের যে পদ্ধতি মনুষ্য সমাজে চলিয়া অসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম করা অবৈধ বোধে একটা বিষম যন্ত্রণা দায়ক কঠিন পীড়ার উদ্ভব করিতে হইবে।"

তাহার পর নতবদন শিষ্যদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের কোন চিন্তা নাই। আমি উৎক্রান্তির পূর্ব্বে তোমাদিগকে অতি মহৎ ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব।"

নীলরতন বলিলেন,—"যাহা আপনার মনে আছে, তাহাই ঘটিবে। কিন্তু ভগবন্, যন্ত্রণাদায়ক কঠিন পীড়ার সংঘটন না করিলেই ভাল হয়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে জন্য চিন্তা করিবেন না। পীড়া আমার কোন যন্ত্রণাই ঘটাইবে না। আপনারা এক্ষণে প্রস্থান করুন। যতদিন আমার পীড়ার উদ্ভব না হয়, তত দিন এ সংবাদ প্রচার করিবেন না। শীঘ্রই আমার পীড়া উপস্থিত হইবে। আর এক সপ্তাহ পরে

পীড়া দেখা দিবে। যে দিন যে সময়ে আমি দেহ ত্যাগ করিব তাহা আপনাদিগকে পরে জানাইব। সোণাপুরে এ সংবাদ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। সমুচিত সময়ে তাহার ব্যবস্থা হইবে।" শ্যামলাল তুমি আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছ, তোমাকে দুই এক দিন একটু বিব্রত থাকিতে হইবে। তাহার পর তুমি আমার নিকট আসিবার সময় পাইবে। আমার উৎক্রান্তির সময় তোমার গুরুদেব এ স্থানে উপস্থিত থাকিবেন। তোমার সকলই শুভ হইবে।"

সহসা অদূরে এক বিষম কাতর চীৎকারধ্বনি উপস্থিত হইল। ঘনানন্দ ব্যতীত সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাও, সকলেই যাও। কে চীৎকার করিতেছে, কেন চীৎকার করিতেছে, দেখিয়া আইস।"

নীলরতন, শ্যামলাল ও শিষ্যদ্বয় শব্দাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক ধূলিধূসরিতা মলিনবেশা, কর্দ্দম প্রলিপ্তা উন্মাদিনী। শ্যামলাল চিনিতে পারিলেন, সেই পাগলিনী বিধুমুখী।

অন্নপূর্ণা।

নবম খণ্ড—পরীক্ষা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বস্বান্ত।

প্রায় কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া রাজা অন্নদান ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইয়াছে; সকল জেলায় অন্ন সত্রের কার্য্য শেষ হইয়াছে। আশুধান্য কাটা হইবার সময়েই সত্র সকলে ভোজনার্থী লোকের সংখ্যা কমিয়া আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাসে সমাগত দরিদ্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইয়া পড়ে এবং পৌষ মাসের প্রারম্ভে সত্রসমূহের কার্য্য শেষ হইয়া যায়।

দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইল, চারিদিকে রাজা উমাশঙ্করের স্তুতিগীতি কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। সমস্ত দেশের ধনীগণ রাজার এই অসম্ভব দানকাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনেকেই তাঁহাকে অদ্বিতীয় দানবীর বলিয়া অবধারণ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অজস্র সুখ্যাতি ও ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রাজার এই কার্য্য অন্যরূপ চক্ষুতেও দেখিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাত্মা এই কার্য্যে রাজার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা বলিলেন, রাজার এরূপ অসঙ্গত

দানে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া মনে করিতে পারা যায়। কেহ কেহ এমনও বলিলেন, রাজা উপাধি ও যশের লোভে এই কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার পর উপাধি ও যশভোগে কি আনন্দ হইবে? কেহ কেহ বিদ্রূপও করিতে লাগিলেন। অনেক ধনী এমন কথাও বলিতে লাগিলেন যে তাঁহারা সকলেই এ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। রাজা সকলের নিকট এ প্রস্তাব যথাসময়ে উত্থাপন করিলে আজি তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। অন্য লোকে ইহার উত্তর দিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, রাজা উমাশঙ্কর কাহাকেও দান করিতে ও দুর্ভিক্ষ দমনে যত্নবান্ হইতে নিষেধ করেন নাই। প্রস্তাব করিবার প্রয়োজন কিছুই ছিল না। রাজা এমন কথা কখন বলেন নাই যে, তিনি ভিন্ন আর কেহ দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ সাহায্য করিতে পাইবে না। যাঁহারা এ দেশে দাতা বলিয়া এত দিন প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং যাহারা কোন কার্য্যে সামান্য মাত্র অর্থব্যয় করিয়া সে সংবাদ বিবিধ উপায়ে ঘোষিত করিতেন এবং গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেন, তাঁহারা রাজার এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট, সংক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। রাজার বুদ্ধি বিবেচনার নিন্দা এবং তাঁহার অভিসন্ধির সঙ্কীর্ণতাজনিত কুৎসা সেই সকল স্থান হইতেই সঞ্জাত ও প্রচারিত হইতে লাগিল।

রাজা উমাশঙ্কর, নিন্দা ও সুখ্যাতি উভয়ই হাসির সহিত শুনিতে লাগিলেন। তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর রাজাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং তাহাতে তাঁহাকে নববর্ষ উপলক্ষে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে সে পত্রের উত্তর লিখিলেন,—আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, এরূপ দরিদ্র ব্যক্তির কোন উপাধি শোভা পায় না। আমি আপনার হিতৈষিতায় অনুগৃহীত হইলাম। আপনি কৃপা করিয়া উপাধির দায় হইতে আমার অব্যাহতি লাভের ব্যবস্থা করিবেন। "সম সময়েই স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এক সুদীর্ঘ লিপি লিখিয়া রাজার নিকট ধন্যবাদ ও সুখ্যাতি বিজ্ঞাপিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলেন, যে এই নববর্ষ উপলক্ষে তিনি ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার নাইট উপাধিতে ভূষিত হইবেন। রাজা নিরতিশয় বিনীত ভাবে তাঁহার সমীপে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উপাধির দায় হইতে অব্যাহতি লাভের প্রার্থনা করিলেন।

রাজার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। ভূসম্পত্তি সমূহ প্রথমেই বিক্রীত হইয়াছে, তাহার পর গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, গাভী এ সকলও গিয়াছে। তাঁহার মূল্যবান্ তৈজসাদি সমস্তই গিয়াছে। শেষে তাঁহার সাধের পুস্তকালয় ও

সমস্ত সরঞ্জাম সমেত বাসভবনও বিক্রীত হইয়াছে। সমস্ত সম্পত্তিই চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী ক্রয় করিয়াছেন। মহারাণী কৃপা করিয়া অনুমতি দিয়াছেন, যত দিন রাজার অন্যত্র গমনের সুবিধা না হইবে, ততদিন তিনি নিজ বাটী জ্ঞান করিয়া এই বাটীতেই বাস করিতে পারিবেন। ভবন বিক্রীত হওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ কাল রাজা এই বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন।

রাজা সকল লোককেই বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন। গলদশ্রু-লোচনে রাজা উমাশঙ্কর ও রাণী অন্নপূর্ণা দাসদাসী, সহিস কোচমান, মাহুত, পাচক পাচিকা, সিপাহী, বরকন্দাজ, দ্বারবান্, রক্ষী, জমিদারী সংক্রান্ত নায়েব, গোমস্তা, আমিন, মুহুরি প্রভৃতি সকল লোককেই জবাব দিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রায় সকল লোকই রাজার কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। রাজা ও রাণী তাহাদিগকে নানা প্রকারে শান্ত করিয়া বিদায় করিয়াছেন। সে দিনকার সে দৃশ্য নিতান্ত হৃদয় বিদারক। যাহাই হউক, বিদায়প্রাপ্ত লোকদিগের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই, প্রায় সকলে সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী করুণাময়ীর তরফে কর্ম্ম পাইয়াছে।

নূতন বিষয়সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া কাজ চালাইবার জন্য মহারাণীর দেওয়ান জীবন বাবুকে এখন অনেক সময় সোণাপুর থাকিতে হইতেছে। তিনি রাজবাটীতে

থাকেন না; কাছারি বাটীতেই তাঁহার স্থান হইয়াছে। জমিদারীর কাজ চালাইবার জন্য তিনি নূতন লোক না আনিয়া পুরাতন লোকদিগকেই পূর্ব্ববৎ বাহাল রাখিলেন। ইহাতে কাজকর্ম্ম পরিচালনার বড়ই সুবিধা হইল। আর ভবন ও দ্রব্য সামগ্রী রক্ষার্থ রক্ষী, দ্বারবান্, সিপাহী সকলেরই প্রয়োজন। পুরাতন বিশ্বাসী লোক ছাড়িয়া দিয়া নূতন লোক আনায়ন করা অনাবশ্যক বিবেচনায় জীবন বাবু তাহাদেরই রাখিয়া দিলেন। হাতী ঘোড়া প্রভৃতির জন্যও লোকের দরকার; সুতরাং পুরাতন সহিস, মাহুত প্রভৃতি সেই সেই কাজে বাহাল থাকিল। জীবন-বাবুর বিশ্বাস, মহারাণী মাতা সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে ও স্বচক্ষে সমস্ত কার্য্য দেখিতে বহু লোক সঙ্গে লইয়া নিশ্চয়ই এ স্থানে আসিবেন এবং সম্ভবতঃ কিছুদিন করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে বাস করিবেন, সুতরাং পাচক পাচিকা, দাস দাসী প্রভৃতির তখন নিশ্চয়ই প্রয়োজন হইবে। তখন লোকের জন্য বিব্রত হওয়ার অপেক্ষা কিছু দিন বসাইয়া বেতন দেওয়া মন্দ নহে। সুতরাং তাহারা সকলেই কর্ম্ম পাইল।

জীবন বাবু সবিনয়ে রাজা উমাশঙ্করকে জানাইলেন যে, যতদিন রাজার স্থানান্তর গমন না ঘটে, ততদিন তিনি পূর্ব্ববৎ হাতী, ঘোড়া, গাড়ী প্রভৃতি আপনার

কাজে লাগাইতে পারেন, রাজবাটীর সমস্ত সামগ্রী স্বচ্ছন্দে আবশ্যক মত ব্যবহার করিতে পারেন, দাস দাসী, সিপাহী প্রভৃতি লোকদিগের দ্বারা আবশ্যক মত কাজ করাইয়া লইতে পারেন। মহারাণী মাতার যে আদেশ লিপি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—রাজা উমাশঙ্কর যতদিন স্থানান্তরে গমন না করেন, ততদিন যেন তাঁহার কোন প্রকার স্বচ্ছন্দতার অভাব না হয় এবং তিনি যেন কোন বিষয়েই কোন অসুবিধা ভোগ না করেন। রাজা উমাশঙ্কর এই প্রস্তাব শ্রবণে মহারাণী মাতার চরণে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া তাঁহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, এ স্থানে সম্ভবতঃ আর পাঁচ সাত দিনের অধিক তিনি থাকিবেন না। এই অল্প কালের মধ্যে কাহারও বিশেষ সাহায্য তাঁহার প্রয়োজন হইবে না; যদি হয় তাহা হইলে তিনি অবশ্যই সে সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

রাজার সকল সম্পত্তিই গিয়াছে। কেবল এখনও আছে রাণী অন্নপূর্ণা ও খোকা রাজার অলঙ্কার সমূহ। সে অলঙ্কার সমূহ বিক্রয় করিলে ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা হইতে পারে। সেই অলঙ্কার এক এক খানি বিক্রয় করিয়া এখন রাজার দৈনিক খরচ নির্ব্বাহিত হইতেছে।

আর যায় নাই রাজার দেবোত্তর সম্পত্তি সমূহ, তাহার আয় প্রায় কুড়ি হাজার টাকা। কিন্তু সে টাকার খরচ নির্দ্দিষ্ট আছে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। তত্ত্বাবতের ভোগ পূজা, বাদ্য, পর্ব্ব, অতিথি সেবা, পূজক, পরিচারক ইত্যাদির বেতনাদিতে সে কুড়ি হাজার টাকা খরচ হইয়া থাকে।

আর যায় নাই কালেজ, বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, চিকিৎসালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ পরিচালনার্থ সম্পত্তি। তাহার আয় একুনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সে সকল সদনুষ্ঠান সুন্দররূপে পরিচালিত করিবার নিমিত্ত আয়ের টাকা সমস্তই খরচ হইয়া থাকে।

আর যায় নাই চণ্ডীচরণ। তিনি কালীবাটীর প্রসাদ ভোজন করেন, আর রাজবাটীতে আসিয়া পড়িয়া থাকেন। জীবন বাবু তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ আমলাদিগের ঘরের উপরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি উত্তর দিয়াছেন, মার প্রসাদ খাইব, রাজার অবস্থা মন্দ হইয়াছে, দুধ ছাড়িয়া দিব, আফিং ছাড়িয়া দিব, রাজাকে প্রাণ থাকিতে ছাড়িব না।

আর যায় নাই জরিফ বলিয়া কোচম্যান। জীবন বাবু তাহাকে আগেকার মত কাজ করিতে অনুরোধ করিলে সে বলিয়াছে, ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি রাজার কাছ

ছাড়া হইয়া আর কোথায় থাকিতে পারিব না, আর কাহারও চাকরী করিতে পারিব না।

আর যান নাই রায় হরকুমার বাহাদুর। জীবন বাবু তাঁহাকে বলিয়াছেন, আপনি এই বিপুল সম্পত্তির যেমন দেওয়ানী করিতেছিলেন, তাহাই করুন, আমার দিকে অনেক কাজ। আপনি কৃপা করিয়া এ ভার গ্রহণ করিলে মহারাণী মাতা বড়ই নিশ্চিন্ত হইবেন। হরকুমার বাহাদুর বলিয়াছেন,—"আমি অনেক দিন হইতেই দেওয়ানি ত্যাগ করিয়াছি। বেতন লইয়া কোন কাজ করিবার আমার আর প্রয়োজন নাই। কেবল রাজার প্রেমে বাধ্য হইয়া আমি এখানে আছি। রাজার সঙ্গ ছাড়িয়া আমি বসুন্ধরার সম্রাট পদও গ্রহণ করিতে পারিব না।"

এই সকল অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর রাজা এক দিন রায় বাহাদুরের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আপনি বহু দিন পূর্ব্বেই কাশী যাইবেন বলিয়া ছিলেন, এখন কেন যান না ?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কেন বাবা, তুমি অন্ন দিয়া একটা দেশ রক্ষা করিতে পারিলে, আমাকে দুই বেলা দুই মুঠা ভাত দিতে কি তোমার বড় কষ্ট হইবে ?"

রাজা বলিলেন,—"এখন হয় ত আপনার বড়ই কষ্ট হইবে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কেন বাবা, তোমার যদি কষ্ট সহে, মা অন্নপূর্ণার যদি কষ্ট সহে, আমার রাজা নাতির যদি কষ্ট সহে, তাহা হইলে এ বুড়ার কষ্ট সহিবে না কি ?"

রাজা বলিলেন,—"আমরা অতঃপর কি করিব, কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই। আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, আমাদের সহিত কষ্ট না পাইয়া আপনার কাশী যাওয়াই উচিত। আপনার এ সময় সেবা শুশ্রূষার আবশ্যক।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"সেই জন্যই তো বাবা, আমার এসময় তোমাদের কাছ ছাড়া হওয়া উচিত নহে। তোমরা না করিলে আমার সেবা শুশ্রূষা করিবে কে ?"

রাজা বলিলেন,—"তাহার আর সন্দেহ কি ? আমি সেই জন্যই বলিতেছি, আপনি চণ্ডী খুড়াকে সঙ্গে লইয়া কাশী চলিয়া যান, আমরা শীঘ্রই সেখানে আপনার সহিত মিলিত হইব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"তা অল্প কালের জন্য আগে গিয়া কি করিব ? এক সঙ্গেই যাওয়া হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"আমাদের হয়তো এ দিক ওদিক ঘুরিয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইতেও পারে। আপনি আগে কাশীতে যাইলে সুবিধা হইত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কেন বাবা, বার বার এক কথা বলিতেছ? আমি সম্পদেও তোমার, বিপদেও তোমার, তোমাকে এ সময়ে কোন মতেই আমি ছাড়িয়া যাইব না।"

বিরক্তির আশঙ্কায় রাজা আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। তিনি ধীরে ধীরে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রণা।

যে দিন হরকুমার বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পর দিন অপরাহ্নে রাজা উমাশঙ্কর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজার কার্য্যজনিত অনবকাশ এখন আর নাই; তিনি বিষয় কর্ম্মের অবিশ্রান্ত উদ্বেগ ও পরিশ্রম হইতে এখন অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। তাহার হৃদয়ে এখন অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছে। এই জন্যই এ অসময়ে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার সময় পাইয়াছেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই ভবসুন্দরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভব জিজ্ঞাসিল,—"বিধুমুখী না কি কাশী গিয়াছেন এবং সেখানে শ্যামলাল বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"এ সংবাদ তোমায় কে দিল?"

ভব বলিল,—"রাণীদিদির পিতা এইরূপ সংবাদ লিখিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"এইরূপ সংবাদ আমরাও পাই

য়াছি। কিন্তু পরিণামে কি হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ভবদিদি, তোমাকে আমি আর একটা খবর দিতে পারি। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটী মেরামত ঠিক হইয়া গিয়াছে। তিনি গৃহ প্রবেশ করিয়াছেন। তোমার বাটীতে কেহই নাই।"

ভব বলিল,—"তাহা হইলে আমার বাটী যাওয়া উচিত। রামচন্দ্রের স্ত্রীটী হয়ত গরিবের সকল জিনিষ গোল করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু এখন যত ক্ষতিই হউক, আমার তো বাড়ী যাওয়া হয় না।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন?"

ভব বলিল,—"সে অনেক কথা; এখন আপনাকে বলিতে পারিব না। কিছুদিন পরে বলিব।"

রাজা বলিলেন,—"এখন বল বা না বল, তোমাকে তো বাড়ী যাইতেই হইবে। আমরা তো এখানে বেশী দিন থাকিব না। পরের বাড়ীতে কতদিন থাকা চলে?"

ভব বলিল,—"সেই জন্যই আমার বাড়ী যাওয়া হইবে না। রাণীদিদির সঙ্গে থাকিবে কে?"

রাজা বলিলেন,—"কেহই থাকিবার দরকার হইবে না। রাণী কখন কোথায় থাকিবেন, স্থির নাই। হয় তো বাপের বাড়ীতেও থাকিতে পারেন। একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসার পর তোমাকে সংবাদ লেখা হইবে. তখন তুমি যাইবে।"

ভব মাথা নাড়িয়া অসম্মতির উত্তর দিল। রাজা অগ্রসর হইলেন। এক অবগুণ্ঠনবতী কৃষ্ণকায়া নারী তাঁহার চরণে আসিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। রাজা বলিলেন,—"দাসী দিদি, আজি দাসমহাশয় আসিয়াছেন।"

অবগুণ্ঠনবতী মুখ খুলিলেন না। কিন্তু একটু চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?"

রাজা বলিলেন,—"বোধ হয় তোমাকে লইতে।"

দাসী বলিল,—"ছি ছি কি লজ্জা! এখানে এখন এই সময়; আর মিনসে আমাকে লইতে আসিল। একটুও আক্কেল নাই কি ?"

রাজা বলিলেন,—"তিনি আপনি আইসেন নাই; তাঁহাকে পত্র লিখিয়া আনা হইয়াছে। তোমাকে বাটী যাইতে হইবে। দাস মহাশয়ের অসুবিধা হইতেছে।"

দাসী বলিল,—"তা হউক, আমি এখন যাইতে পারিব না।"

রাজা সে স্থান হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাণী সহাস্য মুখে রাজার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্নপূর্ণা একখানি কার্পাস সাটী পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার প্রকোষ্ঠে শাঁখা ও লোহা, সীমন্তে স্থূল সিন্দুরবিন্দু। দেহের আর কুত্রাপি স্বর্ণ হীরকাদি নির্ম্মিত কোন ভূষণ নাই। এই স্বভাব সুন্দরীকে এই বেশে রাজরাজমোহিনীর ন্যায় শোভাময়ী দেখাইতেছে।

রাজা সম্মুখে আসিয়াই বলিলেন,—"রাণি, তোমার ভিক্ষুক স্বামী সম্মুখে উপস্থিত।"

রাণী বলিলেন,—"আমার রাজরাজেশ্বর স্বামী তাঁহার ক্রীতদাসীর মনের ভাব বুঝিয়াই এই অসময়ে দর্শনদানে তাহাকে চরিতার্থ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"সকল অলঙ্কারই তুমি ত্যাগ করিয়াছ দেখিতেছি!"

রাণী বামহস্তস্থিত লৌহ ভূষণে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন,—"যে ভূষণ আমার হস্তে রহিয়াছে, তাহার মূল্য ব্রহ্মাণ্ডে নাই।"

রাজা বলিলেন,—"তোমাকে এই নিরাভরণ অবস্থায় বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।"

রাণী বলিলেন,—"এখন হইতে এইরূপ সুন্দর সাজিয়া তোমাকে ভুলাইতে হইবে বলিয়া, আজি হইতে এই সজ্জায় সাজিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

রাজা বলিলেন,—"তোমার অলঙ্কার সমস্তের প্রায় সকলই এখনও আছে তো অন্নপূর্ণা।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"না থাকিলেই মঙ্গল। আমরা এখন যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহাতে কি ভাবে কোথায় আমাদের জীবনপাত করিতে হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পার নাই। যেরূপেই হউক এ অলঙ্কারের বোঝা লইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিব্রত

হইতে হইবে। সুতরাং এ হেঙ্গামার একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ভাল হয়।”

রাজা বলিলেন,—“বোধ হয় সে জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। বসিয়া খরচ করিতে হইলে শীঘ্রই উহা শেষ হইয়া যাইবে।”

রাণী জিজ্ঞাসিলেন,—“আমরা এখানে আর বসিয়া থাকি কেন? সত্য বটে মহারাণী করুণাময়ী দয়া করিয়া আমাদিগকে এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু এরূপে আমরা পরের বাড়ীতে অনর্থক থাকি কেন?”

রাজা বলিলেন,—“আর থাকিবার প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় জানিবার জন্যই আমি এখন আসিয়াছি।”

রাণী বলিলেন,—“আমার অভিপ্রায়! আমার আবার অভিপ্রায় কি? আমি তোমার ইঙ্গিত পাইবামাত্র খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া হাসিতে হাসিতে তোমার অনুসরণ করিব। বনে হউক, বৃক্ষতলে হউক, জনপদে হউক, বা জনশূন্য মরুভূমিতে হউক, তোমার পশ্চাতে যেখানে যাইব, সেইখানেই আমার পূর্ণানন্দ। ইহার আবার অভিপ্রায় কি?”

রাজা বলিলেন,—“তথাপি এ প্রস্তাব তোমার নিকট উত্থাপন করিতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেছিলাম।

তুমি স্বয়ং এ প্রসঙ্গের অবতারণা করায় আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।”

রাণী বলিলেন,—“তবে তোমার কোন কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়? এখনও এই সেবিকার তুমি পরীক্ষা করিতেছ? যাহা তোমার কর্ত্তব্য, যাহা তোমার অবলম্বন, তাহাতে আমার অন্যমত হইবে মনে করিলেও, আমার প্রতি অবিচার করা হয় না কি?”

রাজা বলিলেন,—“ঠিক বলিয়াছ অন্নপূর্ণা; বাস্তবিক তোমার ন্যায় গুণবতী সহধর্ম্মিণীর কোন বিষয়ে স্বামীর সহিত মতের অন্যথা ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায়। আমি সে কারণে একথা তোমার নিকট উত্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এই বিপুল রাজৈশ্বর্য্য, এই বিশাল অট্টালিকা, এই দাস দাসী এ সকল পরিত্যাগ করিতে অনেকের হৃদয়ই ব্যথিত হওয়া অসম্ভব নহে। তোমার হৃদয় পরীক্ষিত এবং আমার সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। তথাপি আমার আশঙ্কা হয়, হয় তো এ সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবার সময় তোমার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িলেও পড়িতে পারে।”

রাণী বলিলেন,—“কেন পড়িবে? যদি এইরূপ অবস্থান্তরে আমার অন্তর একটুও ব্যথিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আমি তোমাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই এ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতাম; তাহা

হইলে আমি প্রথমেই এ কার্য্যে নিরস্ত হইবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে অগ্রসর হইতাম; তাহা হইলে আমি কোন না কোন দিন, এ সম্বন্ধে কথোপকথন কালে আমার মনের ক্লেশের কথা তোমাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিতাম না। তোমার এই কার্য্যে আমার অসীম আনন্দ জন্মিয়াছে। তবে কেন আমি এজন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিব?"

রাজা বলিলেন,—"আমি জানি তুচ্ছ ধনসম্পত্তি বা পার্থিব ভোগ তোমার চিত্তকে আসক্ত করিতে অক্ষম। তথাপি এক্ষণে তোমার মুখে মনের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রাণী বলিলেন,—"আমার তো সৌভাগ্য উপস্থিত। সৌভাগ্য সমাগমে কে কোথায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে?"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"সৌভাগ্য কিরূপ?"

রাণী বলিলেন,—"সৌভাগ্য কিরূপ, তাহা কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে? আমার সৌভাগ্য অসীম। আমি তোমার চরণে বিক্রীতা দাসী; তোমার সেবা করিতে পাওয়াই আমার ভাগ্য, তোমার পরিচর্য্যা আমার ধর্ম্ম। আমি সে ধর্ম্মসাধনের, সে সৌভাগ্য ভোগের সুযোগ পাই কই? অসংখ্য দাসদাসী আমার কর্ত্তব্য কাড়িয়া লইয়া তোমার সেবা করে। যখন দেখি, বেহারা তোমার পাখা টানিতেছে, তখনই আমার মনে হয়, হায়! আমার কার্য্য

পরে করিতেছে কেন? যখন দেখি খানসামা তোমাকে তেল মাখাইতেছে, তখনই আমার মনে হয়, হায়! ঐ শ্রী-অঙ্গে যাহার অধিকার, সে কেন তাহার ব্রত পালনে বঞ্চিত হয়? যখন দেখি, ভৃত্য তোমার মাথায় জল ঢালিয়া তোমাকে স্নান করাইতেছে তখনই আমার মনে হয়, হায়! আমার কার্য্য-পরে করিতেছে কেন? কত বলিব? সকল দিনই কর্ত্তব্য পালনের অবসর না পাইয়া আমার হৃদয় নীরবে অবসন্ন হয় এবং আমার কার্য্য অনর্থক পর্য্যবসিত হইতেছে বলিয়া আমি আপনাকে ধিক্কার দিতে থাকি। দারিদ্র্যে আমার ভাগ্যোদয় হইল। এখন তোমার সকল কার্য্যই আমাকে করিতে হইবে। এখন তোমার রাজাগিরির খাতিরে পাঁচজনের সেবা লইতে হইবে না। ইহা কি আমার সামান্য সৌভাগ্য?"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"জানি না তোমার অদৃষ্টে কি হইবে। কিন্তু যে তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছে সে যে পরম ভাগ্যবান্ তাহার সন্দেহ নাই।"

রাণী বলিলেন,—"এমন কথা বলিও না। যাহাকে দয়া করিয়া তুমি চরণে স্থান দিয়াছ, সেই ভাগ্যবতীর অগ্রগণ্যা আমার এখন পূর্ণমাত্রায় ভাগ্যোদয় হইতেছে। ছার বিষয় সম্পত্তির জন্য আমি আমার প্রাণের দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাই নাই। বিষয় কার্য্যে তোমার সকল সময় যায়। দাসী তোমাকে কখন দেখিতে পায়

বল ? এখন বিষয়ের বন্ধন ঘুচিয়া গেল, এখন সমস্ত দিন তোমাকে দেখিতে পাইবার, দিবা রাত্রি তোমার নিকট থাকিতে পাইবার আশা করিতেছি, ইহা কি আমার সামান্য সৌভাগ্য !”

রাজা বলিলেন,—“বুঝিলাম রাণী”—অন্নপূর্ণা বাধা দিয়া বলিলেন,—“দাসী বল। এখন হইতে আমার দাসী হওয়ার সার্থক হইল।”

রাজা বলিলেন,—“তুমি রাণীও নহ, দাসীও নহ। তুমি সম্পদে ও বিপদে আমার কল্যাণময়ী হৃদয়দেবী। সে কথা যাউক। এখন কথা হইতেছে, এখান হইতে প্রস্থান করার উপায় কি ?”

“কেন ?”

“কেন, তোমার ভব, তোমার দাসী, তোমার আরও আশ্রিতা নারীরা তোমার সঙ্গ ছাড়িবে কি ?”

রাণী বলিলেন,—“তাহা ছাড়িবে না। কিন্তু তাহাদের কাহাকেও তো আমাদের দুঃখময় জীবনের সঙ্গিনী করা হইবে না। লুকাইয়া প্রস্থান করিতে হইবে।”

“পারিবে কি ?”

“বেশ পারিব। আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।”

রাজা বলিলেন,—“বেশ, কিন্তু সুহাসকে না জানাইয়া যাওয়া হইবে কি ?”

রাণী বলিলেন,—“কেন হইবে না ? এখন সকল-

কেই না জানাইয়া চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার পর একটা স্থানে স্থির হইয়া এবং কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেই হইবে।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—"খোকা কোথায় ?"

রাণী বলিলেন,—"খোকার একটু শরীর খারাপ হইয়াছে। ঠাকুরঝির নিকটে রহিয়াছে।"

রাজা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন,—"শরীর খারাপ হইয়াছে ? এ কথা এতক্ষণ বল নাই কেন ?"

রাণী বলিলেন,—"বিশেষ চিন্তার কথা কিছুই নাই। সামান্ত গা গরম হইয়াছে মাত্র।"

রাজা বলিলেন,—"চিন্তার কারণ কোন অবস্থাতেই নাই রাণী। তবে কি জান, যথা সময়ে চিকিৎসা ও আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে আমরা বাধ্য, তাহাতে বিলম্ব বা ঔদাস্ত ঘটিলে আমাদের ত্রুটী হয়। সুহাস এখানে কখন আসিয়াছেন ?"

রাণী বলিলেন,—"দুপুরের পর।"

রাজা বলিলেন,—"চল খোকাকে দেখিতে যাই।"

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুত্রনাশ।

খোকা রাজার সামান্ত অসুখ সেই রাত্রিতেই বড় বাড়িয়া উঠিল। সেই রাত্রিতেই রাজা চিকিৎসালয়ের ডাক্তার আনিলেন। তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন এবং জ্বর যেন বক্রভাব ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন। ঠিক তাহাই হইল। পরদিন প্রাতে সকলেই বুঝিল, খোকা রাজার পীড়া বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

রায় বাহাদুর বার বার অন্দরে যাতায়াত করিতে-ছেন এবং ডাক্তার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। ডাক্তার মহাশয় রাজবাটীতেই রহিয়াছেন এবং অনবরত রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সুহাস ও অন্নপূর্ণা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পীড়িত বালকের উভয় পার্শ্বে বসিয়াছে। ভব দাসী, আর বহুসংখ্যক দাস দাসী ঘোর উৎকণ্ঠার সহিত সকল আদেশ পালন করিতেছে।

বেলা এক প্রহরের সময় রায় বাহাদুর ব্যস্তভাবে জীবন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন,—

"রাজপুত্রের কঠিন পীড়া। হুগলী হইতে সাহেব ডাক্তার আনাইতে হইবে। হাঁটিয়া লোক যাইতে বিলম্ব হইবে। ঘোড় সোওয়ার যাওয়ার আবশ্যক। একটা ভাল জুড়ীও পশ্চাতে যাওয়ার আবশ্যক। সাহেব তাহাতেই আসিবেন; এজন্য আপনার অনুমতি চাহিতেছি।

জীবন বাবু বলিলেন,—"এজন্য আমার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত সামগ্রী ও দাস দাসী আপনার বলিয়া ব্যবহার করিতেই মহারাণী মাতা আপনা-দিগকে অনুমতি দিয়াছেন। এ সামান্য বিষয়ের জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসায় নিতান্ত দুঃখিত হই-লাম। আপনি শীঘ্র যান; ডাক্তার আনিতে বিলম্ব না হয়। আমার দ্বারা কোন সাহায্যের সম্ভাবনা থাকিলে, আজ্ঞা করিবেন; আমি হাজির আছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আপনাকে শত ধন্যবাদ। আমি যাই।"

জীবন বাবু সঙ্গে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসিলেন,—"টাকা কড়ির কিরূপ হইতেছে? আবশ্যক হইলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"রাজা কাহারও নিকট ধার করিবেন বোধ হয় না। রাণীর কিছু অলঙ্কার আছে। তাহাই বিক্রয় করিয়া খরচ নির্ব্বাহ করা হইবে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহাই হউক, আমার নিবেদন, অলঙ্কার বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে প্রেরণ না করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি আপাততঃ আবশ্যক মত টাকা দিব, পরে উচিত মূল্য ধার্য্য করিয়া দেনা পাওনা মিটাইলেই হইবে।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"অতি উত্তম প্রস্তাব। ইহাতে আমাদের সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই।"

রায় বাহাদুর বেগে প্রস্থান করিলেন, জীবন বাবু বার বার যাতায়াত করিয়া সন্ধান ও তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। অনেক সময়ই তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত থাকিতে লাগিলেন এবং বিবিধ শারীরিক পরিশ্রম ও হিতচেষ্টা করিয়া বিপন্ন রাজার উপকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ ব্যক্তির সহায়তা পাইয়া রাজা ও রায় বাহাদুর বিশেষ প্রীত হইলেন। অলঙ্কার রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লওয়া হইল। রাজবাটীতে উদ্বেগের সীমা রহিল না।

শঙ্করনাথের মস্তকে খোকার আরোগ্য কামনায় বিল্বপত্র প্রদত্ত হইতে লাগিল। সংকল্প করিয়া চণ্ডীপাঠ চলিতে লাগিল, শ্রীধরকে তুলসী প্রদত্ত হইতে লাগিল। কালীমাতার মন্দিরে স্তব পাঠ আরম্ভ হইল, শান্তি সস্ত্যয়ন নানাপ্রকার আরম্ভ হইল। কেবল যে রাণী রাজভগ্নীর ব্যবস্থায় এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান আরব্ধ হইল এমন

নহে। স্থানীয় লোকেরা, আত্মীয় ও অনুগত মানবেরা, নানাদেবদ্বারে নানাপ্রকার মানসিক করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র উৎকণ্ঠার সীমা নাই।

কেবল এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া ও মধ্যে মধ্যে শিশুকে দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। রাজা উমাশঙ্করের মুখে বা ব্যবহারে কোনই উৎকণ্ঠার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল না। বহুলোক, বিশেষতঃ রায় হরকুমার বাহাদুর ও চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া শিশুর যত্ন ও শুশ্রূষা করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার ব্যস্ত বা উৎকণ্ঠিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী রাজা এ সম্বন্ধে একটুও বিচলিত নহেন।

হুগলী হইতে ডাক্তার সাহেব প্রতিদিন একবার, কোন কোন দিন দুইবার যাতায়াত করিতেছেন। সেখানকার অন্যান্য বিচক্ষণ ডাক্তারগণও আহূত হইয়া যাতায়াত করিতেছেন।

বাটীতেই ডিস্পেন্সারী বসিয়া গেল। জীবন বাবু বুঝিলেন, বার বার ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে বিলম্ব হইতেছে। অতএব প্রয়োজনীয় ঔষধ সমস্ত আনিয়া বাড়ীতেই রাখা উচিত। জীবন বাবুর তত্ত্বাবধানে ঔষধ আনীত হইল এবং প্রেস্ক্রিপ্সন অনুসারে ঔষধ প্রস্তুত হইতে লাগিল। জীবন বাবু অনেক সময় স্বয়ং ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ন্যায় বহু-

বিষয়জ্ঞ ব্যক্তির কার্য্যে সকলেই তুষ্ট হইল এবং ডাক্তার সাহেবও তাঁহার প্রস্তুতীকৃত ঔষধের সুখ্যাতি করিলেন।

জীবন বাবুর নিকট হইতে অলঙ্কার রাখিয়া এক সহস্র টাকা লওয়া হইল। যত্ন ও শুশ্রূষা যতদূর সম্ভব সুপ্রণালী ক্রমে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু হইলে কি হয়? নবম দিবসে শিশুর পীড়া সাতিশয় বাড়িয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল শিশুর জীবন রক্ষার আর কোন আশা নাই। বাহিরে অনেক আত্মীয় ও অনুগত লোক উপস্থিত, জীবন বাবুও সে সঙ্গে ছিলেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ ও কাতর।

ডাক্তার সাহেব ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা অন্তঃপুর সংলগ্ন একটী কক্ষে বসিয়াছিলেন এবং বারংবার শিশুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।

ডাক্তারেরা রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত। এই সময় রাজা একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রোগীর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে সুহাসিনী ও অন্নপূর্ণাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজাকে দেখিবা মাত্র সুহাসিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "দাদা, কি হইবে?"

রাজা বলিলেন,—"ভয় কি দিদি? যাহাই কেন হউক না, তাহাই ধীর ভাবে আমাদের সহ্য করিতে হইবে। তুমি ব্যাকুল হইও না। ইহাতে চিন্তার

কোন কারণ নাই। জন্ম মৃত্যু ঈশ্বরের ব্যবস্থা। ঈশ্বরের ব্যবস্থার উপর কথা কহিবে কাহারও সাধ্য আছে কি ?"

সুহাসিনী নয়নে অঞ্চল দিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উমাশঙ্করের চরণে প্রণাম করিয়া রাণী বলিলেন,—"আমার ভগবান্ এই আশীর্ব্বাদ কর যেন, তোমার চরণ চিন্তা করিয়া আমি এই আঘাত সহ্য করিতে পারি।"

রাজা বলিলেন,—"এ জগৎ পরীক্ষাস্থল, এ কথা ভুলিও না অন্নপূর্ণা। সকল আঘাতই সহনীয়। সহ্য করাই মনুষ্যগণের পরীক্ষা। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এ সামান্য আঘাত তুমি অনায়াসেই সহ্য করিতে পারিবে। এখন যাও তোমরা, কর্ত্তব্য পালনে কোন ত্রুটি না হয়।"

সুহাস ও অন্নপূর্ণা শিশুর নিকট গমন করিলেন। রাজা বাহিরে চলিয়া আসিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারগণও বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং হরকুমার বাহাদুরকে ও জীবনকৃষ্ণ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, "শিশুর জীবনের আর কোন আশা নাই। আমরা চেষ্টার ত্রুটী করিলাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকলই বৃথা হইল। বোধ হয় আর দশ মিনিটের মধ্যেই জীবন শেষ হইবে।"

ডাক্তারেরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। এই কঠোর সংবাদ জানাইবার নিমিত্ত রায় বাহাদুর নিতান্ত কাতরভাবে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন একখানি নূতন ইংরাজি পুস্তক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। ইংলণ্ডে সম্প্রতি "সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর একখানি বহু অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র সমন্বিত নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সেই পুস্তকের একখণ্ড কলিকাতায় এক দোকান হইতে প্রেরিত হইয়া অদ্য রাজার নিকট আসিয়াছে। রাজা সযত্নে তাহার চিত্রগুলি দেখিতেছিলেন। এইরূপ সময়ে রায় বাহাদুর তাঁহার নিকটস্থ হইয়া এই কঠোর সংবাদ শুনাইলেন। রাজা ধীরভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আপনাকে কাতর বলিয়া বোধ হইতেছে। এ সামান্য ঘটনায় আপনি বিচলিত হইলে আমরা কাহার শরণাগত হইব?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কাতরতা অপরিহার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমি কার্য্যে অশক্ত নহি। এক্ষণে তুমি আর কিছু বলিতে চাহ কি?"

রাজা বলিলেন,—"মৃত্যুর পরেই যাহাতে শব গৃহ হইতে নির্গত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখুন। শবের মরণান্ত ক্রিয়া যাহারা সম্পন্ন করিতে পারিবে, এরূপ লোক এই সময়ে স্থির করিয়া রাখুন।"

"আর কিছু তুমি বলিবে কি ?"

রাজা বলিলেন,—"বোধহয় শব বাহির করিতে আপনাকে একটু কষ্ট [illegible] আমি সে সময় উপস্থিত থাকিলে [illegible] অন্নপূর্ণা সহজেই ছেলে ছাড়িয়া দিবেন বোধ হয়। [illegible] হইলে সে সময় আমাকে সংবাদ দিবেন।"

জীবনকৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—"রায় বাহাদুর মহাশয়, আপনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাদের কাহারও কিছুই করিতে হইবে না। আমি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"জীবনবাবু এ দুঃসময়ে নানা প্রকারে আমাদের বিস্তর উপকার করিতেছেন।"

রাজা বলিলেন,—"আমি চিরদিন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

রায় বাহাদুর ভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই অন্তঃপুর হইতে তুমুল ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। জীবনকৃষ্ণ বাবু কাহারও অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবীনকৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ প্রভৃতি আরও কোন কোন লোক অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সকলেই দেখিলেন,—সকলই শেষ হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র দীপ নিভিয়া গিয়াছে। সেই অপাপ শিশু জীবন-

বিহীন হইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র কোরক শুষ্ক হইয়াছে। তথায় ক্রন্দন কোলাহলের সীমা নাই।

অন্নপূর্ণা ও সুবলকে [illegible] [illegible] দাসী প্রভৃতি স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছে। সেই প্রফুল্ল কুসুম তুল্য সুকুমার-কায় জীবনহীন [illegible] একাকী শয্যায় নিপতিত। অদূরে হরকুমার বাহাদুর চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায় স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান। বেগে জীবনকৃষ্ণ বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পর সেই শবশিশু বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অঙ্কে ধারণ করিলেন। এবং বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[illegible]।

সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। চারিদিন হইল রাজা উমাশঙ্কর একমাত্র পুত্র হারাইয়াছেন। জীবন বাবু মৃত শিশুর মরণান্তর ক্রিয়া শেষ করিয়াছেন। রাজার মুখে একটু বিষাদের চিহ্নও নাই। রায় বাহাদুরের হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইতেছে।

সুহাসিনী শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। নবীনকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। রাজা প্রতিদিন বার বার তথায় গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন।

প্রাতে রাজা উমাশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং গম্ভীর অথচ প্রসন্ন বদনে রাণীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাণী তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আর কেন? এ বাটীতে আর থাকি কেন? সকলই তো ফুরাইল, এখন চল, আমরা যেখানে খুসি যাই।"

রাজা বলিলেন,—"তাহাই যাইব। তুমি দেবী। তুমি তো জান, মৃত্যু নাই। তোমার শিশুকে তুমি আবার পাইবে।"

রাণী বলিলেন,—[illegible] আইসে না। যাহা গিয়াছে তাহার আশা [illegible] আর নাই। আমার সকলই গিয়াছে, [illegible] তাহাতে ক্ষতিবোধ করি না। [illegible] কিন্তু তোমার চরণ আমার সম্মুখে থাকি[illegible]লই আছে। এক্ষণে এ স্থানে থাকিতে [illegible] বোধ হইতেছে। যখন এখানে আর থাকা হইবে না, তখন আর বিলম্বে কাজ কি?

রাজা বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিব না। শীঘ্রই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব। সুহাসিনী বাটী গিয়াছেন, এ একটা সুবিধা হইয়াছে। আর সকলের নিকট হইতে পালাইবার ব্যবস্থা তুমি করিয়া রাখিবে বলিয়াছ।"

রাণী বলিলেন,—"তাহার ব্যবস্থা আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল এই অলঙ্কারের বোঝাগুলোর একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেল।"

রাজা বলিলেন,—"তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি এখন আমি যাই, আবার শীঘ্র আসিব।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে সজীব বিষাদমূর্ত্তি রাণী অন্নপূর্ণা তাঁহার সেই দেবপতিকে দর্শন

করিতে লাগিলেন। তাহার পর সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"খোকা—তোমার খোকা আমার, আমার এত সুখে কণ্টক দিয়া তুই কোথা গেলি বাবা?"

তখনই অন্য, [illegible] [illegible] আরও অনেকে আসিয়া রাণীকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাজা উপাসনাঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সে স্থানে অনেক আত্মীয় স্বজন বসিয়া আছেন। নবীনকৃষ্ণ, রায় বাহাদুর, চণ্ডীচরণ, [illegible], [illegible], ঠাকুর বাড়ীর পূজারি, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনেক লোক তথায় বসিয়া আছেন।

রাজা আসিবামাত্র অনেকেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা সকলকে সবিনয়ে বসিতে বলিয়া স্বয়ং ব্যস্ততাসহ একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় রাজার নামের ডাকের চিঠী এবং খবরের কাগজ প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলে একখানি পত্র বড় এনভেলাপের মধ্য-বর্ত্তী এবং গবর্ণমেন্টের মোহরাঙ্কিত। রাজা সেইখানি অগ্রে পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত তাহা রায়বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করিলেন।

রাজার বর্ত্তমান অবস্থাঘটিত বিপর্য্যয় আলোচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট তাঁহার নিকট দুইটী প্রস্তাব করিয়াছেন। হয় রাজা কোন একটা রাজকর্ম্ম গ্রহণ করুন, না হয় মাসিক আড়াই শত টাকা হিসাবে পেন্সন গ্রহণ

করুন। রায় বাহাদুর পত্র পাঠ করিয়া তাহা রাজার হস্তে প্রদান করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—“কি করিবে স্থির করিতেছ?”

রাজা বলিলেন,—“আমি কোন রাজকর্ম্ম করিয়া পুরস্কার [illegible] গ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই; [illegible] করিতে আমার সাধ্য নাই। [illegible] কর্ত্তব্য সাধন করিবার চেষ্টায় জীবনকে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। কোন কর্ম্মের অধীনতায় নিযুক্ত হইলে সে স্বাধীনতা থাকিবে না। সুতরাং চাকরি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিনীত ভাবে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া উভয় প্রস্তাবেই অসম্মতি প্রকাশ করিব।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“তাহা হইলে এখন কি করিবে স্থির করিতেছ?”

রাজা বলিলেন,—“অতি উত্তম কথা আপনি উথাপন করিয়াছেন। আমি এখন কি করিব, তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করা আবশ্যক। এখানে আমার অনেক হিতৈষী আত্মীয় উপস্থিত আছেন। এই সময়েই কথাটা বলা ভাল। আমি আপনাদের সকলের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন মনে আমাকে বিদায় দিউন। আমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।”

সকলে নীরব। কাহারও কথা কহিতে সাহস নাই।

সুযোগ পাইব না এবং স্বকীয় শ্রমে আপনার পরিবার পালন ও স্নেহ, সদাচরণ পুণ্যানুষ্ঠান করিবার সুবিধা আমার হইবে না।

রামহরি চাষা দূরে মাটীর উপরে বসিয়া ছিল। সে অগ্রসর হইয়া রাজার একটু নিকটে আসিল এবং একটা প্রণাম করিয়া রাজবাহাদুরকে বলিল—"বাবা ঠাকুর তোমাদের টাকায় আমি তো বড় মানুষ। আমার বিশ গোলা ধান, আর কতই গরু বাছুর। এ বৎসর আবার পাঁচ গোলা ধান বাড়িবে—রাজা কিনা আমরা থাকিতে পেটের দায়ে জল খাইবে? পোড়া কপাল আমাদের। আমরা তা হলে ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া বিবাগী হইব। তোমার পায়ের ধূলা পাইলে লোকের কপাল ফিরিয়া যায়, তুমি কিনা মোট বহিয়া খাইবে রাজা। তুমি রাজাটার মত বসিয়া থাক। আর আমার গোলায় যে ধান আছে, তাহাই খাও।"

অনেকের চক্ষুতে জল আসিল। রাজা বলিলেন,—"রামহরি আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার আরও অনেক ধান হইবে, অনেক গরু বাছুর হইবে। কিন্তু দাদা তুমি বুঝিয়া দেখ, অক্ষম না হইলে কাহাকেও বসিয়া খাইতে নাই। এখন আমার শ্রম করিবার সামর্থ্য আছে, আমি কেন এখন বসিয়া থাকিব? যখন কোন উপায় না হইবে তখন আমি অবশ্যই তোমার ধান

খাইব। তাহাতে আমার একটুও লজ্জা বা অপমান নাই। তুমি আজই দামীজিদিকে লইয়া বাড়ী যাও।”

রামহরি বলিল,—“তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে খবর পাঠাইয়াছিলে, তাই আমি আসিয়াছি। এখানে আসিয়া তোমাদের এই সকল অবস্থার কথা জানিতে পারিলাম। এখন আমি আমার স্ত্রী লইয়া যাইব কেন? তোমাদের এখন চাকর চাকরাণী নাই, আর এই শোক তাপের সময় তোমরা তাড়াইয়া দিলেও সেও যাইবে না, আমিও যাইব না।”

রাজা বলিলেন আমি এখন যাইব বটে, কিন্তু শীঘ্রই তোমাদের সহিত আবার দেখা হইবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না।”

একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“ধর্ম্মাবতার আমি সামান্য ব্যক্তি; হুজুরের কালী বাড়ীর আমি পূজারি। আমি একটা কথা বলিব? ঠাকুরবাড়ীতে প্রতিদিন পঞ্চাশ জন লোক খায়। সে তো রাজারই খরচ। আপনি পেটের জন্য পরিশ্রম করিয়া খাইবেন, এ কষ্টের কথা শুনিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ হুজুর নিত্য ভোজন করিবেন, তাহাতে ক্ষতি কি আছে?”

রাজা বলিলেন,—“আপনি বড় সৌভাগ্যের কথাই বলিয়াছেন। নিত্য প্রসাদ ভোজন বড়ই পুণ্যের কথা। কিন্তু যে প্রসাদ তথায় প্রস্তুত হয়, তাহা পরে খাইবে

মনে করিয়াই প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তাহা আমরাই গ্রহণ করিলে পরের ভাগ কাড়িয়া লওয়া হয়। ইহাকে দত্তাপহারী বলে। কেন আমার জন্য আপনারা চিন্তাকুল হইতেছেন। শ্রম করিয়া জীবিকা পাত করিতে সকলেই বাধ্য। প্রয়োজনে লজ্জা নাই, কোন অপমান নাই। বরং তাহাতে গৌরব আছে।"

জরিক কোচমান বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে সেলাম করিয়া বলিল,—হুজুর এ গোলাম ছেলেবেলা হইতে আপনার নিমক খাইয়াছে। আমার শরীরে যথেষ্ট বল আছে। আর কিছু আমার নাই। গোলাম খাটিয়া আনিবে রোজগার করিবে। আমার আর কেহ নাই। যাহা পাইব তাহা হুজুরের চরণে দিব। হুজুরের খরচ বোধ হয় এ গোলাম খাটিয়া করিতে পারিবে।"

রাজা বলিলেন, তুমি বড় ভাল লোক জরিক। আমি অক্ষম হইলে নিশ্চয়ই আমাকে আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এখন আমি সক্ষম। আমাকে মাফ করিবে, এখন তোমাদের পরিশ্রম করাইয়া খাইলে আমার পাপ হইবে।"

চণ্ডী বলিল,—আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। রাজা বাবাজী এমন সর্ব্বনাশের কথা উত্থাপন করিয়াছেন, আর রায়বাহাদুর দাদা, তুমি একটিও কথা কহিতেছ না

কেন? তুমি ব্যবস্থা না করিলে আমাদের এ বিপদের কোনই উদ্ধার দেখিতেছি না।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“আমি বিশেষ গোলের কথা দেখিতেছি না। আমি যাবজ্জীবন এই সংসারের কর্ম্ম করিয়াছি। এই সংসার হইতে প্রায় এক লক্ষ টাকা আমি সঞ্চয় করিয়াছি। রাজা আমার পুত্রাধিক। পিতার সাহায্য পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য। আমি আমার সেই সমস্ত টাকা রাজাকে দিব। রাজা তাহা লইয়া একস্থানে বাস করুন।”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“হরি হরি বল ভাই। রায়বাহাদুরের মত ব্যবস্থা করিতে দুনিয়ায় আর কেহ জানে না। রায় বাহাদুর দাদা, তুমি দাদা না হইলে আমি তোমাকে চিরজীবি হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতাম। তা দাদা, তুমি আমি আমরা সব রাজার কাছে থাকিতে পাইব তো?”

রায় বাহাদুর বলিলেন “অবশ্য পাইব। রাজা যেখানে যে অবস্থায় কেন থাকুন না, আমরা তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিব না।”

চণ্ডী বলিলেন,—“বেশ কথা। এ কথার পর রাজা মুটিয়ার জামাই হইতেই চাহুন, আর কাঠকুড়ানীকে শাশুড়ি বলিয়া ডাকুন আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই। মা অন্নপূর্ণা আর বাবা উমাশঙ্করের আশ্রয়ে আমরা নিশ্চয়ই থাকিব।”

রাজা বলিলেন,—"খুড়া মহাশয় আপনি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই সংসারেরই অর্থ। তাহা গ্রহণ করিলে আমার কৃপাপ্রার্থী পাপ হইবে না কি? আমি তাহা লইতে পারিব না। আপনি বলিতেছেন, পিতার সম্পত্তি পুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য। আপনি যে আমার পিতৃবৎ পূজনীয় তাহার কোনই সন্দেহ নাই? আমি যে আপনার সন্তানাধিক স্নেহাস্পদ তাহারও সন্দেহ নাই। আপনার কৃপার সীমা নাই। কিন্তু খুড়া মহাশয় আপনি বৃদ্ধ পিতা, আমি যুবা পুত্র। এ সময়ে আপনাকে প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্ম। আপনার দ্বারা প্রতিপালিত হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে। আমি সবিনয়ে আপনাদের সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি নানা কার্য্যে নানা সময়ে হয়তো নানা জনের নিকট অপরাধী হইয়াছি। আমাকে সকলে ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আর আমি কি বলিব? আমার সহিত সকলেরই আবার সাক্ষাৎ হইবে। আমি কোথায় যাইব, কি করিব, তাহা আপনারা অবশ্যই জানিতে পারিবেন। এখনও আমি কিছু স্থির করিতে পারি নাই।

কেহ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বে বাহিরে একটা তুমুল কলরব উপস্থিত হইল। রাজা, রায় বাহাদুর প্রভৃতি তাবতেই এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা প্রভৃতি সকলে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন রাজবাটীর সম্মুখস্থ বিশাল অঙ্গন লোক-পূর্ণ। অসংখ্য মানব অঙ্গন সম্মুখস্থ পথ অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং এখনও চতুর্দ্দিগাগত পথ বহিয়া জন-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই জনসমূহ অনবরত চীৎকার করিতেছে,—"কই আমাদের রাজা কই ?"

বহু কণ্ঠ হইতে এই শব্দ উত্থিত হইয়া তথায় এক বিষম কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। রাজা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে সেই অগণ্য কণ্ঠে আবার শব্দ হইল,—"ঐ রাজা—ঐ আমাদের রাজা ?"

সকলের মুখে আনন্দ প্রকটিত হইল, সকলেই সাগ্রহে বারান্দার অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিল।

রাজা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কেন আসিয়াছ ? আমাকে কি বলিতে চাহ ?"

বহু কণ্ঠ হইতে বহু বাক্য নিঃসৃত হইল। কিছুই বোধ-গম্য হইল না, কেবল একটা বিষম কলরব শ্রুত হইল।

রাজা বলিলেন,—"এরূপ করিয়া বলিলে আমি কিছুই বুঝিতে পারিব না, তোমরা একজনকে কথা কহিবার ভার দাও।"

বহুক্ষণে বহু যত্নে সেই লোকেরা প্রকৃতিস্থ হইল। তখন এক ব্যক্তি বক্তব্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটা লোহার বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান হইল। সে ব্যক্তি প্রবীন ও বাক্‌পটু। বেঞ্চের উপর উঠিয়া বক্তা বলিল,—"আমাদের রাজা, আমরা আপনার দীন প্রজা। আপনার নিকট আমাদের প্রাণের দুঃখের কথা নিবেদন করিব বলিয়া নানা স্থান হইতে আমরা আজি এখানে মিলিত হইয়াছি।"

রাজা বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমরা শুন নাই কি, আমি এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে যে সকল জমিদারী আমার ছিল, তাহা এক্ষণে চন্দ্রমালার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী করুণাময়ী মাতার হইয়াছে। তোমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে তোমরা পুণ্যবতী দীনজননী দেবীর প্রজা হইয়াছ। জমিদারী সংক্রান্ত কোন কথা বলিতে হইলে, তোমাদের এখন সেই মহারাণী মাতাকে অথবা তাঁহার সুযোগ্য ও পরম ধার্ম্মিক দেওয়ান জীবনকৃষ্ণ বাবুকে জানান উচিত। দেওয়ানজি এখানেই থাকেন, ঐ কাছারি বাটীতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে।"

বক্তা বলিল,—"আমাদের কথা আমাদের রাজার

চরণেই জানাইতে হইবে। আমরা মাসাবধি কাল অশেষ চেষ্টায় নানা স্থানের লোক একত্রিত হইয়া এক স্থানে মিলিয়াছি। আমরা বলিতে জানি না, মনের কথা কেমন করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়, তাহা বুঝি না। তথাপি কৃপা করিয়া আমাদের কথা আপনার শুনিতে হইবে।”

রাজা বলিলেন,—“বলুন আপনি। আপনার কথা আমি অবশ্যই শুনিব, আমি অক্ষম দরিদ্র হইলেও, আমার দ্বারা আপনাদের যে বিষয়ের যে উপকার হইতে পারে, সাধ্যমত তাহার ত্রুটি করিব না।”

বক্তা বলিল,—“আমরা জ্ঞাত আছি, আপনার বিষয়-সম্পত্তি হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। আপনার বাড়ী ঘর, হাতী ঘোড়া সকলই গিয়াছে। কি জন্য আপনার সকল সম্পত্তি গেল তাহাও আমরা জানি। দেশের লোককে বাঁচাইতে গিয়া আমাদের রাজা কাঙ্গাল হইয়াছেন। ইহার উপর ভগবানের নিগ্রহে রাজার এক মাত্র পুত্রও ছাড়িয়া গিয়াছেন। এ দুঃখে আমরা সকলে কিরূপ কষ্ট বোধ করিয়াছি তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিতে আমাদের সাধ্য নাই।”

রাজা বলিলেন,—“ভাই সব, তোমরা সকলে আমাকে বড় ভালবাস, এ জন্য আমার কষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তোমরাও কষ্ট বোধ করিয়াছ। কিন্তু ভাই, তোমরা

নিশ্চয় জানিবে, যে সকল ঘটনা তোমরা উল্লেখ করিলে তাহার কিছুতেই আমার কষ্ট হয় নাই। বিষয় সম্পত্তির অভাব হইলেই যে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ হয়, এরূপ কোন কথা আমি মনে করি না। কতকগুলা বিষয় সম্পত্তি থাকিলেই যে মনুষ্য সুখী হয় তাহাও আমি মনে করি না। এ জগতে সকলেই শ্রম করিয়া খাইবে, ইহাই ভগবানের নিয়ম। তোমরা শ্রম করিয়া জীবন পাত কর। আমারও হাত পা আছে, আমিও শ্রম করিয়া জীবন যাপন করিব, ইহাতে, ক্ষতি কি আছে ভাই। আর আমার পুত্রের মৃত্যু স্মরণ করিয়া তোমরা দুঃখ করিও না। আমাদের সকলেরই এক দিন মৃত্যু হইবে। ইহার দশ দিন অগ্র পশ্চাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। যাহাকে আমরা আজি আমার আমার করিয়া মরিতেছি, আমরা এক দিন তাহাকে ছাড়িব, অথবা সে আমাদিগকে ছাড়িবে। ইহাই নিশ্চিত ব্যবস্থা। তবে কেন এ জন্য চিন্তাকুল হইয়া মনুষ্য কষ্ট পায়? আমার পুত্রের মৃত্যু হেতু আমি একটুও কাতর হই নাই ভাই।"

বক্তা বলিল,—"আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনুষ্য। আমরা এ জন্য বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে কথা নিবেদন করিব বলিয়া রাজার চরণে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি। আমরা শুনিয়াছি আপনি এ স্থানে আর থাকিবেন না। এ কথা শুনিয়া

আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনি আমাদের পিতা; মাতা, ভাই; বন্ধু সকলই। আমরা আপনাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করি। আপনি চলিয়া গেলে আমাদের জীবন ধারণ বৃথা হইবে।”

রাজা বলিলেন,—“আমি জানি, তোমরা আমাকে বড় ভালবাস। আমার জন্য তোমাদের কষ্ট হইবে সন্দেহ কি? কিন্তু ভাই সব, তোমাদের জন্যও আমার বিশেষ কষ্ট হইবে। কিন্তু কি হইবে ভাই, এ অবস্থায় এ স্থানে আমার আর থাকিবার কোনই উপায় নাই।”

বক্তা বলিল,—“কেন উপায় নাই? রাজা আমরা আপনার দাস। এই দাসেরা আপনাকে রাজরাজেশ্বর করিয়া রাখিবে। যে খাজনা আমরা দিয়া থাকি, তাহা আমরা নূতন জমিদারকে দিব। ঠিক সেই খাজনা আবার আমাদের রাজার কাছারিতেও দাখিল করিব। আমাদের রাজা যাহা ছিলেন, তাহাই থাকিবেন। এই পরামর্শ করিয়া আমরা নানা স্থানের লোক মিলিয়া আজি রাজার সম্মুখে আসিয়াছি, এক্ষণে রাজার অনুকূল আদেশ শুনিতে পাইলে আমরা চরিতার্থ হই।”

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“ভাই সব, তোমরা আমাকে এত ভালবাস ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। তোমাদের প্রস্তাব অতি মহৎ ও আমার হিতকর, কিন্তু ভাই সব, তোমরা কিছু মনে করিও না।

আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি অকারণ তোমাদের অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না, সেরূপ অর্থ গ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই। আমি তোমাদের সকলের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করিতেছি তোমরা আমাকে যাহার প্রজা হইয়াছ তিনি স্বর্গের দেবী। তোমরা তাঁহার অধীনে পরম সুখে থাকিবে সন্দেহ নাই।”

বক্তা বলিলেন,—“তাহা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু আমাদের রাজার কাছে আমরা থাকিতে চাহি; আমাদের রাজাকে দেখিতে চাহি; আমাদের রাজার আমরা সেবা চাহি। আমাদের এ সকল প্রার্থনা সিদ্ধির উপায় কি?

রাজা বলিলেন,—“অবশ্যই তোমাদের সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে, অবশ্যই তোমাদের নিকটে আমি কখন কখন আসিব, আর যেখানেই থাকিব, নিশ্চয়ই তোমাদের কথা আমি ভাবিব। ভাই সব, এখন বেলা অনেক হইয়াছে, তোমাদিগকে আজি এখানে আহার করিতে হইবে।” এখন তোমরা সুস্থির হও, তাহার পর সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হইলে ও সুবিধা হইলে, এ সকল পরামর্শ হইবে।”

বক্তা বলিল,—“আমরা যত লোক আসিয়াছি প্রত্যেকে এক টাকা হিসাবে রাজার জন্য নজর আনি-

য়াছি। আমরা এক্ষণে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আসিয়াছি, রাজা আজ্ঞা করুন, আমরা সে টাকা ঐ চরণে সমর্পণ করি।”

সকলেই টাকা বাহির করিল। রাজা বলিল,—“ভাই সব, তোমাদের নিকট নজর লইতে আমার আর অধিকার নাই। আমি আর তোমাদের জমিদার নহি। তোমাদের যিনি জমিদার তিনিই নজর পাইবেন।”

বক্তা বলিল,—“নজর যদি না লন, তাহা হইলে, প্রণামী বলিয়া আমরা টাকা দিব। আপনি ব্রাহ্মণ, পরম ধার্ম্মিক, আমাদের মহোপকারী মহাত্মা। আমরা আপনাকে একটা করিয়া টাকা দিয়া প্রণাম করিব। আমরা অবাধ্য সন্তান, আমরা আপনার নিষেধ শুনিব না। আমরা টাকা দিয়া প্রণাম করিতেছি। তিন মাস অন্তর আমরা রাজ চরণে এই রূপে প্রণাম করিতে আসিব।”

বক্তা প্রথমেই বিনীত প্রণাম সহকারে নীচের বারান্দায় একটী টাকা ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার ধারার ন্যায় টাকা সেই স্থানে বর্ষিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বারান্দায় স্তূপাকার টাকা জমিয়া গেল।

রাজা বলিলেন,—“ভাই সব, তোমরা দুঃখিত হইও না। আমি তোমাদের টাকা স্পর্শও করিব না। প্রণামী গ্রহণ আমার ব্যবসা নহে; প্রণামী লইতে আমার অধিকার নাই। প্রণামী দিবার মত কোন কারণ

উপস্থিত হয় নাই। এরূপ প্রণামী ভিক্ষারই নামান্তর। আমি বর্ত্তমান অবস্থায় ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অক্ষম এক্ষণে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আমার অধর্ম্ম হইবে। তোমাদের ঐ টাকা যদি তোমরা ফিরাইয়া না লও, তাহা হইলে, তোমাদের সম্মুখেই তোমাদের কোন হিতকর কার্য্যে আমি এখনই উহা ব্যয় করিব।”

বক্তা বলিল,—“আমরা রায় বাহাদুর মহাশয়ের চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। আপনি দয়া করিয়া এই টাকা রাখিয়া দিলে আমরা সুখী হইব। রায় বাহাদুর মহাশয়, আপনি রাজার পরম আত্মীয়, আপনি দয়া করিয়া টাকা রাখিয়া দিন। তাহার পর যাহা ভাল হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন।”

রায় বাহাদুর বলিলেন,—“আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আমি এ টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারি, পরে যাহা ভাল হয় তাহাই হইবে। আপাততঃ রাজা টাকা গ্রহণ করিলেন না জানিয়া তোমরা আমার নিকট টাকা রাখিয়া দিতে পার।”

বক্তা বলিল,—“তাহাই বেশ।”

রাজা বলিলেন,—“এক্ষণে তোমাদের আহারাদির ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।”

বক্তা বলিল,—“আমরা রাজার আশ্রিত দাস। আমাদের খাওয়ার জন্য চিন্তা কি? এত বেলায় এত

লোকের জন্য উদ্যোগ করিয়া আহারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। "আমরা সকলে বাটীতে ফিরিয়া আহার করিব। যাহাদের দূরে বাস, তাহারা কুটুম্ব বাড়ী খাইবে স্থির আছে। কাহারও কষ্ট হইবে না। বেলা অধিক হইয়াছে রাজার কষ্ট হইতেছে আমরা এক্ষণে প্রণাম করিয়া বিদায় হই।"

পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় সেই জনপ্রবাহ ক্রমে ক্রমে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

প্রাতে যে সকল ব্যক্তি রাজার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বৈকালে তাঁহারা সকলেই আসিয়াছেন। রাজা মধ্যাহ্নে অন্তপুরে ছিলেন, বৈকালে বাহিরে আসিয়া সকলকেই দেখিতে পাইলেন এবং সকলের সহিত সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া রায়বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“খুড়া মহাশয়, টাকাগুলি কি করিলেন ?”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“টাকা সমস্তই জীবন বাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছি।”

রাজা বলিলেন,—“বেশ করিয়াছেন। তাহার পর টাকার কি হইবে; স্থির করিয়াছেন ?”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“তুমি এ টাকা গ্রহণ করিবে না জানি। তথাপি তোমার অনুরক্ত ব্যক্তিগণ বহু আয়াসে তোমাকে ভক্তি ও অনুরাগ দেখাইবার নিমিত্ত যে আয়োজন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে হতাশ করা অকর্ত্তব্য মনে করিয়াই আমি টাকা রাখিয়া দিয়াছি।

রাজা বলিলেন,—“উচিত কার্য্যই করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পর টাকার কি গতি করিবেন; তাহাই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“যাহা হয় হইবে। উচিত বোধ হইলে জীবন বাবুর দ্বারাও আমাদের হিতজনক কোন কার্য্যে ঐ টাকা ব্যয় করিলেও চলিবে।”

রাজা বলিলেন,—“জীবন বাবু কি মহাশয় লোক! তাঁহার নিকট আমরা নানা প্রকারে ঋণী। আমার পুত্র সংক্রান্ত গত বিপদে জীবন বাবু কি পরিশ্রম, কি উপকার ও কি আত্মীয়তা প্রকাশই করিয়াছেন। যেমন মহারাণী মাতার সুনাম, তেমনই তাঁহার কার্য্য নির্ব্বাহক।”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“জীবন বাবু যে মহাশয় ব্যক্তি তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের সম্পত্তি ক্রয় সম্বন্ধে আমরা যে বিষয়ের যে দাম স্থির করিয়াছি, তাঁহার কোনটীতে কোন কথা কহেন নাই। তখনই সেই টাকা আনন্দে দিয়াছেন। তা ছাড়া অন্যান্য নানা বিষয়ে আমাদিগের সহিত আশাতিরিক্ত আত্মীয়তা ও সৌজন্য করিয়াছেন। যথার্থ ভদ্রলোক না হইলে এরূপ মহত্ত্ব হয় না। সৌভাগ্যক্রমে জীবন বাবুর সহিত আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহারাণী মাতাকে আমরা একবার দেখিতেও পাইলাম না।”

রাজা বলিলেন,—"অবশ্যই কখন না কখন আমরা তাঁহার চরণদর্শন করিতে পাইব।"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"আমরা যখন এ স্থল ত্যাগ করিতেছি, তখন আর মহারাণীর সহিত সাক্ষাতের আশা কিরূপে করিতে পারি?"

রাজা বলিলেন,—"খুড়ো মহাশয়, এই স্থানই কি পৃথিবীর শেষ? এ স্থান ত্যাগ করার পরই কি আমাদের জীবনের সকল আশার শেষ হইবে? যদিই তাহা হয়, তাহা হইলে পুনরায় এ স্থানে আমরা আর কখন আসিব না, এমন কথাই বা কে বলিতে পারে? যাহার ইচ্ছায় সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তিনি কাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা জানিতে আমাদের কোনই ক্ষমতা নাই। সে কথা থাকুক, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কয়দিন আসিয়াছেন ওবেলাও উনি অনেকক্ষণ বসিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছেন, আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি, উনি কেন আসিয়াছেন?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"বোধ হয় অন্য কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের নানারূপ গোলমালের কথা শুনিয়াই বোধ হয় দেখিতে আসিয়াছেন। অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে, চারিদিনের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোন সময় আমাকে তাহা বলিতেন, না হয় চণ্ডী ভায়ার

যারাও যানাইতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, দেখা শুনা করিতে আসা ছাড়া আর কোন প্রয়োজন আছে কি ?"

রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মোক্তার মহাশয়, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, দেখা শুনাই অভিপ্রায় বটে। তা একটা কথাও ছিল। বড় গণ্ডগোল দেখিয়া বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই।"

চণ্ডীচরণ একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে রামচন্দ্রের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"বাবা আবার কথা কি এ? তুমি কেবল দেখা করিতে আসিয়াছ তাহাই ত আমরা জানি। আর কথা টথার এ সময়ে কাজ নাই। তুমি এখন বাসায় যাও।"

রাজা বলিলেন,—"সে কি কথা চণ্ডী খুড়া ? যদি কোন দরকারী কথা থাকে, তাহা না বলিলে হয়ত ক্ষতি হইতে পারে; বলুন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কি কথা আছে ?"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"আমি এতদিন রামনগরেই ছিলাম। সেখান হইতে রাজার বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় হইতেছে এ সকল সংবাদ জানিতে পারি। হঠাৎ শুনিলাম, রাজা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সেই সংবাদ শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি আসিতেছি। তা রাজা মহাশয়, আপনি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেন; এ গরিব ব্রাহ্মণ অনেক আশা করিয়া রহিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—"কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

চণ্ডী বলিলেন,—"করিতে আমার কি হইবে? সমস্ত জীবন খাটিয়াও যাহা করিতে পারি নাই, আর এতদিন খাটিলেও যাহা করিতে পারিতাম না, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী তুমি পাইয়াছ; আর কোন আশায় তুমি বসিয়া আছ? দোহাই বাবা, এ সময় তুমি আর আমার কথা তুলিয়া জ্বালাতন করিও না। [illegible]"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"মোক্তার মহাশয়ের যদিই কোন দরকারী কথা থাকে, [illegible]"

রায়বাহাদুরের কথার উপর চণ্ডীচরণ কথা কহিতে পারিলেন না; সুতরাং রামচন্দ্র বলিলেন,—"অনেক উপকার আপনারা করিয়াছেন—বিশেষ রায়বাহাদুর মহাশয়, আরও কিছুর আশা দিয়াছিলেন। আপনারা চলিয়া যাইতেছেন, গরিবের কথাগুলি একবার শুনিলে হইত।"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"কি আশা দিয়াছিলাম বলুন।"

চণ্ডচরণ বলিলেন,—"বাড়ী পাইয়াছ, বাড়ী বাড়াইবার জন্য নগদ হাজার টাকা পাইয়াছ, মেয়ের বিবাহে তিন শত টাকা পাইয়াছ, আবার আশা কি? আর কোন আশা কেহই দেন নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"দিয়াছিলেন বই কি, তুমিও

তো সেখানে ছিলে। মাসে কুড়ি টাকা করিয়া সাহায্য করার কথা রায়বাহাদুর মহাশয় বলিয়াছিলেন; এ কথা কি তোমার মনে নাই ভাই ?”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“সে কখন ? যদি তোমার স্বর্গলাভ হয়, যদি তুমি অশক্ত হও, তখন। তোমার স্বর্গলাভ হইয়াছে নাকি ? যাও, যাও, অনর্থক কথা লইয়া এ সময় ত্যক্ত করিও না।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“না ত্যক্ত আমি কেন করিব ? কথাটা হইয়াছিল, তাই মনে করাইয়া দিতেছি। রাজার সব গেল, কেবল আমিই মারা পড়িলাম।”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“তোমার স্বর্গলাভ হইলে, তোমার কথা নিশ্চয়ই রায়বাহাদুরের মনে পড়িত। কেন দাদা, সুবিধা করিয়া কিছু আগে স্বর্গলাভ ঘটাইতে পার নাই ? রাজার সব গেল বলিয়া যদি শুনিয়া থাক তবে এখন কি জন্য আসিয়াছ ? সব যাওয়ার পরও তোমার জন্য আবার সব হইবে না কি ? দাদা, তোমার কি কোন ধর্ম্মজ্ঞান নাই, একটু বুদ্ধি বিবেচনা নাই ? এখন এই দুঃসময় এখন তুমি আসিয়াছ, তোমার স্বর্গলাভের পরে ছেলেপীলের কি হইবে তাহারই ব্যবস্থা করিতে ? ছিঃ ! মনে করিয়া দেখ, কত উপকারই তুমি পাইয়াছ। মরার পর কি হইবে, তাহাই বলিবার কি এই সময় ?”

রামহরি কৈবর্ত্ত বলিল,—“আমি একটা কথা বলি

শুন। এখান হইতে কোন টাকা কড়ি আর ঠাকুর তুমি পাইবে না। আশা অনেকে অনেক করে, সব কি সফল হয়। তোমরা ভদ্রলোক। সময় অসময় বুঝিয়া কথা কহিতে জান না? আমাদের চাষার ঘরে এমন লোক নাই যে মানুষের বিপদ আপদ বুঝে না। তুমি ঠাকুর বাড়ী যাও। তোমার যদি অদিন হয়, তখন আমি তোমার খরচের মত টাকা মাসে মাসে দিব। তুমি রাজাকে আর কোন কথা বলিও না।

রাজা বলিলেন,—"চণ্ডী খুড়া, আপনার দাদাকে আপনি অকারণ অনুযোগ করিবেন না। তাঁহার সহিত কিছু সাহায্য প্রাপ্তির কথাছিল বলিয়াই উনি সে কথার উল্লেখ করিতেছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, এ সংবাদ আপনি শুনিয়াছেন। আমি এ স্থানে আর থাকিব না, তাহাও আপনি জানেন। এ অবস্থায় আপনাকে মাসিক সাহায্য করিবার কোন ব্যবস্থা করাই আমার পক্ষে সম্ভব নহে। যে যে ঘটনা ঘটিলে আপনি সাহায্য পাইবেন কথা ছিল, তাহার কিছুই ঘটে নাই। তথাপি মনে করা উচিত, কল্যই আপনার মৃত্যু হইতে পারে, অথবা আপনি কর্ম্মে অপটু হইতে পারেন। আমি সকল দিক ভাবিয়া, এ সময়ে আপনাকে কিছু নগদ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহার সুদ খাটাইয়া আপনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকুন।"

রামচন্দ্র হৃষ্টভাবে বলিলেন,—"আপনার জয় জয়কার হউক। কিছু নগদ টাকা পাইলেই আমার ভবিষ্যতের উপায় হইবে।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"রাজা বাবাজী, নগদ টাকা এ সময় আসিবে কোথা হইতে, প্রজারা যে টাকা দিয়া গিয়াছে, তাহা তুমি স্পর্শ করিবে না। ঘরে বা অন্য কোথায় কিছুই নাই। তবে টাকার কথা কেন বলিতেছ? টাকা কড়ি কিছুই এখন হইবে না দাদা। তুমি এখন বাড়ী যাও। রাজার যদি সময় ভাল হয়, তখন তোমার ব্যবস্থা হইবে।"

রামচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। রাজা বলিলেন,—"না না যাহা হয় একটা উপায় করিতেই হইবে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কত টাকা হইলে আপনার ভবিষ্যতের ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে?"

রামচন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। বলিলেন,—'আজ্ঞে এক হাজার টাকা—এক হাজার টাকা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে।"

রাজা বলিলেন,—"তাহাই আপনি পাইবেন। আমার স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার আছে। তাহার কিছু বিক্রয় করিলে এক হাজার টাকা হইবে। সে অলঙ্কারে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অদ্যই টাকা আপনার হস্তগত হইবে।"

রামচন্দ্র সানন্দে বলিলেন,—“আপনি কল্পতরু। এখানে আসিয়া কাহাকেও বিমুখ হইতে হয় না। আপনার অশেষ কল্যাণ হইবে।”

চণ্ডী বলিল,—“দাদা, আর আশীর্ব্বাদে কাজ নাই। রাণী মার অলঙ্কার বিক্রয়ের টাকা লইয়া ভবিষ্যত জীবনের তুমি সংস্থান করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ না, তোমার আবার আশীর্ব্বাদ। তোমার আশীর্ব্বাদ না পাইলেও রাজার কোন ক্ষতি হইবে না। এখন যাও তুমি আর এক সময় আসিয়া টাকা লইয়া যাইও।”

রাজা বলিলেন,—“না, যাইবেন কেন? বসুন আপনি, হয় তো এখনই টাকা লইয়া যাইতে পারিবেন। খুড়া মহাশয় একবার এ ঘরে আসিবেন কি আপনারা সকলে দয়া করিয়া একটু বসুন, আমি এখনই আসিতেছি।”

রাজা ও রায়বাহাদুর পার্শ্বস্থ প্রকোষ্টে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে রামহরির নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, —“দেখিতেছি তুমি বেশ বুদ্ধিমান লোক। দেবতা ব্রাহ্মণেও তোমার ভক্তি যথেষ্ট। তোমার বাড়ী কোথায়?

রামহরি বলিলেন,—“কেন বল দেখি।”

রামচন্দ্র বলিলেন,—“আর কিছু নয়। বলি তোমার বুঝি অনেক ধান আছে?”

"আছে।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "বেশ বেশ, আরও হউক। সময় অসময়ে আমি তোমার সুখে শোধ করিব, তুমি তো সাহায্য করিতে আপনিই স্বীকার হইয়াছ। তোমার কল্যাণ হউক।"

রামহরি বলিল,—"টাকা ছাড়িলে কি ঠাকুর? রাণীর গহনা বেচিয়া টাকা লইয়া যাইতেছ, আমার ধান চাহ কেন? তোমার আশীর্বাদে আমার কাজ নাই।"

রামচন্দ্র বলিলেন,—"সত্যই কি তুমি মনে কর এত বড় রাজাটার আর কিছু নাই? সত্যই কি তুমি ভাব যে রাণীর হাতে, কিংবা লুকান টাকা নাই? সত্যই কি তুমি মনে কর প্রজাদের টাকা রাজা লইবে না? সত্যই কি তুমি মনে কর রাণীর গহনা বেচিয়া আমাকে হাজার টাকা দিতে হইবে? বুদ্ধিমান চতুর লোকে ঐ রকম করিয়াই বলে, ঐরূপ চাপা চাইলে চলে।"

রামহরি উঠিয়া বলিল,—"ঠাকুর, তুমি আমার কাছ হইতে সরিয়া যাও। তোমার বাতাস গায়ে লাগিলেও পাপ হয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রস্থান।

রাজা ও রায়বাহাদুর অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া বসিবামাত্র জীবনকৃষ্ণ বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"আপনার নিকট অশেষ উপকারে আমি বদ্ধ। কোন প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। আপনার উপকার চিরদিন মনে অঙ্কিত থাকিবে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আপনি ভুবন বিখ্যাত মহাপুরুষ। আপনার উপকার করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের কি আছে? প্রার্থনা করি, আপনার অনুগ্রহে যেন কখন বঞ্চিত না হইতে হয়।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—আমরা আপনাকে দেখিয়াই মোহিত হইয়াছি। আপনি যাহার আশ্রিত না জানি সেই মহারাণী মাতা কি অলৌকিক স্বভাবা। তাঁহাকে দর্শন করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না।"

লোকজন সকলেই এখন আপনার নিকট আশ্রয় পাই-য়াছে; আপনি তাহাদের [illegible] নবকে তাড়াইয়া দিলেও পারিতেন। আমার পুত্রের মৃত্যুর সময় আপনি রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, ঔষধ প্র[illegible] করণ, শেষে তাহার অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত সকলই সম্পন্ন ক[illegible]য়াছেন। কোথাও তো বিরাগজনক কোন কার্য্যই দে[illegible]খি না; যাহা স্মরণ করি[illegible]তেছি তাহাতেই তো সা[illegible] কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণই দেখিতে পাইতেছি। [illegible]ং আপনি এখন যাহা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, [illegible] সংবাদও কখনই আমাদের বিরাগজনক হইবে না। [illegible] কি সংবাদ?

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"বিধুমুখীর [illegible]য় করা বিষয় লইয়া মহারাণী মাতার সহিত আপ[illegible]দের মোকদ্দমা চলিতেছিল।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কি হইয়াছে বলুন। গত মঙ্গলবারে সে মোকদ্দমা শেষ হইবার কথা। বিশেষ ব্যস্ততায় তাহার সন্ধান লওয়া হয় নাই।"

জীবনকৃষ্ণ বলিলেন,—"সে মোকদ্দমায় আমরা জয়ী হইয়াছি।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"তাহাই হইবার কথা বটে! ন্যায় ও যুক্তিমতে মোকদ্দমায় আমাদের জয় হইতে পারিত; কিন্তু আইন মতে আমাদের জয়ের কোন আশা ছিল না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"সেজন্য আপনাদিগকে পঞ্চাশ হাজার টাকার দায়ী হইতে হইয়াছে। এই টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে মহারাণী মাতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"অবশ্যই টাকা দিতে হইবে। এক উপায় আছে। আমার স্ত্রীর কতকগুলি অলঙ্কার আছে। তাহা রাখিবার আর কোন আবশ্যক নাই। আমি সেগুলা আনিয়া ফেলি। আপনি দেখুন, তাহাতে এত টাকা হয় কি না।"

রামচন্দ্রের প্রাণ উড়িয়া গেল। গহনা বিক্রয় করিয়া রাজা তাঁহাকে টাকা দিবেন কথা ছিল। এক্ষণে কোথা হইতে জীবন বাবু চীলের মত আসিয়া তাঁহার মুখের খাদ্য কাড়িয়া লইয়া যায়।

অতি ভীতভাবে রামচন্দ্র উঠিয়া বলিল,—"আজ্ঞা অলঙ্কার হইতে আমাকে এক হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা আমার মনে আছে। আপনাকে সেজন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আপনারা সকলে একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসিতেছি।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। অনতিকাল পরে রাজা দুইজন দাসী সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে পুনরাগত হইলেন। সকলেরই হাতে এক একটা অতি সুন্দর বাক্স। সেই

বাক্স সকল জীবন বাবুর সম্মুখে [illegible] পেশ করিয়া, রাজা সকল গুলির চাবি খুলিয়া [illegible] এবং জীবন বাবুকে বলিলেন,—"[illegible] সামগ্রীর মূল্য কত টাকা হইতে পারে।"

জীবন বাবু [illegible] অলঙ্কার বাহির করিতে লাগিলেন। হীরক খচিত, মুক্তা জড়িত, প্রবাল সমন্বিত, চুনী [illegible] পরিপাটী স্বর্ণালঙ্কার সেই সকল বাক্স হইতে বাহির হইতে লাগিল। অলঙ্কার সমূহের শোভা ও নির্মাণ কৌশল দেখিয়া দর্শক-গণ বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

জীবন বাবু সমস্ত অলঙ্কার দর্শনের পর বলিলেন;—"রায়বাহাদুর মহাশয়, আপনি এসকল বিষয়ে হয়তো অভিজ্ঞ আছেন। আমার পক্ষে ইহার মূল্য অবধারণ করা সহজ নহে; [illegible] জহুরী ব্যতীত, ইহার দাম ঠিক করা কঠিন।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"আমিও দাম ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহার সমস্ত সামগ্রীই আমি স্বয়ং প্রস্তুত করাইয়াছি। এজন্য কত টাকা খরচ পড়িয়াছে তাহা আমি জানি।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"কত টাকা ?"

রায়বাহাদুর বলিলেন,—"একলক্ষ টাকার কিছু উপর।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"যাহাই হউক, যদি দাম সুস্থির করিয়া [illegible] বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে দুই একদিন সময়ের আবশ্যক।"

রাজা বলিলেন,—"অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া কোন ফল নাই। আপনি আমাকে [illegible] একটা মূল্য স্থির করুন না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহাতে আপনার ক্ষতি হইতে পারে।"

রাজা বলিলেন,—"আমার তাহাতে কিছু যায় আইসে না। আমার যখন এই সকল সামগ্রীতে আর প্রয়োজন নাই। তখন কিছু টাকা অধিক অধিক হইলে আমি অনিষ্ট বোধ করিব না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহা হইলে রাজা মহাশয়, আমি এইসকল অলঙ্কার দ্বারা আমাদের পাওনা শোধ করিতে পারি?"

রাজা সবিনয়ে বলিলেন,—"বেশ কথা। এবিষয়ে কিন্তু আমার একটু ভিক্ষা আছে। আপনি আমার যত সামগ্রী ক্রয় করিয়াছেন, কিছুতেই কোন প্রার্থনা করি নাই। কেবল কাতরভাবে এই শেষ সামগ্রীগুলিতে আমি যৎ-সামান্য বেশী টাকা চাহিতেছি।"

জীবন বাবু বলিলেন,—কি বেশী চাহেন, আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন,—"দয়া করিয়া এক হাজার টাকা বেশী দিতে হইবে। আপনাদের পাওনা পঞ্চাশ হাজার কাটিয়া লউন, একহাজার টাকা আমাকে দান করিয়া উপকৃত করুন।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি অলঙ্কার লইয়া যাই। এখনই একজন লোক দিয়া একহাজার টাকা পাঠাইয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার কষ্ট করিয়া লোক পাঠাইতে হইবে না। আমি আপনার সঙ্গে লোক দিতেছি। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি এই বাবুর সঙ্গে যান। এখনই আপনার প্রাপ্য হাজার টাকা এই বাবুর নিকট পাইবেন। নমস্কার হই। আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"আমাকেও ক্ষমা করিবেন; আমিও জন্মের মত নমস্কার হই দাদা। আপনি আজি আমার প্রাণে যে শেল বিঁধিয়া চলিলেন, তাহাতে প্রার্থনা করি আর যেন কখন আমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হয়।"

দুইজন বেহারা বাক্সগুলি উঠাইয়া লইল। জীবন বাবু ও পশ্চাতে রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন। রাজা বলিলেন,—"গহনাগুলা লইয়া কি করিব, এজন্য বড় ভাবনা হইয়াছিল খুড়া মহাশয়! এক্ষণে সে গুলা ভাল কাজেই লাগিয়া গেল, ইহা আমার সৌভাগ্য। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। দামী কাপড় চোপড়, শাল রুমাল প্রভৃতি

সামগ্রী পূর্ব্বেই বিক্রয় করা হইয়াছে। কেবল এই বোঝাগুলার গতি কি হইবে ভাবিয়া চিন্তিত ছিলাম। আজি ঋণ ঘুচিবার জন্ত ওগুলা লাগায় বড় আনন্দের বিষয় হইল।”

সকল লোক অধোমুখ। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। চণ্ডীচরণ উঠিয়া রাজার নিকটস্থ হইলেন, এবং বলিলেন, “বাবাজি, এ পাপ মুখ আর তোমার ন্যায় মহাত্মাকে দেখাইব না। যাহার রাজা এরূপ নির্দ্দয়, অমানুষ, অকৃতজ্ঞ, তাহার বাঁচিয়া কি ফল? অভাবে আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।”

রাজা বলিলেন,—“চণ্ডীখুড়া, কেন আপনি এরূপ মনে করিতেছেন? আপনার রাজা, নিতান্ত অন্যায় কাজ কিছুই করেন নাই। এই সময়ে এরূপ করিয়া না লইলে বাস্তবিক উনি আর কিছুই পাইতেন না। ছেলেপিলে লইয়া ব্রাহ্মণকে হয়তো শেষ জীবনে কষ্ট পাইতে হইত। উনি বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। আপনি এজন্য দুঃখিত হইবেন না।”

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—“তুমি দেবতা, তাই এরূপ ব্যবহারের মধ্যেও ভাল দেখিতেছ। আমার কিন্তু লজ্জায় বিশেষ কষ্ট হইতেছে।”

রাজা বলিলেন,—“সে কথা আপনি মনে করিবেন না। এক্ষণে সায়ংসন্ধ্যার সময় হইয়া আসিল। আপ-

নারা সকলে কৃপা করিয়া আমাকে বিদায় দিন। খুড়া মহাশয়, আপনার চরণে প্রণাম করি, চণ্ডীখুড়া প্রণাম করি, নবীনকৃষ্ণ ভাই নমস্কার করিতেছি; রামহরি ভাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি সুখে থাকিবে; জরিফ, সেলাম করি। কালিকার কথা আজি বলা যায় না। ঈশ্বর কখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটাইবেন, তাহা কে জানে? তাই তোমাদের সকলের নিকট আমি বিদায় লইয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতে যাইতেছি।"

রাজা প্রস্থান করিলেন। জরিফ রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"হুজুর, রাজা সাহেবের কথাগুলাতো ভাল নয়।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"কি করিব বল। জানি না ভগবানের মনে আরও কি আছে।"

চণ্ডীচরণ আপন মনে বলিলেন,—"রাজা এমন করিয়া প্রস্থান করিলেন কেমন, কেমন প্রাণ কেমন করিতেছে। আজি আর আহারনিদ্রা নাই; এখানেই বসিয়া থাকিব।"

নানারূপ কল্পনা করিতে করিতে কাহারও কোথায় যাওয়া হইল না। সুহাসিনীর বিশেষ মনশ্চাঞ্চল্য ও কাতরতা হেতু কেবল নবীনকৃষ্ণ বাটী গমন করিলেন। কাহারও আহার নিদ্রা হইল না। বড় উৎকণ্ঠায় রাত্রি কাটিয়া গেল। অতি প্রত্যূষে অতি ব্যস্তভাবে ভব এক

পত্র হস্তে বাহিরে আসিয়া বলিল,—"বাবা ঠাকুর, কি হইল? রাজা রাণী কোথায়?"

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রায় বাহাদুর ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসিলেন,—"কাহারও দেখিতে পাইতেছ না?"

তব সঙ্গল নয়নে বলিল,—"না। শোবার ঘর খালি, বিছানার উপর এই পত্র। কি হবে বাবা ঠাকুর?"

রায় বাহাদুর পত্র লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই উদ্দেশে পত্র লিখিত। তিনি সত্বর আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—

"শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণামান্তে নিবেদন,—

খুড়া মহাশয়, আমার পত্নীকে লইয়া গভীর রাত্রিতে আমি এ স্থান ত্যাগ করিলাম। আপনার শ্রীচরণে সকল কথা নিবেদন না করিয়া গেলাম আমার অপরাধ হইয়াছে! কিন্তু সকল কথা বলিতে হইলে আসা ঘটিত কি না সন্দেহ।

আমার এরূপে আগমন ভিন্ন অন্য না। নিতান্ত দরিদ্র অবস্থার রাজ অট্টা বেষ্টিত হইয়া বাস করা অসঙ্গত। এ জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করাও অসম্ভব প্রস্থান করিতে হইল।

আপনি বোধ হয় সত্বর কাশীযাত্রা

অসম্ভব না হয় তাহা হইলে চণ্ডী খুড়াকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

ভবদিদি, দাসীদিদি ও রামহরিকে বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন।

সুহাসিনী বড়ই শোকাতুরা। তাঁহাকে ও নবীনকৃষ্ণকে শান্ত করিবেন। জরিফ ও অন্যান্য আত্মীয় অনুগত ব্যক্তিগণকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইবেন।

একটা স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া এবং জীবিকার একটা উপায় করিয়া আপনাদের সকলকে সংবাদ দিব।

আমাকে ক্ষমা করিবেন। অন্যান্য সকলকেও ক্ষমা করিতে বলিবেন। চণ্ডীখুড়াকে আমার প্রণাম জানাইবেন। ইতি—

প্রণত সেবক

৮৬. শ্রীউমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।"

প্রস্থান করিলে... বাহাদুরের চক্ষু দিয়া জল পড়িল। আজি আর আ রোদন করিতে লাগিলেন। জরিফ থাকিব।" মুছিতে লাগিল। রামহরি কাঁদিয়া

নানারূপ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটীর যাওয়া হইল না। অন্তঃপুরে একটা ক্রন্দন কোলাহল কাতরতা হেতু কে

কাহারও আহার কি

কাটিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা।

দশম খণ্ড—নির্ব্বেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদ।

নীলরতন বাবু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সেই ক্ষুদ্র গৃহে শ্যামলাল অবস্থান করিতেছেন। গৃহের সাজ সরঞ্জাম কিছুই বাড়ে নাই; সেই খড়ের বিছানা ও গঙ্গাজল পূর্ণ মৃৎভাণ্ড ব্যতীত, সেখানে আর কিছুই নাই।

বিধুমুখীর ভয়ে এ স্থান হইতে শ্যামলাল সে দিন পলাতক হইয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বিধুমুখীও গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর ঘনানন্দের আশ্রম সন্নিধানে একদিন বিধুমুখীর সহিত শ্যামলালের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিধুমুখী উন্মাদিনী হইয়াছেন। তাঁহার রোগ অতি বিচিত্র। তাঁহার উন্মাদে লজ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে, ধীরতা আছে, বাক্য আছে, রোদন আছে, হাস্য আছে। তাঁহার উন্মাদে অত্যাচার নাই, দৌরাত্ম্য নাই, যুক্তি নাই, বিচার নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। উন্মাদিনী নবীনার রূপ গিয়াছে, শোভা গিয়াছে, শক্তি গিয়াছে, ধৈর্য্য গিয়াছে; কিন্তু অভাগিনীর স্মৃতি যায় নাই।

শ্যামলাল আপনার ঘরে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কেন বিধুমুখীর এমন হইল? পাপ তো অনেকেই করে, কাহারও তো এমন দুর্দ্দশা হয় না। আমি তো পাপের শেষ রাখি নাই, আমার তো কোন দুর্দ্দশাই ঘটে নাই। অভাগিনী বিধুমুখীর উপর বিধাতার এ নিগ্রহ কেন?

পাপের জ্বালায় বিধুমুখী যেমন জ্বলিতেছে এমন আর বুঝি কাহারও ঘটে না। বিধুমুখী পাপ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পাপে মজিতে পারে নাই; পাপের রঙ্গ বিধুমুখীর সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রাণে লাগে নাই। বিধুমুখী পাপের সমোবরে ভাসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ডুবিতে পারে নাই। সেই জন্যই তাহার এই কষ্ট। যাহারা পূর্ণভাবে পাপী, পাপ যাহাদের অস্থি-মজ্জায় মিশিয়াছে, পাপ যাহাদের অবিচ্ছিন্ন সহচর ও জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ, তাহাদের পাপজনিত যন্ত্রণাবোধ তিরোহিত হইয়া যায়, পাপে তাহারা তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করে, পাপের অনুষ্ঠান তাহারা গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে। বিধুমুখীর তাহা হয় নাই; সেই জন্যই বুঝি তাহাকে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে।

এই বিষম যাতনার তাড়নায় তাহার মস্তিষ্ক বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এই পাপের কঠোর পেষণে তাহার বুদ্ধি-শক্তি নষ্ট হইয়াছে। অনুতাপের উৎকট

সনে সে উন্মাদিনী হইয়াছে। তাহার অবস্থা এখন শোচনীয়।

শ্যামলাল ভাবিতেছেন, বিধুমুখী এখন দয়ার পাত্রী। তাহার অপরাধ হেতু কোন দিন তাহার উপর আমার ক্রোধ ছিল না। সে আমার সম্বন্ধে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া কখনই আমার মনে হয় নাই। আমি তাহার কোন ব্যবহারেই বিরক্ত হই নাই। এখন যে শান্তিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, যে আকাঙ্ক্ষা বিহীনতা হেতু তৃপ্তি আমি অনুভব করিতেছি, বিধুমুখীই তাহার কারণ। বিরাগ দূরে থাকুক, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকাই আমার কর্তব্য। আমি বিধুমুখীকে ভক্তি করি, পাপীয়সী বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করিবার কোন কারণই আমি দেখিতে পাই না।

কি করিলে বিধুমুখীর এ যন্ত্রণা বিদূরিত হয়? তাহার এ বিষম দুরবস্থা অপনোদনের কোন ঔষধ আছে কি? বিধুমুখী আমার কৃপা চাহে? আমি তাহাকে কি কৃপা করিব? কি কৃপা আমি করিতে পারি? কোন নারীকে সঙ্গিনী করিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। কাহারও প্রতি আমার মমতা নাই। কাহারও বিচ্ছেদে আমার কষ্ট নাই। কাহাকেও পাইবার জন্য আমার আকিঞ্চন নাই। তবে আমি তাহাকে কি অনুগ্রহ করিব? আমিতো তাহাকে নিগ্রহ করি না।

তথাপি বিধুমুখীর এই দারুণ দুর্দ্দশা যদি আমার চেষ্টায় অবগত হয়, তাহার উপায় করা আমার কর্ত্তব্য কি করা উচিত? কি করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বিধুমুখীকে আর কোথাও যাইতে দিব না, তাহাকে সময় মত আহার করাইব, তাহাকে ঔষধ সেবন করাইব, তাহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। এ সকলই তো আমি করিতে পারি। কেন তাহা না করিব? পীড়িতার শুশ্রূষা করাও একটা পরম প্রীতিজনক ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম কেন না করিব?

আমি তো ঘোর পাপী; আমার পাপের স্মরণেও পাপ হয়; তথাপি পরম পুণ্যাত্মা পুরুষেরাও তো আমাকে দয়া করিয়া থাকেন; সংসারের অনেক লোকই তো আমার প্রতি কৃপাবান্। দয়া ও ক্ষমাই মহতের লক্ষণ। বিধুমুখী কেন ক্ষমা লাভ করিবে না? কেন সে দয়া ভোগ করিবে না? বিধুমুখী আমার কোন অপকার করিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না, বরং তাহা দ্বারা আমার প্রকারান্তরে ইষ্টই হইয়াছে। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য, তাহাকে যত্ন করিতে আমি বাধ্য।

শ্যামলাল যখন এইরূপ চিন্তামগ্ন, তখন তাহার প্রকোষ্ঠের দ্বারে মধুমাখা কোমল নারী-কণ্ঠে সঙ্গীত উঠিল,

"সে বাঁশী বাজে আর কই ?
যমুনার কুলে, কদম্বের মূলে,
যে বাঁশী বেজেছে সই,
সে বাঁশী বাজে আর কই ?"

শ্যামলাল বাক্তাকে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে মলিন বেশা, শীর্ণকায়া, রুক্ষকেশা এক রমণী আপন মনে এই মোহময় সংগীত-সুধা বর্ষণ করিতেছেন।

এই কি সেই বিধুমুখী ? কে বলিবে যে এই নারী সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যোজ্জ্বল-কলেবরা, সুষমাময়ী বিধুমুখী! কিন্তু এই সেই নারীই, সেই ভুবনমোহিনী।

শ্যামলাল ডাকিলেন,—"বিধুমুখী, ভিতরে আইস।"

বিধুমুখী মৃদুস্বরে বলিলেন,—"না না, ভিতরে কেন ? যত বাহিরে থাকা যায় ততই ভাল। তুমি কে ? তুমিই তো সেই শ্যামরায়। তুমি কি এখন বাঁশী বাজাইতে ভুলিয়া গিয়াছ ?"

সে বাঁশী বাজে আর কই ?
শুনি যার গান, আকুল পরাণ, ত্যজি কুলমান
পাগলিনী মোরা হই॥
সে বাঁশী আবার বাজিল কই ?"

সেই সুধামাখা কণ্ঠে সংগীতের সুমধুর লহরী-লীলা ! এমন সুমধুর সংগীত আর কখন কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে

বলিয়া শ্যামলালের মনে হইল না। গীত ধ্বনি শেষ হইলে শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধুমুখী, ভিতরে আইস! তোমাকে অনেক কথা বলিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"কথায় কাজ নাই। কথা শেষ হইয়াছে। চল, ঘরে যাই। তুমি বলিতে পার, কেন বাঁশী থামিয়া গেল?"

বিধুমুখী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্যামলাল তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন। বলিলেন,—"বিধুমুখী, বইস।"

বিধুমুখী সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"বসিয়া, শুইয়া, ভাবিয়া, কাঁদিয়া দিন গেল; কিন্তু কাজ কিছুই হইল না। না হয়, না হউক; এখন বাঁশী থামিল কেন, তুমি বলিতে পার?"

"শরৎ রজনী প্রফুল্ল মেদিনী, কল প্রবাহিণী,
যমুনা বহিছে অই।
সেই বৃন্দাবন, সেই সে কানন, সখাসখীগণ,
বাঁশী রব তবে কই?"

সেই মধুর সংগীত ক্ষান্ত হইলে, শ্যামলাল বলিলেন,—"বাঁশী আবার বাজিবে। বিধুমুখী তুমি স্থির হও, বাঁশী আবার বাজিবে।"

বিধুমুখী হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন,—"না না, বাঁশী আর কি বাজে? তুমি বুঝি কিছুই জান না?

মদন মোহন, মুরলী বাদন, ছাড়া বৃন্দাবন,
নাহি তথা রাই রসময়ী।
তাই সেই বাঁশী, বাজিতে উদাসী, আশাজলে ভাসি
(শুধু) কাণ পাতি মোরা রই॥"

আবার সেই হৃদয়-দ্রব-কর সুমধুর সংগীত ক্ষান্ত হইল। শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি স্থির হও বিধুমুখী, আমি তোমাকে বাঁশী শুনাইব। একটু ধৈর্য্য ধর, আমার কথা শুন, তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি যাহা চাও তাহাই পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছ—স্থির হইতে বলিতেছ—বৃথা এ প্রবোধ

"বাঁশী বাজিল না আর,
কত কাল হ'ল, সকল তেয়াগি, রাখিণু পরাণ,
শুনিতে বাঁশীর গান।
ফুরাইল আশা, যায় এ জীবন, না পশিল কাণে,
সেই সুধাময় তান॥
বাঁশী বাজিল না আর।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি হৃদয় বৃন্দাবন অন্বেষণ কর, বিধুমুখী। সেখানেই রাধাশ্যাম বিরাজ করিতেছেন, সেখানে নিরন্ত বাঁশী বাজিতেছে। কাণ পাতিয়া শুন।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না না, মিথ্যা কথা বলিও না। আমার হৃদয়ে কিছু নাই—কেবল ফাঁক—শূন্য। তুমি

মিথ্যা কথা বলিয়া ফাঁকি দিতেছ কেন? শ্যামরায় বড় নিষ্ঠুর। নয়নের জল, হাহাকার, প্রাণত্যাগ কিছুতেই তাহার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয় না। সে কেন এমন কঠিন হইল বলিতে পার? কিসে তাহার দয়া হয় জান? যাহার জন্য লোকে মরে, সে কেন দয়া করিতে জানে না? আচ্ছা—আচ্ছা কত দিনে তাহার দয়া হয়, তাহা আমি না দেখিয়া ছাড়িব না। কাঁদিব, ছটফট করিব, হাহাকার করিব, তথাপি মরিব না।

"বাঁশী বাজিল না আর।
বাজিবে আশায়, থাকিব বাঁচিয়া, দেখিব কতই
নিঠুর পরাণ তার॥
তবু—বাঁশী বাজিল না আর।"

শ্যামলাল বলিলেন,—বিধুমুখী, তুমি ভুল বুঝিতেছ। ভক্তি থাকিলে, প্রাণের একাগ্রতা হইলে, মন তদ্গত হইলে, বাঁশীর তান শুনিতে পাওয়া যায়। তুমি প্রাণকে স্থির কর, হতাশ হইও না। নিশ্চয়ই বাঁশী শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"সত্য বলিতেছ? সত্যই বলিতেছ বই কি! তবে বাঁশী শুনিতে পাইব? শুনিতে পাইতেছি কই?"

পাগলিনী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্যামলাল উন্মাদিনীর নিকটে গিয়া বলিলেন,—"বিধুমুখী, স্থির হও! কাঁদিলে যে বাঁশী বাজায় সে দুঃখিত হইয়া চলিয়া যাইবে।

তুমি মন স্থির কর, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বাঁশী শুনাইব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তবে না হয় আর কাঁদিব না। তুমি বাঁশী শুনাও।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"শুনাইব, তুমি কিছু আহার করিবে কি?"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আহার—অনেক দিন, অনেক আহার করিয়াছি। আহার করিলে বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায় না। আহার না করিয়া দেখিব, বাঁশী শুনা যায় কি না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"না, তোমাকে কিছু আহার করিতে হইবে। আমি তোমাকে স্নান করাইয়া দিব, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া দিব, কিছু আহার করাইব, তাহার পর বাঁশী শুনিবার উপায় করিয়া দিব। যে বাঁশী বাজায় সে অপরিষ্কার, মলিন, বেশভূষাহীন, কদাকার লোককে ভাল বাসে না; তাহাদের বাঁশী শুনাইতে চাহে না। তুমি আমার কথা শুন, বাঁশী শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"এ কথা সম্ভব বটে। তবে তুমি আমাকে পরিষ্কার করিয়া দাও।"

শ্যামলাল বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, তিনি বিধুমুখীর শুশ্রূষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু তাহার উপায়

কি ? তাঁহার তৈল নাই, বস্ত্র নাই, জল নাই, খাদ্য নাই, পয়সা নাই, পীড়িতার শুশ্রূষা করেন কি প্রকারে ! হঠাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িল। বিধুমুখীর আগমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একদল বঙ্গদেশীয় যাত্রী কাশী পরিভ্রমণ করিতে করিতে, ক্লান্তি দূর করিবার অভিপ্রায়ে, শ্যামলালের আশ্রম সন্নিধানে বসিয়াছিল। শ্যামলালের সহিত তাহাদের অনেক কথা হইয়াছিল এবং তাহারা হয় ভিক্ষুক বা দুঃখী মনে করিয়াই হউক, অথবা জ্ঞানবান্ সন্ন্যাসী মনে করিয়াই হউক, শ্যামলালকে একটী সিকি দিয়া প্রণাম করিয়াছিল। শ্যামলাল সেই সিকি ফিরাইয়া লইবার জন্য বার বার তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহারা কোন মতেই তাহা গ্রহণ করে নাই। শ্যামলালও তাহা স্পর্শ করেন নাই ; মনে করিয়াছিলেন, কোন ভিক্ষুককে তাহা তুলিয়া লইতে বলিবেন। এক্ষণে দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ভিক্ষুক হইতে হইল। তিনি সেই সিকি তুলিয়া লইলেন। তাহার পর বিধুমুখীকে বলিলেন,— "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি বাঁশীওয়ালাকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।"

বিধুমুখী তখন ধীরে ধীরে হাততালি দিতে দিতে মৃদুস্বরে একটা গান গাহিতেছিলেন। তিনি শ্যামলালের কথা শুনিলেন না, তাঁহার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না।

শ্যামলাল অতি দ্রুত ভাবে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্বালা।

অতি অল্পকাল পরে শ্যামলাল এক কলসী জল, এক খুরি তৈল, কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী লইয়া প্রত্যাগত হইলেন। বিধুমুখী তখনও পূর্ব্বাবস্থায় আসীনা, হাস্যমুখী এবং সংগীত-নিমগ্না।

শ্যামলাল আসিয়াই বিধুমুখীর মাথায় খানিকটা তেল ঢালিয়া দিলেন এবং হাত দিয়া তাহা বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন। তখন বিধুমুখী মুখ ফিরাইয়া শ্যামলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বলিলেন,—শ্যামরায় নিষ্ঠুর নহেন। যে বলে তিনি নিষ্ঠুর, সে মিথ্যাবাদী। তোমার অতিশয় দয়া। তবে তুমি বাঁশী বাজাও না কেন?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমি তোমাকে বলিয়াছি, বাঁশী আবার বাজিবে। তুমি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিলেই বাঁশী শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"চুপ করিয়াই তো আছি। কত কাল চুপ করিয়া থাকিব? আর যে থাকা যায় না। এখন ঝগড়া না করিলে চলিতেছে না।"

শ্যামলাল তৈল মাথাইয়া, বিধুমুখীর মাথায় ভাঙে করিয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর আপনার গামছা দিয়া বিধুমুখীর গা মুছাইয়া দিলেন। তাহার পর স্বয়ং সেই ভিজা গামছা পরিয়া আপনার কাপড়খানি বিধুমুখীকে পরিতে দিলেন। বিধুমুখী কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না।

তখন শ্যামলাল বলিলেন,—"তবে বাঁশীওয়ালা আর আসিবে না। সে আসিতেছিল, অনেক দূর আসিয়াছিল। তুমি কথা শুনিতেছ না বলিয়া ঐ চলিয়া যাইতেছে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না না, তাহাকে দাঁড়াইতে বল, আসিতে বল, আমি সব কথা শুনিব।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন হইলে শ্যামলাল বলিলেন,—"একটু খাও—তোমার জন্য খাবার আনিয়াছি—একটু খাও।"

বিধুমুখী বলিলেন—"খাব? কেন? অনেক খাই-য়াছি, আবার কি খাইব? আমি আজি অমৃত খাইতেছি। তুমি কখন অমৃত খাইয়াছ কি? তুমি মেয়ে মানুষের পায়ের লাথি খাইয়াছ। ছিঃ ছিঃ! তুমি আবার মানুষ! অমৃত খাওয়া তোমার কপালে ঘটে কি? তুমি যে কিছুই জান না। লাথি মারিলে অমৃত খাইতে পাওয়া যায়, ইহা তুমি জান কি? তাহা জানিলে এত দিন কত লাথি তুমি মারিতে। মার না, লাথি মার না! এঃ, তুমি কিছুই পার না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তোমাকে এখন কিছু আহার করিতেই হইবে। কথা না শুনিলে আমি বাশীওয়ালাকে তাড়াইয়া দিব।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"না না, তাহাকে তাড়াইয়া দিলে আমি মরিয়া যাইব। ডাক তাহাকে, শীঘ্র ডাক। কই কি খাইতে দিবে দেও।"

শ্যামলাল তখন একখানি বরফি লইয়া বিধুমুখীর হাতে দিলেন। বিধুমুখী বলিলেন,—"সত্যই তুমি কিছুই জান না। অমনই কিছু খাইতে আছে কি? প্রসাদ খাইতে হয়। তুমি প্রসাদ করিয়া দেও, নাইলে খাইব কেন? তুমি এত বোকা না হইলে নাথি খাইতে পার, নাথি মারিতে পার না। প্রসাদ করিতে জান না?"

তখন বিধুমুখী একখানি বরফি লইয়া সহসা শ্যামলালের মুখে ধরিলেন। শ্যামলাল অগত্যা তাহার কিয়দংশ ভোজন করিলেন। বিধুমুখী সেই ভুক্তাবশিষ্ট বরফি খণ্ড আপনার মুখে ফেলিয়া দিলেন এবং অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত গান ধরিলেন,—

"বাশী বাজিল আবার।
সে ধীর সমীরে, যমুনার তীরে, বাশী অতি ধীরে
ছাড়িল মধুর তান।

নীরব যমুনা, ধীরে বহে বায়ু, নিস্তব্ধ বিহঙ্গ,
পুলকে পূরিল প্রাণ॥
বাঁশী বাজিল আবার।"

শ্যামলাল দেখিলেন, আনন্দে উন্মাদিনীর শরীর কণ্টকিত হইয়াছে এবং মোহাবেশে তাহার নয়ন মুকুলিত হইয়াছে। শ্যামলাল বলিলেন,—"আর কিছু খাও, আর একটু খাইলে আরও ভাল করিয়া বাঁশীর গান শুনিতে পাইবে।"

বিধুমুখী অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলিলেন,—"আঃ! কথা কহিতেছ কেন? চুপ করিয়া বাঁশী শুন এখন।"

বাঁশী বাজিল আবার।
শুন স্থির মনে, নড়িও না কেহ, রহ সাবধানে,
বাজিছে শ্যামের বাঁশী।
উথলে যমুনা, হাসিছে চাঁদিমা, বিহ্বল অবনী,
বাঁশী ঢালে সুধারাশি॥
পশুপাখী আদি, বৃক্ষলতা সব, অবশ হইয়ে,
শুনিছে বাঁশীর ধ্বনি।
হাসায় কাঁদায়, প্রাণ কাড়ি লয়, সবে ক্ষিপ্ত হয়,
মোহময় বাঁশী শুনি॥
বাঁশী বাজিল আবার।"

শ্যামলাল দেখিলেন বিধুমুখী যেন নিদ্রাবেশে ঢলিয়া

পড়িতেছেন। তিনি ডাকিয়া বলিলেন,—"বিধুমুখী, তুমি আর কিছু না খাইলে, বাঁশীওয়ালা চলিয়া যাইবে বলিতেছে। তাহা হইলে এমন সুধাময় বাঁশীর রব তুমি আর শুনিতে পাইবে না।"

তখন সেই উন্মাদিনী অবশ শরীরে শ্যামলালের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। শ্যামলাল জানিতেন, উন্মাদ রোগে, নিদ্রা বড় হিতজনক। অতএব বিধুমুখীর নিদ্রার ব্যাঘাত করা অবিধেয় বোধে, তিনি আর কোন কথা কহিলেন না; একটু নড়িয়া বসিলে, পাছে বিধুমুখীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায়, তিনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। শ্যামলালের দেহে দেহ স্থাপন করিয়া বিধুমুখী গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন।

এইরূপ সময়ে সেই গৃহ-দ্বারে নীলরতন বাবুর মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল। শ্যামলাল তাঁহাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। নীলরতন বাবু নিকটে আসিলে, পাছে বিধুমুখীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায়, শ্যামলাল অতি মৃদুস্বরে সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া দিলেন। সমস্ত শুনিয়া নীলরতন বলিলেন,—"এক্ষণে ইহার শুশ্রূষার জন্য অর্থ চাই, নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাই, লোকও চাই। আমাকে অনুমতি করুন, আমি সকলই পাঠাইয়া দিই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"জানি না, ভগবানের কি

বাসনা। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমাদের সাবধানতা বা ব্যবস্থা অনর্থক। একটা রুগ্ন স্ত্রীলোকের সেবায় আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে, ইহা আমি জানিতাম না। নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী আমাকে আহরণ করিতে হইবে, ইহা আমি একবারও ভাবি নাই। কাহারও জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে, ইহা আমি কখন মনে করি নাই। কিন্তু এই নিঃসহায় নারীর যত্ন করা তো ধর্ম্ম। আমি কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই ভার গ্রহণ করিয়াছি। এ ভার আমি ছাড়িতে পারিব না। পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত আমাকে বিধুমুখীর জন্য নানা প্রকারে ব্যস্ত হইতে হইল। ইহাই বোধ হয় ভগবানের বাসনা।”

নীলরতন বলিলেন,—“তাহা হইলে আপাততঃ কি কি পাঠাইব? কোন্ কোন্ সামগ্রীর এখনই প্রয়োজন হইবে?”

শ্যামলাল নানাপ্রকার আশু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর নাম করিয়া বলিলেন—“মহাশয় সবই জানেন। এ অবস্থায় যে যে সামগ্রীর আবশ্যক হইবে, আপনি তাহা বুঝিয়া পাঠাইবেন। আমি আর কি বলিব? আমি বহুদিন আপনার কৃপায় ভিক্ষা করার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু এখন আমাকে এই পীড়িতা নারীর জন্য আবার ভিক্ষা করিতে হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া আমার প্রতি কৃপা করিবেন; অধমকে আবশ্যক

মত জিনিষ-পত্র ও কিঞ্চিৎ অর্থ ভিক্ষা দিবেন; আর সময়ে সময়ে আমার সন্ধান করিবেন।"

নীলরতন বাবু বলিলেন,—"এজন্য আপনি এরূপভাবে কথা কহিতেছেন কেন? আপনার সকল প্রয়োজনে সাহায্য করিতে আমরা সদা প্রস্তুত। আপনি কোন উপকারই গ্রহণ করেন না, ইহাই আমাদের দুঃখ। আমি এখনই জিনিষ-পত্র পাঠাইয়া দিতেছি; টাকা লইয়া শীঘ্রই স্বয়ং আসিতেছি। আমি বার বার সংবাদ লইব, এ কথা বলাই বাহুল্য।"

নীলরতন বাবু প্রস্থান করিলেন। অনতিকাল পরে বিধুমুখীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শ্যামলালের দেহ হইতে আপনার দেহ উঠাইয়া বলিলেন,—"বাঁশী সমান বাজিতেছে। বাঁশী শুনিতে শুনিতে আমি বিহ্বল হইয়াছি? যে বাঁশী বাজাইতেছে, তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাহাকে তুমি কখন দেখিয়াছ কি? বোধ হয় তাহার মত সুন্দর ত্রিভুবনে আর কিছুই নাই।

"বাঁশী বাজিল আবার, না জানি সে কে
যাহার বাশরী, ছা[illegible]পের নিধি।
[illegible]হেরিতে তাঁহায়, যদি দিয়াছেন
চল যাই [illegible] দয়া করি আঁখি বিধি॥
বাঁশী বাজিল আবার॥"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি যদি আমার কথা শুন, তাহা হইলে সেই রূপের নিধিকে দেখিতে পাইবে।"

বিধুমুখী সাগ্রহে বলিলেন,—"দেখিতে পাইব? তোমার কথা শুনিব বই কি। তোমার বড় দয়া। তোমার কথা শুনিব না? বল, কি কথা শুনিতে হইবে?"

শ্যামলাল বলিলেন,—"তুমি আর কিছু আহার কর, তাহা হইলেই যে বাঁশী বাজাইতেছে তাহাকে দেখিতে পাইবে।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"আবার আহার কেন? আমি দেবতার প্রসাদ খাইয়া অমর হইয়াছি। আবার আহার করিব কেন? আহারে তো আর প্রয়োজন নাই।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"কথা না শুনিলে, যে বাঁশী বাজায় সে বড় দুঃখ করে, অভিমান করে। তাহাকে দুঃখিত করা উচিত কি?"

বিধুমুখী [illegible] একটু করা যায়? প্রাণ দিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার [illegible] কিন্তু সে দুঃখ করিবে, [illegible]স বদন দেখিতে পারা যায় না। [illegible] এ কথা তুমি জানিলে কিরূপে? তুমি কি তা[illegible]মান করিবে, [illegible] আমাকে [illegible]ক চেন? তুমি কি তাহাকে দেখিতে পাও? [illegible] একবার দেখাইয়া দিতে পার?"

"শ্যামলাল বলিলেন,—"পারি। তুমি যদি আমার কথা শুন, তাহা হইলেই দেখাইবার উপায় করিতে পারি।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তোমার সহিত তাহার এত ঘনিষ্ঠতা! তুমি যাহা বলিবে তাহাই সে করিবে? তুমি তো খুব সুখী। তোমার সুখের একটু ভাগ দেও না।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার সুখের সমান ভাগ তোমাকে দিব, তুমি আমার কথা শুনিয়া কিছু আহার কর।"

বিধুমুখী বলিলেন,—"তুমি কেবল আহার আহার বল কেন? তোমার কি আর কোন কথা নাই? তোমার সহিত বাঁশীওয়ালার ভাব হইল কেন? বাঁশী-ওয়ালাকে প্রতিদিন তুমি দেখিতে পাও? বাঁশীওয়ালা কোথায় থাকে তুমি জান? আমাকে সেখানে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল না—দোহাই তোমার।"

বিধুমুখী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অগত্যা শ্যামলালকেও উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। হঠাৎ শ্যামলালের হাত ছাড়িয়া দিয়া বিধুমুখী একবার সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর বলিলেন,—"সে—সে বাঁশীওয়ালা তুমিই নও তো? তোমার হাতে হাত দিয়া আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল কেন? সোহাগে হৃদয় পূর্ণ হইল কেন? কি সুগন্ধ! কি দিব্যকান্তি! তুমিই সেই বাঁশীওয়ালা। তাই তুমি তাঁহাকে যখন ইচ্ছা তখন ডাকিতেছিলে; ইচ্ছা

সরাইয়া দিতেছিলে। তাই তুমি তাহার দুঃখ-অভিমানের জমাখরচ রাখিয়া থাক। সে তবে তুমি? হাঁ, তুমিই বাঁশীওয়ালা। আহা আহা কি রূপ! এত রূপ তোমার! আবার বাজাও—আরও বাজাও। আহা কি শুনাইলে! মরি মরি কি দেখাইলে! তোমার বাঁশী শুনিতে—তোমার রূপ দেখিতে যেন কখন বঞ্চিত হইতে না হয়। তোমার চরণে ধরি, আর ফাঁকি দিও না। দিবে? দিবে? তোমার পা ছাড়িব না।"

সহসা পাগলিনী ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন এবং কাতর ভাবে শ্যামলালের চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। শ্যামলাল তাঁহাকে আগ্রহ সহকারে উঠাইতে গিয়া দেখিল, ভাগিনী বিধুমুখীর চৈতন্য নাই।

অন্নপূর্ণা।

একাদশ খণ্ড—দারিদ্র্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরু মহাশয়।

বৰ্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে বনপুর নামে একটী নাতিবৃহৎ পল্লীগ্রাম আছে। গ্রামের পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার; অধিবাসিগণের বাসগৃহগুলি তৃণাচ্ছাদিত; কেবল জমিদারের পূজার দালান ও বসু বাবুদিগের বাটীর একাংশ পাকা। গ্রামে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই বাস আছে। বনপুরে, ইতর জাতীয় লোকের অপেক্ষা, ভদ্র অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বোধ হয়। গ্রামে বিশেষ ধনশালী লোকের বাস না থাকিলেও অনেকেরই গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে কোনই কষ্ট নাই। দোল-দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া-কর্ম্ম অনেকের বাটী-তেই হইয়া থাকে। অধিবাসীগণের অনেকেই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকাপাত করেন। অনেকে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, অনেকে কাহারও সহিত ভাগে চাষ করেন। প্রায় সকল লোকের বাটীতেই দুই চারিটা ধানের গোলা, বিচালীর পালা, গোশালা, অনেক গাই-বলদ দৃষ্ট হয়।

বনপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। তাঁহার বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে দেহ সুগঠিত ও বলশালী। নরসুন্দরের নিপুণতায় সপ্তাহে দুইবার করিয়া তাঁহার বদন শ্মশ্রু-গুম্ফ পরিশূন্য হইয়া থাকে। তাঁহার মস্তকের মধ্যদেশে এক স্থূল শিখা। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃষিকর্ম্ম আছে, কুড়িটা ধান্য-পূর্ণ বড় বড় গোলা আছে, ধান ধার দেওয়ার কার-বার আছে, আর জমিদারী আছে। সর্ব্বসমেত তাঁহার বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। এ আয় অন্যত্র সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বনপুরের জনগণের বিবেচনায় ইহা বিপুল। গ্রামের আর কোন লোকেরই আয় এত অধিক নহে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরহঙ্কার, শিষ্ট ও শান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার এক ভয়ানক দোষ, তিনি বড় একগুঁয়ে। ভাল হউক, মন্দ হউক, যে কথা তাঁহার মাথায় একবার প্রবেশ করিবে, তাহা তিনি কোন মতেই ছাড়িবেন না এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে বিরত হইবেন না। এরূপ লোক প্রায়ই বড় কাণপাৎলা হইয়া থাকে। কেহ কোন কথা একটু আগে গুছাইয়া বলিয়া রাখিলে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রায়ই তাহা অখণ্ডনীয় সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং নিতান্ত একগুঁয়েমি হেতু, পরে তদ্বিষয়ক অকাট্য বিরোধী প্রমাণেও কর্ণপাত করিতেন না। গ্রাম মধ্যে মাধব

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতাপ ও আধিপত্য অসাধারণ। গ্রামের জজ, মাজিষ্ট্রেট, থানা, পুলিস সকলই চক্রবর্ত্তী মহাশয়। সর্ব্বপ্রকার বিরোধই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা মীমাংসিত হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দয়ালু ও পরোপকারী। কাহাকেও নিতান্ত অক্ষম বুঝিলে তিনি তাহার নিকট প্রাপ্য ধান ছাড়িয়া দেন; কাহাকেও বিপন্ন বুঝিলে তিনি তাহার বিধিমতে সাহায্য করেন; কাহারও আপদ বিপদ হইলে তিনি তাহার বাটীতে যাতায়াত করিয়া সুব্যবস্থা করেন। তিনি এখনকার হিসাবে লেখা পড়া জানেন না। ইংরাজি পাঠ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। সামান্য সংস্কৃত তিনি পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালা লেখা পড়াও শিখিয়াছিলেন, তাঁহার হাতের বাঙ্গালা অক্ষর অতি সুন্দর। জমা খরচ বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়, জমিদারী কাগজ পত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ। বাঙ্গালা সংবাদ পত্রাদি তিনি পাঠ করিতেন। বাঙ্গালা পরিচিত গ্রন্থকারের পরিচিত পুস্তক মাত্রেই তিনি পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অনুবাদিত অনেক আইনগ্রন্থও তিনি দেখিয়াছেন।

তাঁহার বাটীতে দোল, দুর্গোৎসব, ইত্যাদি অনেক উৎসব হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে কোন আড়ম্বর হয় না, কিন্তু অনেক লোক জন আহার করে। চিরাগত সামাজিক নিয়ম পালনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিয়ত সচেষ্ট, কিন্তু ইহা তাঁহার জানা ছিল যে তিনি কোন নিয়মের

ব্যভিচার করিলে, সমাজের কোন লোক কোন কথা কহিতে সাহস করিবে না। স্বকীয় প্রভুতার বলে, স্বার্থ সাধনার্থ আবশ্যক হইলে, একগুঁয়েমি হেতু কখন কখন তিনি সামাজিক ব্যবস্থারও বিপর্য্যয় করিতে সাহসী হইতেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে কিছুদিন হইতে একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল আছে; কিন্তু তাহাতে বেশী বাঙ্গলা পড়া হয় না এবং দেশীয় প্রণালী ক্রমে অঙ্কাদি শিক্ষা হয় না। এজন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয় যত্ন করিয়া বাটীতে একটী পাঠশালা বসাইয়াছেন। পাঠশালায় অনেকগুলি ছাত্র জুটিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পূজার বাড়ীতে পাঠশালার স্থান হইয়াছে। দালানটী পাকা; তাহার সম্মুখে তৃণাচ্ছাদিত ও তাল বৃক্ষের খুঁটির উপর স্থাপিত এক্ অতি বৃহৎ আটচালা আছে। সেই স্থানেই পাঠশালা বসিয়া থাকে এক ব্রাহ্মণযুবা এই পাঠশালার গুরুমহাশয় হইয়াছেন। গুরুমহাশয় যেমন রূপবান্ তেমনই গুণবান্। তাঁহার শিক্ষাদানপদ্ধতি বড়ই বিচিত্র; গ্রামের লোক তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করে। ছাত্রগণ এই গুরুমহাশয়ের একান্ত অনুরাগী, এবং গ্রামের তাবৎ নরনারী তাঁহার পরমভক্ত।

গুরুমহাশয় কাহারও নিকট কোন বেতন গ্রহণ করেন না; ছাত্রদিগকেও কোন নিয়মিত বেতন দিতে হয় না। যে ছাত্র অনায়াসে যখন যাহা দিতে পারে, তিনি

তাহাই গ্রহণ করেন। অনেক ছাত্র কখনই কিছু দেয় না। যে কিছু দিতে পারে এবং যে কখনই কিছু দিতে পারে না, উভয়েই সমান আদরে ও সমান যত্নে শিক্ষালাভ করে। গুরুমহাশয় কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। প্রাপ্তির তারতম্য অনুসারে তাঁহার ছাত্রগণের প্রতি স্নেহ ও আগ্রহের কোন তারতম্য হয় না। কোন ছাত্র কোন মাসে দুই এক আনার অধিক বেতন দিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন না।

গুরুমহাশয় মিষ্টভাষী, হাস্যবদন ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। প্রাতে দুই ঘণ্টা ও বৈকালে তিন ঘণ্টা কাল তিনি পাঠশালায় ছাত্রদিগকে পাঠ দেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ও পরে, তিনি গ্রামে বাহির হইয়া গ্রামস্থ তাবতের তত্ত্বানুসন্ধান করেন। প্রয়োজন হইলে তিনি অতি প্রাতে আসিয়া কাহারও জন্য ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া আনেন, মধ্যাহ্নে আসিয়া কাহারও জন্য বাজার হইতে দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া আনিয়া দেন, রাত্রি জাগিয়া কোন পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষা করেন। এক বাটীতে একটী আত্মীয় স্বজন-শূন্য বৃদ্ধা বাস করেন। কাষ্ঠাভাবে তিনি আজি পাক করিতে পাইবেন না দেখিয়া, গুরুমহাশয়, কুঠার লইয়া তাঁহার কাষ্ঠ ছেদন করিয়া দিলেন। স্থানান্তরে এক ব্যক্তি জলাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া, গুরুমহাশয় নদী হইতে প্রকাণ্ড এক কলসী জল তুলিয়া আনিলেন। আর এক স্থানে এক

দরিদ্র বিমর্ষবদনে বসিয়া আছে দেখিয়া গুরুমহাশয় সহানুভূতিব্যঞ্জক মধুর হাসির সহিত মিশাইয়া গোপনে তাহার হাতে আটটী পয়সা দিয়া প্রস্থান করিলেন। বসুদের বাটীতে ছেলের অন্নপ্রাশন—বড় সমারোহ; গুরু-মহাশয় তাহার প্রধান কর্ত্তা—সকল ব্যবস্থাপক। রায়দের গৃহিণীর শেষকাল আগতপ্রায়। তাঁহাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিতে হইবে। আত্মীয়গণ গুরুমহাশয়ের অনুমতি ও ব্যবস্থার প্রতীক্ষা করিতেছেন। অল্প কালের মধ্যে নবা-গত গুরুমহাশয় গ্রামের যেন ইষ্ট দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে বালকেরা নৃত্য করে, প্রবীণগণ শুভদিন বলিয়া বোধ করে, নবীনাগণ দেবদর্শন হইল বলিয়া জ্ঞান করে, প্রবীণাগণ ভক্তিসহকারে প্রণাম করে। রামা চাঁড়ালের স্ত্রী গুরুমহাশয়ের দিদি, রামী গোয়ালিনী তাঁহার মাসী, হরা কলু তাঁহার খুড়া, সদী কৈবর্ত্তিনী তাঁহার জেঠাই মা, আনন্দ রায় তাঁহার দাদা, ভজহরি বসু তাঁহার বাবা ইত্যাদিক্রমে গ্রামের ইতর ও মহৎ সকল ব্যক্তির সহিত গুরুমহাশয় কোন না কোন সম্বন্ধে বদ্ধ।

গুরুমহাশয়ের কোথায় বাস, তাহা গ্রামের লোকে জানে না। গুরুমহাশয়কে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ভাল করিয়া বলিতে ইচ্ছা করেন না। গ্রামের লোকেরা সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা অবৈধ স্থির করি-

য়াছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের শুভাদৃষ্ট-ক্রমে এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবা বনপুরে শুভাগমন করিয়াছেন।

গুরুমহাশয় একাকী আইসেন নাই। সঙ্গে তাঁহার রূপে লক্ষ্মী ও গুণে সরস্বতী সমা পত্নী আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে গুরুমহাশয় এক সামান্য খড়ের ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন। সেই ঘর তাঁহার বাসস্থান। তিনি ও তাঁহার পত্নী একান্ত নির্লোভ। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও গ্রামের অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র উৎকৃষ্টতর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা দীনভাবে সামান্য স্থানে বাস করিয়াই পরিতৃপ্ত। সামান্য বস্ত্র ব্যবহারে ও শাকান্নমাত্র ভোজনেই তাঁহাদের পরম সন্তোষ। লোকের বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম্ম হইলে ব্রাহ্মণদ্বারা প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্য গুরুমহাশয়ের বাটীতে প্রেরিত হয়; কিন্তু গুরুমহাশয় ও তাঁহার পত্নী সেই খাদ্য দুঃখীদিগকে ডাকিয়া বিলাইয়া দেন। সাবিত্রী-ব্রত সমাপ্তি উপলক্ষে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহিণী গুরু-মহাশয়ের পত্নীর নিমিত্ত একখানি চেলীর কাপড় দিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের পত্নী সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিনও তাহা ব্যবহার করেন নাই। জগা কৈবর্ত্ত বড় গরীব; মেয়ের বিবাহে একখানি চেলী কিনিতে পারে নাই দেখিয়া, গুরুমহাশয়ের পত্নী চেলি-

খানি তাহাকে গোপনে দান করিয়াছিলেন, ঘোষালদিগের বাটীতে এয়োসংক্রান্তি ব্রতোপলক্ষে গুরুমহাশয়ের পত্নীকে একজোড়া রূপার বালা দেওয়া হইয়াছিল, তিনি সানন্দে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিনও তাহা ব্যবহার করেন নাই। শামী মালিনী বড় দুঃখিনী, মেয়ে শ্বশুর বাটী পাঠাইবার সময় সে পূর্ব্ব ব্যবহৃত রং উঠা শাঁখা ছাড়া মেয়ের হাতে একজোড়া চুড়িও কিনিয়া দিতে পারিল না। শামী মেয়ের গলা ধরিয়া কাঁদিতেছে। গুরুমহাশয়ের প্রসন্নবদনা পত্নী তথায় উপস্থিত হইয়া সাদরে রূপার বালা জোড়াটী শামীর মেয়ের হাতে পরাইয়া দিলেন।

বনপুরের লোকেরা গুরুমহাশয়ের নাম জানিত না। তিনি গুরুমহাশয় নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ও সমাদৃত। তাঁহার পত্নীকে নরনারী তাবতেই ঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিত।

গ্রামের লোক অনেক সময় একস্থানে দুইচারিজন মিলিত হইয়া গুরুমহাশয় ও তাঁহার পত্নীর অপূর্ব্ব চরিত্রের সমালোচনা করিত। তাহারা বুঝিতে পারিত না, এই নবাগত ব্রাহ্মণদম্পতী মানুষ কি দেবতা। গ্রামের লোক যাহাই বুঝুক, আমরা জানি এই গুরুমহাশয়ই রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নী রাণী অন্নপূর্ণা দেবী। কিন্তু তাঁহারা যখন প্রচ্ছন্ন পরিচয়ে বাস করিতেছেন, তখন আমরা তাঁহাদিগকে এই পরিচয়েই উল্লেখ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরাণী।

বৈশাখ মাস। মধ্যাহ্নকালে গুরুমহাশয় পাঠশালার কর্ম্ম, তদনন্তর গ্রামের কোন কোন লোকের সংবাদাদি গ্রহণ করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় আসিবার সময় পথে পার্শ্বস্থ এক দোকান হইতে তিনি কিছু চাউল, ডাইল, লবণ ও গুড় কিনিয়া আপনার উত্তরীয়ের স্থানে স্থানে বাঁধিয়া লইলেন। তিনি কুটীরে আসিবামাত্র এক সুরসুন্দরী যুবতী হাস্যমুখে তাঁহার সম্মুখে আসিলেন এবং ব্যস্ততাসহ বিবিধ সামগ্রীসহ তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সুন্দরী তাহার পর এক-খানি গামছা আনিয়া গুরুমহাশয়ের হস্তে দিলেন এবং একখানি তালবৃন্ত লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগি-লেন। সেই স্থানেই হস্তমুখাদি প্রক্ষালনার্থ জল এবং বসিবার নিমিত্ত একখানি দরমা পাতা ছিল। গুরুমহাশয় উপবেশন করিলেন, যুবতী মৃৎভাণ্ডস্থিত সেই জল ঢালিয়া গুরুমহাশয়ের চরণ ধৌত করিয়া দিলেন এবং স্বকীয় বস্ত্রাঞ্চল ও কেশরাশির দ্বারা চরণ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন।

তাহার পর তত্রত্য ভূপতিত পাদোদক কিঞ্চিন্মাত্র পান করিয়া এবং বক্ষে ও মস্তকে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন,—"একটু জল খাও।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কেন? তুমি আজি খুব বড় মানুষ হইয়াছ নাকি?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"বড় মানুষ আমি চিরদিনই আছি। আজি একটা নূতন জিনিষ ছিল, তাই খাইতে বলিতেছিলাম।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কি জিনিষ?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আজি রঙ্গিণী দিদি নিজে হাতে তৈয়ার করিয়া খানিকটা ক্ষীর দিয়া গিয়াছেন। ক্ষীর লইয়া তিনি স্বয়ং আসিয়াছিলেন। বার বার কাতর ভাবে তোমাকে একটু খাওয়াইবার জন্ত অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তুমি একটুও না খাইলে তিনি বড়ই দুঃখিত হইবেন। তুমি ক্ষীর খাইয়াছ কি না জানিবার নিমিত্ত তিনি আবার এখনই আসিবেন, বলিয়া গিয়াছেন।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"বুঝিতে পারিতেছি না, কি কর্ত্তব্য। এরূপ সময়ে আমিতো অন্ন ভিন্ন আর কিছুই আহার করি না। আমি এখন একবার ক্ষীর আবার কিছুকাল পরে ভাত খাওয়া উচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি না। তাহার পর যে সামগ্রী আমাদের নিত্য জুঠে না, এবং যাহার কোন প্রয়ো-

জন নাই, তাহা একদিন খাইবার আবশ্যক কি? কিন্তু রঙ্গিণী দেবী আমার আশ্রয়দাতা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এক মাত্র সন্তান; তিনি বিধবা, তিনি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া এবং স্বয়ং বহন করিয়া যে সামগ্রী আমাদের কুটিরে আনিয়া দিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করা নিষ্ঠুরতা, আমি কিঞ্চিৎ ক্ষীর খাইতে সম্মত হইলাম; কিন্তু এখন নহে, আহারের সঙ্গে একটু ক্ষীর খাইব।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছ। যে কোন সময়ে কিঞ্চিৎ আহার করিলেই তাঁহার সন্তোষের সীমা থাকিবে না।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কিন্তু তোমার কি বোধ হয় না, রঙ্গিণী দেবী পাঁচ সাত দিন হইতে আমাদের প্রতি একটু বেশী অনুগ্রহ করিতেছেন।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"হইতে পারে, তিনি আমাদিগের প্রতি ইদানীং অধিক অনুরাগ দেখাইতেছেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তাঁহার এত অনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই। তবে এত দয়া কেন? আপাততঃ তোমার পাক করিবার শুষ্ক কাষ্ঠ আছে কি?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"যাহা আছে তাহাতে এ বেলা কাজ চলিয়া যাইবে বোধ হয়। আর কথা কহিতে আমার সময় নাই, আমি রাঁধিতে যাই।"

সেই ক্ষুদ্র ঘরের পাশে আর একটু চালা লাগান

আছে। তাহার চারিদিকে বৃক্ষলতাদির শুষ্ক শাখাপ্রশাখা রচিত বেড়া, গমনাগমনের পথে একখানি ঝাঁপ। চাউলাদি সম্বলিত উত্তরীয় হস্তে লইয়া ঠাকুরাণী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আনীত দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিলেন। একটী দড়ির শিকায় দুইটী হাঁড়ি ঝুলিতেছিল, তাহাতেই পাক হয়। ঘরের এক দিকে একটী ক্ষুদ্র উনান আছে, আর এক দিকে একটু উচ্চ মৃত্তিকাস্তুপের উপরে অতিরিক্ত তণ্ডুলাদি প্রয়োজনীয় পদার্থ রাখিবার নিমিত্ত দুইটী হাঁড়ি এবং তৈল লবণাদি রাখিবার দুইটী ক্ষুদ্র পাত্র, ঘরের আর এক দিকে একটী জলপূর্ণ মাটীর কলসী এবং একটা মাটীর ভাণ্ড।

ঠাকুরাণী অগ্নি আনিয়া রন্ধন আরম্ভ করিলেন। গুরুমহাশয় রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—"কেবল অন্ন পাক করিলেই হইবে। যখন ক্ষীর খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন তাহারই সাহায্যে অনায়াসে ভাত খাওয়া যাইবে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"কেবল লবণ উপলক্ষ করিয়া যদি চলে, তাহা হইলে ক্ষীর পাইলে কেন না চলিবে? দেখি কতদূর কি হয়?"

গুরুমহাশয় পাকশালায় মাটীর কলসী এবং বাহিরের আর একটা মাটীর কলসী লইয়া নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে দুই স্কন্ধে দুই কলসী জল

লইয়া গৃহাগত হইলেন। যথাস্থানে কলসী রক্ষা করিয়া এবং দেহের ঘর্ম্ম বিদূরিত করিয়া তিনি সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র বাগানে প্রবেশ করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে আহার্য্য প্রস্তুত হইল। ঠাকুরাণী নিকটে আসিয়া ডাকিলেন,—"ভাত হইয়াছে, শীঘ্র আইস। এত কাঠ কেন সংগ্রহ করিলে? কাঠের ব্যবসা করিবে না কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"বেশী কাঠ ভাঙ্গিয়াছি কি? যদি বেশী হইয়া থাকে, তাহা হইলে হরির মাকে চারিটী দিতে হইবে। কাঠ অভাবে তাঁহার রাঁধার বড় কষ্ট হইতেছে।"

কাষ্ঠের বোঝা স্কন্ধে লইয়া গুরু মহাশয় বাটী আসিলেন এবং তৎসমস্ত অঙ্গনে স্থাপন করিয়া হস্ত পদাদি ধৌত করিলেন, গামছা খানি একবার কাচিয়া ফেলিলেন, এক খানি কাচা কাপড় পরিধান করিলেন, তাহার পর পাকশালায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"ক্ষুধিত ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত; সুন্দরি! খাইতে দাও।"

তথায় কাঠের একখানি ক্ষুদ্র পিঁড়ি এবং তাহার সম্মুখে এক খণ্ড কলার পাতা পাড়া ছিল। গুরু মহাশয় সেই আসনে উপবেশন করিলেন। ঠাকুরাণী পাতার উপর কদর্য্য তণ্ডুলের রক্তবর্ণ অন্ন, খানিকটা কাঁচকলা ভাতে এবং একটু লবণ স্থাপন করিলেন। গুরুমহাশয়

যথারীতি শ্রী-বিষ্ণু দেবতার উদ্দেশে সমস্ত খাদ্য নিবেদনাদি করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরাণী পত্রের এক দেশে খানিকটা ক্ষীর দিয়া গুরু ব্যজন করিতে লাগিলেন। লবণ ও কাঁচকলা ভাতে সহযোগে গুরুমহাশয় প্রচুর অন্ন উদরস্থ করিলেন ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ক্ষীর দিয়া ভাত খাইবে না?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"ক্ষীর দিয়া খাইব বলিয়াই সব ভাত খাই নাই। দেখ দেখি, ক্ষীর, ঘৃত, মৎস্য, মাংস, বোধ হয়, কোন জিনিষ অভাবেই জীবন ধারণের ও শরীর-রক্ষার অসুবিধা হয় না। আমরা অনেক দিন এই ভাবে কাল কাটাইতেছি। কিন্তু সত্য কথা বলিব কি? আমার বড় ভয় হইয়াছিল, বুঝি তোমার স্বাস্থ্য, তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য এই অবস্থান্তরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য বা শ্রীর কোনরূপ অভাব হওয়া দূরে থাকুক, আমি দেখিতেছি, তোমার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য এই দুঃখ-দুরবস্থায় আরও যেন শোভাময়, আরও অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। আর আমার কথা বলিব কি? আমার দেহ যেন চতুর্গুণ অধিক বলশালী ও কর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছে; আর আমার মাংসপেশী যেন আরও দৃঢ় ও কঠিন হইয়া উঠিতেছে।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"সে সকল কি হইয়াছে তাহা আমি জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,

বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা বড় সুখে আছি। আমি জীবনে কখন এত সুখভোগ করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। একটী বিষাদ-জনক ঘটনা ব্যতীত, গত কালের কোন বিষয়েরই নিমিত্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয় না; বরং যেন বিগত সকল অবস্থার অপেক্ষা আমি বরং এক্ষণে অধিকতর ভাগ্যবতী হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়।”

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঠাকুরাণী বদন বিনত করিলেন। গুরু মহাশয় কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রঙ্গিণী দেবী সেই ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

রঙ্গিণী বিধবা—ব্রহ্মচারিণী। তাঁহার বয়স এক্ষণে উনবিংশ বর্ষ। দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহের এক মাস পরেই তাঁহার স্বামী লোকান্তরে গমন করেন। তদবধি রঙ্গিণী ভূষণ ধারণ করেন না, নিরামিষ একাহার করেন, স্থূল বস্ত্র পরিধান করেন, কম্বলশয্যায় শয়ন করেন, এবং পূজা পাঠ ব্রত-নিয়মাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

রঙ্গিণী সুন্দরী শিরোমণি তাঁহার দেহের বর্ণ চাঁপা ফুলের ন্যায়। তাঁহার কলেবর পূর্ণায়ত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তিনি যেন একটু কৃষকায়া, কিন্তু তাহাই যেন তাঁহার অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি সদা নত ও কুটিলতা বর্জ্জিত। তিনি দৈহিক পারিপাট্য সাধনে

নিতান্ত অমনোযোগী ও বিলাসিতা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। তাঁহার মস্তকস্থিত কেশরাশি তৈলহীন, উজ্জ্বলতা শূন্য ও আলুথালু ভাবে নানা দিকে নিপতিত। কিন্তু কেশের ও দেহের এই বিসদৃশ রুক্ষ ভাব তাঁহার শোভার অপচয় না করিয়া তাঁহার মূর্ত্তির উপর এক অলৌকিক মহিমা ও তেজের জ্যোতিঃ আনয়ন করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে শোভাময়ী উন্মাদিনী, অথবা জ্যোতির্ম্ময়ী উদাসিনী বলিয়া ভক্তি করিতে ইচ্ছা করে।

রঙ্গিণী দেবী মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একমাত্র তনয়া। সন্তান সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ। তাঁহার অন্য সন্তানাদি নাই, এক মাত্র কন্যাও বিধবা। এই কন্যার প্রতি জনক জননীর স্নেহের সীমা নাই। বিধবা হইলেও, এই দুহিতা মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং তনয়ার বাসনা পূরণ করাই আপনাদের জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় শান্ত ও পরোপকারী ব্যক্তি; কিন্তু কন্যার প্রতি তাঁহার স্নেহ এতই প্রবল যে, রঙ্গিণী দেবীর বাসনা হইলে তিনি নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্যেও আপনার প্রধান ও পরম কর্ত্তব্য বলিয়া সাধন করিতে প্রস্তুত এবং নন্দিনীর পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তিনি অত্যাচার স্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিতে সক্ষম।

সৌভাগ্যক্রমে রঙ্গিণী বড়ই ধর্ম্মপরায়ণা। কিন্তু

তাঁহার চরিত্রে এক দোষ বড়ই প্রবল। তাঁহার বাসনা অলঙ্ঘনীয়। তিনি যখন যে কার্য্য সম্পাদনের সংকল্প করিবেন, তাহা শেষ না করিলে তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। কোন প্রতিবন্ধক, কোন অসুবিধা বাসনা সিদ্ধি বিষয়ে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। কন্যার আগ্রহাতিশয্য বুঝিলে, পিতামাতাও তৎসিদ্ধি বিষয়ে বাধ্য হইয়া সহায়তা করিতেন। যখন বৈধব্যের অল্পকাল পরে রঙ্গিণী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তখন জনক জননী অনেক নিষেধ, অনেক মিনতি, অনেক অশ্রুপাত করিয়া ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল মাত্রও কন্যাকে সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই। তাহাদের বাটীতে এক দূর-সম্পর্কিয়া বৃদ্ধা বাস করিতেন; তাঁহার আর কোন আশ্রয় ও আত্মীয় ছিল না। সম্পর্কে তিনি রঙ্গিণীর ঠাকুরুণদিদি হইতেন, নাতিনীর যৌবনোদ্গম হইলে তিনি এক দিন পরিহাস করিতে করিতে রঙ্গিণীর সহিত একটা কুৎসিত রসিকতা করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধা চক্রবর্ত্তী তনয়ার প্রতাপে সেই বৃদ্ধাকে চিরদিনেরমত সে আশ্রয় হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবেন, মনঃস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা তাহাও করিতে দেন নাই। রঙ্গিণীর অভিপ্রায় ও সংকল্প সকল সময় সমান থাকিত না। যে কার্য্য তিনি অদ্য বড় ভাল বলিয়া

মনে করিতেন, কিছুকাল পরে হয় ত তাহা একান্ত নিন্দনীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিতেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইলে তাঁহার স্বজনগণ বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন। মহাভারত পড়িয়া তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছিল, দ্রৌপদী এ ভূমণ্ডলে অতুলনীয়া নারী। আবার কিছুকাল পরে তিনি বলিতেন দ্রৌপদী মহাভারতের কলঙ্ক। যে নারী অনায়াসে পঞ্চপতি গ্রহণ করিয়াছিল, সে তো ব্যভিচারিণী। তাঁহার মতামত সততই এরূপ পরিবর্ত্তনপরিগ্রহ করিত। পিতা-মাতা একমাত্র কন্যার সকল মতেরই সমর্থন করিতেন এবং সকল সংকল্প-সিদ্ধির সহায়তা করিতেন। এইরূপে রঙ্গিণী প্রভুতা, আধিপত্য ও স্বাধীনতাই শিক্ষা করিয়াছিলেন; বিনয়, নম্রতা ও পরকীয় বাসনানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিবার তাঁহার কোন সুযোগ হয় নাই।

মধ্যাহ্নকালে সৌরকর-প্রদীপ্ত-কায়া এই বিধবা ব্রহ্মচারিণী সেই দীন গুরুমহাশয়ের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরাণী উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিলেন। রঙ্গিণী সে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। ভোজন-নিরত গুরুমহাশয় বলিলেন,—"এ অধমদিগের প্রতি আপনার দয়ার সীমা নাই। আপনি স্বহস্তে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া আমাদের দিয়া গিয়াছেন, আবার কৃপা করিয়া এই রৌদ্রে আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন।"

গুরু মহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রঙ্গিণী হাস্য করিলেন। ঠাকুরাণী বলিলেন,—"দীনের প্রতি দয়া প্রদর্শনই মহতের কার্য্য। আপনি পুণ্যময়ী। আপনাকে দর্শন করিয়াও পুণ্য হয়।"

ঠাকুরাণীর দিকে রঙ্গিণী বিরক্তিসূচক তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টি ঠাকুরাণীর অন্তস্তল বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি সভয়ে অধোমুখ হইলেন। গুরু মহাশয় রঙ্গিণীর সেই দৃষ্টি এবং তজ্জন্য ঠাকুরাণীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছেন।

রঙ্গিণী বলিলেন,—"আপনি ক্ষীর খাইতেছেন দেখিয়া সুখী হইলাম, আপনাকে একটা কথা বলিব বলিয়াই এ অসময়ে আমি এখানে আসিয়াছি।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"আজ্ঞা করুন।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"কথা বলিতে অনেকক্ষণ সময় লাগিবে। এখানে তাহার সুযোগ হইবে না। আপনি দয়া করিয়া একবার আমাদের বাটীতে যাইবেন না কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কেন যাইব না? কখন্ যাইতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"আজি সন্ধ্যার পর।"

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমি সন্ধ্যার পর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাইব। তিনি

যদি আমাকে সে সময় সঙ্গে লইয়া আপনার নিকট গমন করেন, তাহা হইলে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে।"

রঙ্গিণী একটু অধোমুখে চিন্তা করিলেন। তাহার পর গুরু মহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাস্য করিলেন। তাহার পর বলিলেন,—"সেই ভাল কথা। ভুলিবেন না যেন। আমি এখন আসি।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা।"

রঙ্গিণী যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুরাণী তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, —"আবার কখন আপনার দেখা পাইব?"

অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া রঙ্গিণী বলিলেন,—"জানি না।"

রঙ্গিণী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরাণী নিতান্ত উদ্বিগ্ন-ভাবে গুরুমহাশয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। গুরুমহাশয় হাস্যমুখে বলিলেন,—"ভয়ের কথা কিছুই নাই। এই নারীর পরিণাম বিষাদজনক হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে।"

এ সম্বন্ধে অধিক কথা কহিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

গুরু মহাশয়ের কুটীর হইতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী পর্য্যন্ত কোন প্রশস্ত পথ নাই। একটা সামান্য

সরু পথ আছে ; তাহার দুইধারেই বন এবং মনুষ্যের বাস শূন্য। গুরু মহাশয়ের নিকট বিদায় হইয়া রঙ্গিণী দেবী সেই পথ দিয়া আসিতেছিলেন। তাহার অনেক চিন্তা। তিনি ভাবিতেছেন, এ সোণার দেহ, এ সুখের যৌবন কেন এরূপে নষ্ট করিব? যদি গুরুমহাশয়, যদি এ রূপগুণের দেবতা চক্ষুতে না পড়িত তাহা হইলে হয় তো এইরূপে জীবন কাটিতে পারিত, কিন্তু আর তো কাটে না। এখন আমি পাগল। যেমন করিয়া হউক্ এই দেবতার চরণে আমি বিকাইব। অধর্ম্ম হইবে? কে বলিতে পারে? নিন্দা হইবে? বাবার প্রতাপে ঢাকিয়া যাইবে। বাধা কিছুই নাই। আজি আট দিন শয়নে স্বপনে এই চিন্তায় মজিয়া আছি। বাসনা মিটিবে না কি? অবশ্য মিটিবে। স্ত্রীর প্রতি আমার দেবতার বড় ভালবাসা। তাহাকে টিপিয়া মারিব। পথের কণ্টক দূর করিয়া ফেলিব।"

সহসা একটা বৃহৎ বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক বলিষ্ঠকায় পুরুষমূর্ত্তি বাহির হইল। তাহাকে দর্শন মাত্র রঙ্গিণী বলিলেন,—"একি এখানে যে?"

পুরুষ বলিল,—"আপনার অপেক্ষায়।"

"কেন?"

পুরুষ বলিল,—"আপনাকে একবার দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব বলিয়া।"

রঙ্গিণী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি যাহার জন্য পাগল তাহার উপায় কর।"

পুরুষ বলিল,—"তাহার উপায় শীঘ্রই করিব। আপনার সাহায্যে এবং আজ্ঞায় তাহার কিছুই বাকী থাকিবে না। কিন্তু আমি তাহার জন্য পাগল বলিলে আমার প্রতি অবিচার করা হয়। আমি যাঁহার জন্য পাগল, সে দেবী আমার সম্মুখে।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"সে বিচার পরে হইবে। আপাততঃ সে কার্য্য শেষ করিয়া ফেল। আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

পুরুষ প্রস্থান করিল।

রঙ্গিণী আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"বেশ লোক। কিন্তু গুরু মহাশয়ের মত রূপবান্ গুণবান্ নহে। যদি ভোগের পথে চলিতে হয়। তাহা হইলে ইহাকেও চাহি। একের হইয়া কেন থাকিব? দেখি আগে এদিকে কি হয়? এখন গুরু মহাশয় ছাড়া অন্য চিন্তার সময় নাই। এদিকে হতাশ হইলে যাহা হয় হইবে।"

রঙ্গিণী গৃহে ফিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রঙ্গিণী।

পরদিন প্রত্যূষে গুরু মহাশয় প্রাতঃকৃত্যাদি, সমাপনান্তে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন; এমন সময় ঠাকুরাণী বিষণ্ণ বদনে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"এ বিষয়ের কিছু স্থির করিলে না?

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"কোন্ বিষয়ের? তোমাকে চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন?"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—চিন্তা একটু হইয়াছে সত্য। তুমি রঙ্গিণীর সম্বন্ধে সুব্যবস্থা না করিলে চিন্তা দূর হয় কিরূপে?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ সুব্যবস্থা করিতে তুমি পরামর্শ দেও। আমি তো কোনই পথ দেখিতেছি না।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার না?"

"না। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত হইলেও, আমি সকল স্থলে তাহা শ্রেয় বলিয়া মনে করি না। বিশেষতঃ

আমার প্রয়োজনাভাব; বিনা প্রয়োজনে, পত্নীগ্রহণ বড়ই অধর্ম্ম।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"তুমি পরের সুখসন্তোষের নিমিত্ত অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধনেও পশ্চাৎপদ হও না। তোমার চরণ লুণ্ঠিতা এক নারীর অনুরোধে তুমি তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না কেন?"

গুরু মহাশয় বলিলেন, "পতি পত্নির সম্বন্ধ অতি পবিত্র। স্বার্থত্যাগ তাহার ভিত্তি, ধর্ম্মসাধন তাহার অঙ্গ, এবং কামনা ও লালসাবিহীনতা তাহার চূড়া। এ ক্ষেত্রে তাহার কিছুই নাই। স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, অধর্ম্ম সাগরে সাঁতার দিতে দিতে কামনা ও লালসা নিবৃত্তি করাই রঙ্গিণীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত সে পত্নী হউক্, দাসী হউক্, সঙ্গিনী হউক্, সকল নাম গ্রহণ করিতেই সম্মত। তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার কল্পনা করিলেও পাপ হয়।

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"পুরুষেরা উপপত্নী গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"কে এ পাপ কথা বলিয়াছে? উপপতি গ্রহণে নারীর যে অধর্ম্ম, উপপত্নী গ্রহণে পুরুষেরও সেই অধর্ম্ম। সমাজের যে সকল লোক এ সম্বন্ধে পুরুষের অধিকার আছে বলিয়া ঘোষণা করে তাহারা নারকী। এ বিষয় এই মাত্র বলা যাইতে পারে,

যে এ সম্বন্ধে নারীর পাপে সমাজের যত অনিষ্ঠ হয়, অনেক সময় পুরুষের পাপে সমাজের তাদৃশ অনিষ্ঠ না হইতে পারে।”

ঠাকুরাণী বলিলেন,—“পরনারীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করায় পাপ থাকিলে স্বয়ং ধর্ম্মময় শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিতেন না।”

গুরুমহাশয় বলিলেন,—“এ স্থলে সে পুণ্যময় পবিত্র প্রসঙ্গের উত্থাপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবিক অবস্থা বিশেষে পরনারীকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে ভগবান স্বয়ং দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্তের অনুরূপ ঘটনা এ জগতে আর কোথায় ঘটে? সেরূপ হইলে তাদৃশ আচরণে পাপ হয় না। কিন্তু হায়! এ পাপপূর্ণ বসুন্ধরায় সে দৃষ্টান্ত আর কি কখন ঘটে? সেই পবিত্র লীলায় অনুমাত্র অনুরূপ আচরণে যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহারা তাহারই দোহাই দিয়া উৎকট পাপের তরঙ্গে ধরণী ভাসাইয়া দিতেছে এবং শ্রীভগবানের পরম রমণীয় চিরনবীন ও পরম শিক্ষাপ্রদ আচরণে অকারণ কলঙ্ক-কালিমা প্রলিপ্ত করিতেছে।

ঠাকুরাণী বলিলেন,—“রুক্মিণীর যে সকল ব্যবহারের বিবরণ তোমার মুখে শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতেছি তিনিও তোমার নিমিত্ত প্রেমোন্মাদিনী হইয়াছেন, তিনিও তোমার জন্য অসাধ্য সাধনে সক্ষম

হইয়াছেন, তিনিও তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগে প্রস্তুত হইবেন।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। গোপাঙ্গনাগণের সে লালসাবিহীনতা, সে অপার্থিব ত্যাগ স্বীকার, সে সুমধুর ধর্ম্মভাব, সে কল্পনাতীত তন্ময়তা, সে অতুলনীয় দৃঢ়তা, সে অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, তাহার কথা কি বলিব? এখানে তাহার কিছুই নাই। তাহার পরিবর্ত্তে এখানে আছে কেবল পাপ, আবিলতা, আশক্তি, বাসনা, কুপ্রবৃত্তি ও কদর্য্য লিপ্সা। আহা! রঙ্গিণীদেবী যদি সে অপার্থিব প্রেমের কণিকামাত্র লাভ করিয়া উন্মাদিনী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করার নামে শিহরিয়া উঠা দূরে থাকুক, তাঁহার দাস হইলেও আমার গৌরব বর্দ্ধিত হইত। তাঁহার সে ভাব হইলে আমাকে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার কোন আকিঞ্চন করিতে হইত না; আমার সহিত সম্মিলন না হইলেও তিনি হৃদয়-মন্দিরে নিয়ত আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেন এবং আমার সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্মিলনজনিত আনন্দ উপভোগ করিতে পাইতেন। আজি বেলা হইয়া গেল, আমার কর্ত্তব্য পালনে বিলম্ব হইতেছে। আমি এখন যাই, তোমার সহিত সময়ান্তরে এতদ্বিষয়ক কথোপকথন করিব।"

ঠাকুরাণী নতবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের গমন করা হইল না, সম্মুখে রঙ্গিণী।

রঙ্গিণী আসিয়াই ঠাকুরণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি পাগল হইয়াছি আমি মরিতে বসিয়াছি, আজী আট দিন আমার আহার নিদ্রা নাই। তোমার স্বামীর এই ভুবনমোহনরূপ আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি তোমার দয়া ভিন্ন আমার রক্ষার আর কোন উপায় নাই। তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, তুমি আমাকে তোমার স্বামীর চরণ সেবা করিবার অধিকার দেও। তোমার কৃপা না হইলে আমার আর উপায় নাই।

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি আসিবার পূর্ব্বেই আমি স্বামীর সহিত আপনার কথা কহিতে ছিলাম। যাহাতে তিনি কোনরূপে আপনাকে গ্রহণ করেন, আমি তাহারই পরামর্শ দিতেছিলাম। আমার স্বামী দেবতা, দেবতার পূজা সকলেই করিতে পারে। দেবচরণে অনেকেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারে, স্বামী তোমার পূজা গ্রহণ করিলে আমি তুষ্ট হইব।"

তাহার পর উন্মাদিনী রঙ্গিণী সহসা গুরুমহাশয়ের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,—"তবে ঠাকুর তুমি আমার প্রতি কেন দয়া করিবে না?"

গুরুমহাশয় অতীব বিরক্তির সহিত বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ! আপনি আমার হাত ছাড়িয়া দিউন। আপনি পরনারী, পরনারীর অঙ্গ স্পর্শ

করাও মহাপাপ, আমি আপনাকে কল্য রাত্রিতে স্পষ্টরূপে বলিয়াছি যে, আমার দ্বারা জ্ঞানতঃ কোন পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার হাত ছাড়িয়া দিউন।"

রঙ্গিণী হাত ছাড়িয়া দিল না, বলিল,—"নারীহত্যা কি মহাপাপ নহে? তুমি দয়া করিয়া চরণে স্থান না দিলে নারীহত্যার পাপগ্রস্ত হইবে।

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তুমি যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া আত্মহত্যা কর, আমি সে জন্য কেন দায়ী হইব। কেহ যদি অন্যায় পূর্ব্বক পরের ধন চাহে, আর তাহা না পাইয়া ক্রোধ বা অভিমানে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে অন্য কেহ তাহার পাপভাগী কেন হইবে?"

রঙ্গিণী হাত ছাড়িয়া দিল, বলিল,—"তুমি পরের ধন। তুমি আমাকে আপন করিয়া লইতে পার না, ইচ্ছা করিলে তুমি সুব্যবস্থা করিতে পার।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তোমাকে বিবাহ করিবার উপায় নাই, তুমি বিধবা।"

রঙ্গিণী বলিল,—"আমাকে দাসী করিবার উপায় নাই কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তাহারও উপায় নাই। উপপত্নীরূপে কাহাকেও গ্রহণ করা মহাপাপ; আমি তাহা কখনই করিব না। আমি দরিদ্র ব্যক্তি, স্বচ্ছন্দে তোমার

পিতার আশ্রয়ে জীবনপাত করিতেছিলাম, কেন তুমি কর্ত্তব্য পথ ভুলিয়া পাপে মজিতেছ, দুই জনকেই ক্লেশ দিতেছ? তুমি গৃহে যাও, চিত্তকে স্থির কর। পাপ-প্রবৃত্তি ধর্ম্মানলে দগ্ধ করিয়া ফেল।"

রঙ্গিণী অধোমুখ, অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—"আমি বুঝিয়াছি, আপনার পত্নী আছে বলিয়াই আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। কিন্তু দেখুন আপনি, আমার রূপ আপনার স্ত্রীর অপেক্ষা কিসে কম? লোকে আমাকে পরমাসুন্দরী বলিয়াই জ্ঞান করে, আমি লেখা পড়া জানি, আমার পিতার ধন সম্পত্তি আছে, সে সকলই আমার, আমি সমস্তই তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া তোমার সেবা করিব, তথাপি তুমি আমার হইবে না?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"অসম্ভব, ধন সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি দরিদ্র, এই অবস্থায় আমি পরম সুখে আছি। তুমি লেখাপড়া জানিতে পার, কিন্তু যে লেখাপড়ায় ধর্ম্মের প্রতি আসক্তি না রাখিতে পারে, তাহা নিতান্ত অসার। আমার স্ত্রীর রূপ আছে কি না আমি তাহা জানি না, তাঁহার প্রেমানন্দে আমি সতত প্রেমত্ত, সুতরাং তাঁহার রূপ দেখিবার আমি অবসর পাই না। তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান কর।"

রঙ্গিণী একটু পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন, তাহার পরে বলিলেন,—"শুন ঠাকুর! আমাকে এইরূপ অপমানিত

করায় শীঘ্র অতি ভয়ানক ফল জন্মিবে। এ জীবনে কখনই আমার বাসনার অন্যথা হয় নাই, এবারও হইবে না। আমার পিতার প্রভূত বিত্ত আছে, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, আমার বাক্য তাঁহার নিকট বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। আপনার এই অহঙ্কারের ফলভোগ করিতে হইবে। আপনার এই অহঙ্কারস্ফীতা পত্নী যাঁহার প্রেমে অন্ধ হইয়া আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিলেন, সেই সাধের প্রণয়িনীর দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না। আপনাকে বাধ্য হইয়া আমার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, চিরদিন আমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে হইবে, অধিক কথা আমি আর বলিতেছি না, সাবধান গুরু মহাশয়—সাবধান!"

রঙ্গিণী কোন কথা শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা না করিয়া বেগে প্রস্থান করিল।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে সেই স্থানে সেই পুরুষের সহিত রঙ্গিণীর আবার সাক্ষাৎ হইল। পুরুষ বলিল,—"সব ঠিক হইয়াছে, আজি হুকুম মত কার্য্য শেষ করিব।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"আজি করা চাইই চাই।"

পুরুষ বলিল,—"কিন্তু আমার প্রাণের সাধ কি মিটিবে না? আমি আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, আমি এখনি আপনার আজ্ঞায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি কি না, আমার এ ভালবাসার কি পুরস্কার হইবে না?"

রঙ্গিণী হাসিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয় হইবে। তুমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য কর। তাহার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তুমি বেশ লোক।"

পুরুষ মধুর হাসি হাসিয়া প্রস্থান করিল। রঙ্গিণী ফিরিতে ফিরিতে ভাবিতে লাগিলেন; এ অঙ্কহত গুরু মহাশয়ের দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে; তাঁহার সোহাগের স্ত্রীর সর্ব্বনাশ করিতেই হইবে। ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। তাহাকে না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাকে জব্দ করিব। তাহার পর—তাহার পর! এই পুরুষ আছে। এ আমাকে ভালবাসে। ইহার সহিত আমার সুখের মিলন হইবে। এ আমার জন্য ব্যাকুল; আর সে আমাকে উপেক্ষা করে। তাহাকে জব্দ করিয়া তাহার মুখে পদাঘাত করিয়া আমি ইহারই হইব!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্ধন।

আহূত হইয়া গুরুমহাশয় বৈকালে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিশেষ সমাদর ও শিষ্টাচারাদির পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"আপনাকে আমি বড়ই শ্রদ্ধা করি। গ্রামশুদ্ধ লোকও আপনার ভক্ত। সম্প্রতি আপনার সম্বন্ধে একটা বড়ই লজ্জাজনক কথা আমার কর্ণগোচর হইয়াছে, আপনাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়। কথাটা সত্য কি?"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"কি কথা মনে করিয়া মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। এজীবনে সকল সময়ে যে ভাল কার্য্যই করিয়াছি এমন বোধ হয় না। অনেক সময়ে হয়তো অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু কোন লজ্জাজনক কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। অজ্ঞাতসারেও কোন লজ্জাজনক কার্য্য যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আপনি কৃপা করিয়া বলুন আমার দ্বারা কোন্ লজ্জা জনক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ?”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“কথাটা বলিতে মাথা কাটা যায়। আপনি জানিয়া শুনিয়াও যখন কিছুই বুঝিতেছেন না, তখন কাজেই আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইতেছে। আপনি আমার কন্যা রঙ্গিণীর মন হরণ করিয়াছেন এবং তাহাকে পাপের পথে চলিবার জন্য মাতাইয়া তুলিয়াছেন।”

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“কথাটার কি উত্তর দিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অতি দুঃখের সহিত আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, আপনার কন্যার বাস্তবিকই মতিভ্রম ঘটিয়াছে, কিন্তু আমি তাঁহার সে প্রবৃত্তির সহায়তা করা দূরে থাকুক, সে জন্য আন্তরিক দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়াছি এবং যাহাতে তিনি সাবধান হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত না হন, তাহারই চেষ্টা করিতেছি।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন,—“মিথ্যা কথা। তোমার ন্যায় ব্যক্তি পাপে মত্ত হইবে, আর সে কার্য্য ঢাকিবার জন্য মিথ্যা কথা কহিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। এ কলিকালে মানুষ চিনিবার উপায় নাই। আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছি তুমি আমার কন্যাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছ এবং তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।”

গুরুমহাশয় অধোমুখ। চক্রবর্ত্তী ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"চুপ করিয়া রহিলে কেন? কি বলিতে চাহ বল। সত্য কথা বলিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব এবং সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিব; কিন্তু মিথ্যা কথা বলিলে, আমি নিশ্চয়ই তোমার বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করিব।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"আপনার সুব্যবস্থার নিমিত্ত আমি আকাঙ্ক্ষিত নহি, আপনার শাস্তির ভয়েও আমি ভীত নহি। আপনি বিশ্বাস করুন, বা না করুন, আমি সত্য কথাই বলিব। মহাশয় আমার পিতৃতুল্য ভক্তি-ভাজন। আপনার কন্যা আমার ভগ্নীর ন্যায় আদরণীয়া, তাঁহাকে কলঙ্কিত দেখিলে আপনার যত কষ্ট হইবে, আমারও প্রায় তত কষ্ট হইবে। আপনার কন্যার কথা কেন বলিতেছেন? কোন সামান্য লোকের কন্যাকেও কুপথে চালিত করিতে আমার কখনই মতি হয় নাই। আপনি অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন, আমি এ সম্বন্ধে কোনই পাপাচারণ করি নাই।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় অতিশয় ক্রোধের সহিত বলিলেন,—"ভয়ানক মিথ্যা কথা! তুমি গত কল্যও রাত্রিকালে প্রচ্ছন্নভাবে আমার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে এবং তাহার সহিত যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া গভীর রাত্রিতে প্রস্থান করিয়াছ। এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ আছে।

এ সকল কাণ্ডের এক বর্ণও মিথ্যা নহে। তুমি অস্বীকার করিলে আমি বুঝিব, তুমি কেবল ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি নহ, অধিকন্তু অতিশয় মিথ্যাবাদী।”

গুরুমহাশয় একটু চিন্তা করিয়া প্রসন্ন বদনে বলিলেন,—“মহাশয়, বিশ্বাস করুন, বা না করুন, আমি সত্য বলিতে কদাপি বিরত হইব না। আমি গত কল্য রাত্রি-কালে আপনার কন্যার গৃহে গমন করিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সেখানে যাই নাই। আমাকে যাইবার নিমিত্ত শ্রীমতী রঙ্গিণী দেবী আমার আবাসে গিয়া আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। আমি আপনার নিকট আসিয়া এবং আপনার সঙ্গে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। আমি যথাসময়ে এখানে আসিয়া আপনার সাক্ষাৎ না পাওয়ায়, কল্য আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না স্থির করি এবং আপনার কন্যার নিকট সেই-রূপ সংবাদ প্রেরণ করিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করি। এমন সময় আপনার একজন দাসী আসিয়া বলে,—“দিদি ঠাকুরাণীর প্রয়োজন অতি গুরুতর। অদ্য সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার ক্ষতি হইবে। কর্ত্তা মহাশয় বাটী না থাকিলেও সাক্ষাতের কোন অসুবিধা ঘটিবে না।” মা ঠাকুরাণী এবং সেই দাসী আমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণী দেবীর নিকট গমন করিবেন স্থির হইল। আমি অগত্যা সম্মত হইলাম। দাসীর সহিত আমি পুরমধ্যে প্রবেশ

করিলাম। সেখানে মহাশয়ের গৃহিণীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। আপনার কন্যা আমার সহিত নানাপ্রকার ধর্ম্ম কথা কহিতে লাগিলেন। মা ঠাকুরাণী অতি অল্প-কাল পরেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। দাসী থাকিল। তাহার সমক্ষেই আপনার কন্যা—আমি কি বলিব ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বল, যাহা বলিয়া যাইতেছ তাহা শেষ কর। তাহার পর আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিব।"

গুরুমহাশয় বলিলেন,—"তাহার পর রঙ্গিণী দেবী ধীরে ধীরে তাঁহার মনের কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তিনি আমার নিমিত্ত উন্মাদিনী হইয়াছেন এবং সে জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য বোধশূন্য হইয়া-ছেন। তাঁহাকে পত্নীরূপে বা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করি-বার নিমিত্ত আমাকে অনেক বিনয়যুক্ত অনুরোধ করি-লেন। আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক হইলাম; ক্রমে তাঁহাকে চিত্তস্থির করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলাম। তিনি আমার হিতকথায় কাণ দিলেন না। রোদন করিতে করিতে তিনি আমার চরণে ধরি-লেন। দাসী তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমাকে অনেক কথা বলিল। রাত্রি অনেক হইয়া পড়িল, কিন্তু

আমাকে বিদায় দিতে রঙ্গিণী দেবী কোন মতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে কল্য যাহা হয় করিব বলিয়া, অতি কষ্টে গভীর রাত্রিতে আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করি। ইহাই প্রকৃত ঘটনা। আপনি কিরূপ শুনিয়াছেন তাহা আমি জানি না। যদি অন্যরূপ কোন কথা শুনিয়া থাকেন, জানিবেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“তোমার কথা যে অবিশ্বাস্য তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি নিজমুখে সত্য কথা বলিবে। তোমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আমি উচিত মত ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু দেখিতেছি, হয় ভয়ে, না হয় লজ্জায়, সত্য কথা তুমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছ না। তোমাকে এখনও আবার বলিতেছি, তুমি স্বয়ং সমস্ত কথা স্বীকার কর।”

গুরুমহাশয় বলিলেন,—“আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অপেক্ষা সত্য কথা আমি আর জানি না।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—“তবে তুমি প্রকৃত কথা বলিবে না? দাঁড়াও তুমি, তোমাকে সত্য কথা আমি শুনাইতেছি। রঙ্গিণী, ওঘরে আছ কি? তোমার দাসীকে সঙ্গে লইয়া একবার এদিকে আইস না?”

তখনই দাসীকে সঙ্গে লইয়া মন্থর পাদবিক্ষেপে সুন্দরী রঙ্গিণী দেবী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং নতবদনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসীর প্রতি লক্ষ্য

করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"বল্ তুই এ ব্যাপারের কি জানিস্! প্রথম হইতে সমস্ত কথা বল্—কিছুই গোপন্ করিস্ না।"

দাসী বলিল—"আমি কোন কথাই গোপন করিব না। গুরুমহাশয় পরম ধার্ম্মিক আর অনেক শাস্ত্র জানেন; এই জন্য দিদি ঠাকুরাণী তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম কথা শুনিবার ইচ্ছায় দিদি ঠাকুরাণী মাঝে মাঝে তাহার বাটীতে যাইতেন। আমি অনেক সময় সঙ্গে থাকিতাম। ঠাকুরাণী কাজকর্ম্মে এদিক ওদিক ঘুরিতেন। গুরুমহাশয় ধর্ম্ম কথা কহিতে কহিতে ক্রমে প্রেমের কথা কহিতে আরম্ভ করেন। দিদি ঠাকুরাণীর মত সুন্দরী গুণবতী নারী কোন উপযুক্ত পুরুষের স্ত্রী হইলে বড় সুখের বিষয় হয়। তাঁহাকে দেখিলে মুনিরও মন টলে, এইরূপ অনেক কথা বলিতে থাকে। দিদি ঠাকুরাণী প্রথম প্রথম এ সকল কথায় বড় বিরক্ত হইতে থাকেন; শেষে মেয়ে মানুষের নরম প্রাণ একটু একটু ভিজিতে থাকে। শেষে যখন গুরুমহাশয় পাগলের মত একদিন আত্মহত্যার ভয় দেখাইয়া দিদির পায়ে গড়াইয়া পড়েন, সে দিন দিদি তাঁহাকে ভালবাসার আশ্বাস দেন। কিন্তু বিবাহ না হইলে দিদি তাহাকে আপনার দেহ স্পর্শ করিতে দিবেন না, এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন। গুরুমহাশয় অনেক ঠাকুর

দেবতার নাম করিয়া বিবাহ করিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। তাহার পরে গোপনে আমাদের বাটীতে গুরুমহাশয় যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে গুরু মহাশয়ের আগ্রহ দেখিয়া দিদি ঠাকুরাণীর সাবধানতার বাঁধ কাজেই ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা যাহা এ সকল ব্যাপারের ব্যবহারে চূড়ান্ত অবস্থা সে সকলই ঘটিয়া গিয়াছে। বাকী কিছুই নাই। দিদি ঠাকুরাণী তখন বিবাহের জন্য কাদাকাটা করিতে থাকেন। গুরুমহাশয় ইতস্ততঃ করিয়া কাল কাটান, শেষে বলেন, যখন আমাদের স্বামী স্ত্রীর মত আমোদ চলিতেছে, তখন বিবাহ না হইলেই বা ক্ষতি কি? কালি রাত্রিতেও এজন্য দিদি ঠাকুরাণী অনেক পায়ে ধরিয়াছেন, বিস্তর কাঁদাকাটা করিয়াছেন।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—“আর বলিতে হইবে না। শুনিলে গুরু মহাশয়? ইহার উপর তুমি আর কিছু বলিতে চাহ কি?”

গুরুমহাশয় বলিলেন,—“এক কথা বলিতে চাহি। এ সমস্তই অদ্ভূত মিথ্যা কথা।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“সে কথা কে শুনিবে? রঙ্গিণী মা, কেন তুমি এতকাল ধর্ম্মপথে থাকিয়া এখন আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইলে?”

রঙ্গিণী একটু চিন্তা করিয়া সুমধুর স্বরে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন,—“বাবা, আমি সর্ব্বনাশ ঘটিবে ভাবিয়া

পাপ করি নাই। আপনি বাল্যকাল হইতে নানাবিধ যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া আসিতেছেন আমার মত বালবিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মকার্য্য। এই গুরুমহাশয় আমাদের গ্রামে দেবতার ন্যায় সমাদৃত ব্যক্তি। ইনি ধর্ম্মকথার প্রসঙ্গে প্রথমে বিধবা বিবাহের বৈধতা, তাহার পর আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা ব্যক্ত করিতে থাকেন। প্রথমে বিরক্তির সহিত আমি তাহার কথার ঘোরতর প্রতিবাদ করি। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার কথা কাণ পাতিয়া শুনিতে থাকি। বাবা, আপনি আমার পরম গুরু, শ্রেষ্ঠ দেবতা—আপনার নিকট আমি মিথ্যা কহিতে পারিব না—আমি গুরুমহাশয়-কৃত বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হই। আমি জানিতাম, গুরুমহাশয়ের প্রতি আপনাদের যেরূপ শ্রদ্ধা, তাহাতে তাঁহাকে জামাতা করিতে আপনার কথনই অমত হইবে না। এই জন্যই আপনাকে না জানাইয়া আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই। গুরু মহাশয় আমাকে বিবাহ করিয়া এই বাটীতে বাস করিবেন এই মর্ম্মে অশেষ প্রতিজ্ঞা করেন।”—তাহার পর—

রঙ্গিণীর স্বর সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সে কাতরভাবে সেই স্থানে বসিয়া পড়িয়া পিতার চরণ ধারণ করিল। তাহার নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল। সে বলিল,—“তাহার পর বাবা, তাহার পর স্বামী হইলে গুরুমহাশয়ের

আমার উপর যে যে অধিকার হইত, আমি সে সমস্তই উহাকে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক্ষণে বুঝিয়াছি উনি বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহেন। আমাকে ধিক্!—আমাকে—উপপত্নী—”

আর কথা রঙ্গিণীর মুখ হইতে বাহির হইল না। চক্রবর্ত্তী চরণ হইতে কন্যার হাত ছাড়াইলেন। দাসীকে ডাকিয়া কন্যাকে সাবধানে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাহার পর গুরু মহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—“শুন গুরুমহাশয়, আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহি না। তুমি যে ভয়ানক অপরাধ করিয়াছ, আমি তাহা ক্ষমা করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি, বিধবা বিবাহ সমাজ বিরুদ্ধ হইলেও, শাস্ত্রসম্মত। এখানকার সমাজে আমার কৃত কার্য্যের কোন প্রতিবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার যে ধনসম্পত্তি আছে, তাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোনই অসুবিধা নাই। সমস্তই আমার কন্যা জামাতা পাইবেন। আমার কন্যা রূপবতী ও বিদ্যাবতী। তোমার ন্যায় পরম রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষের অযোগ্যা নহে। আমি ব্যবস্থা করিতেছি, রঙ্গিণীকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। অদ্যই যথাশাস্ত্র বিবাহ হইবে। এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।”

গুরু মহাশয় এতক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়াছিলেন।

দাসী ও রঙ্গিণী যে কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত করিল, তাহার পর কি করা বা কি বলা উচিত, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। এক্ষণে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন--"আজ্ঞে না আমার পত্নী আছেন। বিবাহে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি কেন বিবাহ করিব ?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্রোধকম্পিত দেহে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"ভণ্ড! ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ করিয়া, উপকারীর কুলে কালী দিয়া, এখন তুই সরিয়া পড়িতে চাহিস্? তোকে কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিতাম, মাটিতে পুতিবার ব্যবস্থা করিতাম, কিন্তু আমার কন্যা তোর প্রতি অনুরাগিণী। এজন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা না করিয়া এই সম্পত্তির সহিত আমার রূপবতী দুহিতাকে তোর হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিতেছি। তুই তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে সক্ষম, কিন্তু তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহিস্? ধিক তোর বিবেচনায়! জানিস্ তুই এ দেশে আমার আদেশের বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস করে, এমন লোক কেহ নাই। আমি আদেশ করিতেছি অদ্য রাত্রিতে রঙ্গিণীর সহিত তোর বিবাহ হইবে।"

গুরুমহাশয় বলিলেন—"কেন আপনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অন্যায় আদেশ করিতেছেন?

আমি আপনার কন্যার কোনই অনিষ্ট করি নাই। আমি তাঁহাকে কখনই বিবাহ করিব না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বটে! তোমার এত সাহস?" উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"আয়।"

তখনই চারিজন ভীমকায় বাগদী তথায় উপস্থিত হইল। চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"এই গুরুমহাশয় কোথাও যাইতে না পারে—উহাকে ধরিয়া রাখ। আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্তভাবে প্রস্থান করিলেন। এতক্ষণে রঙ্গিণী প্রস্থান করিবার অভিপ্রায়ে দাসীর সঙ্গে উঠিলেন। যাইবার সময়ে তিনি গুরুমহাশয়ের দিকে ঈষৎ হাস্যসহকারে দৃষ্টি-পাত করিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"কেমন! আরও অনেক বাকী আছে।"

সুন্দরী চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পাষণ্ড।

ঠাকুরাণী একাকিনী। সন্ধ্যা হইয়া গেল, গুরু মহাশয় এখনও ফিরিলেন না, কাহারও বাটীতে হয় ত বিপদ ঘটিয়াছে, কোথায় হয় ত বিশেষ কোন কাজে পড়িয়াছে, তাই বুঝি গুরুমহাশয়ের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে। ঠাকুরাণী চিন্তাকুলা। কাহারও নিকট কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তো! বৈকালে কত স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু কেহই গুরুমহাশয়ের কোন সংবাদ বলে নাই। রঙ্গিণী—সেই চরিত্রবলবিহীনা নারী—সেই উন্মাদিনী কামিনী কোন কাণ্ড ঘটাইলেও ঘটাইতে পারে। যে নারী গুরুমহাশয়কে দর্শন করিয়া মজিয়াছে, যে সেই অতুলনীয় রূপসাগরে ভাসিতে মন করিয়াছে, সে কি স্থির থাকিতে পারে? কোন্ বিপদ ঘটিয়াছে কি? না, তাহা হইলে অবশ্যই কাহারও মুখে কোন সংবাদ পাওয়া যাইত।

ঠাকুরাণী যথাস্থানে গুরু মহাশয়ের পা ধুইবার জল, গামছা, বসিবার আসন ঠিক করিয়া রাখিলেন। রাত্রির

জলযোগের যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া রাখিলেন। একটী মাদুর ও বালিস তাঁহাদের শয্যা। ঠাকুরাণী দশবার করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়া গেল। গুরুমহাশয় এখনও ফিরিলেন না। ঠাকুরাণী ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিলেন। আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল

বাহিরে কাহার পদশব্দ হইতেছে না? না—হয়ত উঠান দিয়া একটা কুকুর চলিয়া গেল, না—সত্যই কাহার পদশব্দ। ঠাকুরাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু দ্বার খুলিলেন না। হাঁ—মনুষ্যের ধীর ও সতর্কপদধ্বনি তাহার সন্দেহ নাই। শব্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। ঠাকুরাণী দ্বারের পার্শ্বে খিলে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল ঠাকুরাণী সভয়ে জিজ্ঞাসিলেন,—"কে?"

বিপরীত দিক হইতে শব্দ হইল,—"অন্নপূর্ণা দরজা খোল।"

ঠাকুরাণী বুঝিলেন, এ কণ্ঠস্বর গুরু মহাশয়ের নহে; পদধ্বনি শুনিয়াও তিনি বুঝিয়াছিলেন, এ চরণপ্রক্ষেপ তাহার হৃদয়দেবতার নহে। কিন্তু এ ব্যক্তি কে? তাঁহার নাম যে অন্নপূর্ণা তাহা এ দেশের কোন লোকই জানে না; তবে এ কে? তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,— "আপনি কে?"

আবার বিপরীত দিক হইতে উত্তর হইল,—"আমি তোমার পরিচিত ব্যক্তি। বড় বিপদে পড়িয়া এখানে আসিয়াছি।"

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি কে? নিশ্চয়ই আপনি আমাকে জানেন; কিন্তু আপনি কে তাহা না বুঝিলে দরজা খুলিতে পারিতেছি না।"

বিপরীত দিক হইতে শব্দ হইল,—"তবে দরজা খুলিবে না? শুনিয়াছিলাম তুমি বড় দয়াবতী। কাতর বিপন্ন লোককেও তুমি একটু আশ্রয় দিতে চাহ না। এই কি তোমার দয়া? আচ্ছা, যাই, দেখি আর কোথায় যদি সাহায্য পাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ হইল। ঠাকুরাণী বলিলেন,—"আপনি অকারণ আমাকে অনুযোগ করিবেন না। আমি কুলকামিনী, আপনি পুরুষ, আপনি কে জানিতে না পারিলে এই গভীর রাত্রিকালে আপনাকে ঘরে স্থান দেওয়া সুযুক্তি নহে, ইহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। যদি আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে দয়া করিয়া ঐ স্থানে একটু অপেক্ষা করুন। এখনই আমার স্বামী ফিরিয়া আসিবেন। তাহার পর আপনার সেবার জন্য কোন যত্নেরই ত্রুটি হইবে না।"

বাহির হইতে দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হইল। ঠাকুরাণী

দ্বার ধরিয়া বলিলেন,—"একি? আপনি দরজা ভাঙ্গিতে-ছেন কেন?"

আবার দরজায় প্রচণ্ড আঘাত শব্দ হইল। উত্তর হইল,—"তাহা না হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না; আমাকে দেখিতে না পাইলে তুমি চিনিতে পারিবে না।"

বাহির হইতে দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হইল। ঠাকুরাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"একি? আপনি দরজা ভাঙ্গিতে-ছেন কেন?"

আবার প্রচণ্ড আঘাতজনিত শব্দ হইল। উত্তর হইল,—"তাহা না হইলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না; আমাকে দেখিতে না পাইলে তুমি চিনিতে পারিবে না।"

ঠাকুরাণী, আপনার দেহদ্বারা জোরে দরজা চাপিয়া, বলিলেন,—"আপনি পরিচয় দিলেই চিনিতে পারিব। সে জন্য দরজা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন কি?"

আবার প্রচণ্ড আঘাত। উত্তর হইল,—"এত কষ্টে—এত নিকটে আসিয়া দেখা না করিয়া কেবল মুখের পরিচয়ে স্থির থাকা যায় কি?"

আবার আঘাত। দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। ঠাকুরাণী একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মুক্ত পথ দিয়া এক পুরুষ-মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রপথবর্ত্তী হইল। এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথিমধ্যে যে পুরুষ দুইবার রঙ্গিণী

দেবীর সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি। পুরুষ বলিল,—"রাণী, অন্নপূর্ণা, আমাকে চিনিতে পার? আমি তোমার জন্য পাগল হইয়া দেশে দেশে ফিরিতেছি।"

গৃহস্থিত ক্ষীণ দীপালোকে অন্নপূর্ণা দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখস্থ পুরুষ, সোণাপুরের শঙ্করনাথ মহাদেবের পূজারি ঘনশ্যাম। তিনি একটা কাতরধ্বনি ব্যক্ত করিয়া, অধো-মুখে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন।

ঘনশ্যাম বলিল,—"সুন্দরি! সার্থক আমি মহাদেবের পূজা করিয়াছিলাম। তিনি কৃপা করিয়া এতদিনে আমার সকল সুবিধা ঘটাইয়া দিয়াছেন। এখানে আর তোমার ধন-সম্পত্তি নাই, দাস-দাসী নাই, সিপাহী-পাহারা নাই। এখন তুমি অনায়াসে আমার মনের সাধ মিটাইতে পার। কোন দিকে কোন বাধা নাই; তবে কেন তুমি চিন্তা করিতেছ?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"পরম ধার্ম্মিক মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানকার জমিদার। তিনি এ সংবাদ জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন।"

বিকট হাস্য করিয়া ঘনশ্যাম বলিল,—"তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি কি তোমার নিকট আসিতে পারিতাম? কত দেশে তোমার সন্ধান করিয়া প্রায় একমাস হইল আমি এখানে আসিয়াছি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও তাঁহার

কন্যা রঙ্গিণীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে। রঙ্গিণীও সুন্দরী বটে ; কিন্তু যাহার রূপে আমার মন ভরিয়া আছে, তাহার মত মিষ্টতা রঙ্গিণীর নাই। তাহার জন্য এখন পাগল হওয়া যায় না। তবে তাহাকেও ছাড়া হইবে না ; হাতে রাখিতে হইবে। তাহার টাকা আছে, তোমার এখন কিছুই নাই। কাজেই তাহাকে নহিলে চলিবে না। আমি তাহাকে ফাঁদে ফেলিয়াছি। সে উড়িয়া যাইতে পারিবে না। আগে তোমাকে হাত করিয়া, তাহার পর তাহাকে পাইবার উপায় করিব। তাহার কথা সময়ান্তরে অবসর মতে ভাবিব। এখন রঙ্গিণীর দরকার তোমাকে দূর করা ; আমার দরকার তোমাকে লাভ করা। রঙ্গিণীর সুতরাং চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাহায্যে আমি তোমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইব, সকল আয়োজন ঠিক আছে ; এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না ; শীঘ্র আমার সহিত চলিয়া আইস। যাহারা রক্ষা করিবে বলিয়া তুমি ভরসা করিতেছ, তাহারাই তোমার পরম শত্রু হইয়াছে। এদেশে থাকিলে তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না। নিশ্চয়ই রঙ্গিণী তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না ; শীঘ্র আইস।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“তা হউক, আমার স্বামী সর্ব্ব-শক্তিমান্‌। তিনি এখনই আসিবেন এবং তোমার বা রঙ্গিণীর সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ করিয়া দিবেন।”

আবার উৎকট হাস্য ও বিকট মুখ-ভঙ্গী করিয়া ঘন শ্যাম বলিল,—"সে ভরসা ছাড়িয়া দেও। আজি রাত্রি একটার সময় রঙ্গিণীর সহিত তোমার স্বামীর বিবাহ। আর একটু পরেই বিবাহ হইয়া যাইবে। তোমার সেই সর্ব্বশক্তিমান্ রাজা স্বামী এখন চক্রবর্ত্তীর ভবনে বন্দী। এ জীবনে আর তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। এখন যাহা বলি, তাহা শুন। অনর্থক বিলম্ব করিয়া ফল নাই। আমার সহিত আইস—অন্য দেশে চলিয়া যাই। এখানে থাকিলে কালি প্রাতে রঙ্গিণী কখনই তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিবে না।"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"আমি এখানে থাকিয়াই মরিব ; কিন্তু কোন ক্রমেই স্থানান্তরে যাইব না।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"তোমার সহিত বৃথা তর্কে আমার প্রয়োজন নাই। তোমাকে আমি যেমন করিয়া পারি আপনার করিব, ইহাই আমার সংকল্প। ঈশ্বর সকল সুযোগই ঘটাইয়া দিয়াছেন। তোমার রাজৈশ্বর্য্য ঘুচিয়া গিয়াছে, তোমার রাজা স্বামী পরের হাতে বন্দী—অন্য নারীর স্বামী হইতেছেন। তোমার সপত্নী আমার সহায় হইয়াছেন। আমি দরিদ্র হইলেও, যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়াছি। এ সুযোগে যদি তোমাকে আয়ত্ত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার সাধনাই বৃথা। তুমি ইচ্ছায় আমার কথা না শুনিলে, আমি বলপূর্ব্বক তোমাকে

লইয়া যাইব। সুন্দরি! আমার দোষ গ্রহণ করিও না। তোমার ঐ সোণার অঙ্গ আমাকে বন্ধন করিতে হইবে। তোমার ক্রন্দন ও চীৎকার নিবারণের নিমিত্ত আমাকে তোমার মুখ বাঁধিতে হইবে। তাহার পর পাল্কীতে তুলিয়া আমি তোমাকে ইচ্ছামত স্থানে লইয়া চলিব। অধিক বিলম্ব করিবার সময় নাই, তোমার অভিপ্রায় কি, শীঘ্র বল।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন, “তোমার সহিত আমি কোথাও যাইব না। জীবন থাকিতে আমি এস্থান ত্যাগ করিব না। আমার স্বামী বিপদে পড়িয়াছেন শুনিয়া আমি ভয় পাইতেছি না। কোন বিপদেই তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবে না, ইহা আমি জানি। তাঁহার অপেক্ষায় জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে বসিয়া থাকিব ”

ঘনশ্যাম বলিল,—“তবে আমার দোষ নাই। যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি, যাহাকে লইয়া পরম সুখে জীবন কাটাইব মনে করিয়াছি, তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু নিরুপায়। সুন্দরি, আমাকে বাধ্য হইয়া তোমাকে বন্ধন করিতে হইতেছে।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“কর—যাহা তোমার ইচ্ছা কর। আমি নিঃসহায়—দুর্ব্বল। কিন্তু ধর্ম্ম আছেন—দেবতা

আছেন। আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।”

ঘনশ্যাম বলিল,—“তবে দেখি প্রাণেশ্বরি, কে তোমাকে রক্ষা করে!”

একটা দড়ির উপর দুই খানি কাপড়, একখানি চাদর ও একখানি গামছা ঝুলিতেছিল। সুন্দরীকে বাঁধিবার অভিপ্রায়ে ঘনশ্যাম সেইগুলি লইয়া অগ্রসর হইল। অন্নপূর্ণা একান্তচিত্তে পতিপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা সেই কুটীরের ভগ্নদ্বার দিয়া গৃহমধ্যে অনেক আলোক প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হইল,—“হুজুর! এই দিকে রাস্তা।”

ঘনশ্যাম কাঁপিয়া উঠিল। কাহারা আসিতেছে? বোধ হয় রঙ্গিণীর লোক। অন্নপূর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বর যেন তাঁহার শ্রুতপূর্ব্ব। তখনই অন্নপূর্ণার নয়নে এক দীর্ঘকায় মহাপুরুষের মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। সেই মহাত্মা রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। তাঁহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড এক মশাল লইয়া আর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। সে ব্যক্তি জরিফ কোচম্যান। তৎপশ্চাতে চণ্ডীচরণ ও রামহরি।

রায় বাহাদুরকে ঘনশ্যামও দেখিতে পাইল। সে পলায়নের চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহাকে দর্শনমাত্র

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আমাকে পাষণ্ডের হস্ত হইতে উদ্ধার করুন।"

তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রায় বাহাদুর অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া, অন্নপূর্ণার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই তখন সেই মূর্চ্ছিতা নারীর চৈতন্য বিধানার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিবার কাহারও অবসর থাকিল না।

এই অবকাশে ঘনশ্যাম সে স্থান হইতে নিঃশব্দে পলায়ন করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে রাত্রি একটার সময় বিবাহ। পাত্রী তাঁহার কন্যা রঙ্গিণী, পাত্র গ্রামের গুরু-মহাশয়। বিধবা বিবাহ হইলেও, আর্য্য-শাস্ত্র-সম্মত প্রণালী ক্রমে কার্য্য সম্পন্ন হইবে; সুতরাং পুরোহিত, ব্রাহ্মণাদি অনেক লোক উপস্থিত আছেন এবং শাল-গ্রাম শিলা, পুষ্পচন্দনাদিও যথাস্থানে সংস্থাপিত হই-য়াছে। উপযুক্ত স্থানে বর-কন্যার আসনাদি নিপ-তিত রহিয়াছে। কিন্তু বর বা কন্যা কেহই তথায় নাই। মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বিধবা বিবাহ ধর্ম্ম-সঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত, এ কথা তিনি চিরদিন স্বীকার করিতেন কি না এবং অন্য ক্ষেত্রে হইলে এখনও স্বীকার করেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হইতেছে, তিনি এই কার্য্যে বিশেষ উৎসাহযুক্ত এবং ইহার বৈধতাবিষয়ে সন্দেহ শূন্য।

যে নারী কল্যও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন, সাদা কাপড় যাঁহার দেহ আচ্ছন্ন করিত, অবেণী-বদ্ধ রুক্ষ কেশের

ভার লইয়া যিনি বিব্রত ছিলেন, সিন্দুর ও শাটী যাঁহার নিকট হইতে বহুদিন পূর্ব্বে পলায়ন করিয়াছে, স্বর্ণাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার যাঁহার সমীপে আসিতে ভরসা করিত না, তিনি অদ্য মহার্হ বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত-কায়া। যে গুরু মহাশয়ের কথা শুনিয়া, যাঁহার রূপ দেখিয়া তিনি পাগল হইয়াছেন, অথচ চরণে অশ্রুপাত করিয়াও যাঁহার চিত্ত তিনি অধিকার করিতে পারেন নাই, সেই গর্ব্বিত গুরু মহাশয় এখনই সর্ব্ব সমক্ষে, ধর্ম্ম মতে, দেবতা সাক্ষী করিয়া, তাঁহার হইবেন। বড় আনন্দের কথা বটে। কিন্তু তাহার পর? বিবাহ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বরের হৃদয়ের উপর আধিপত্য জন্মিবে, বা তাঁহার প্রেম লাভ করা যাইবে, এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু সে ভাবনা এখন ভাবিবার সময় কই! বলে ও কৌশলে রঙ্গিণী যাহার স্কন্ধে গুরুতর পাপের ভার চাপাইয়া পিতার ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে বলপূর্ব্বক বিবাহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে বাধ্য করিতেছেন, নিশ্চয়ই যেমন করিয়া হউক, তাঁহার ভালবাসা তিনি লাভ করিতে পারিবেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনই চিন্তা নাই; কেন না তিনি সম্মুখে সুখের অতি প্রশস্ত পথ দেখিতে পাইয়াছেন।

অনেক নারী শঙ্খাদি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে বলিতেছে,—"বিধবার বিবাহ, এ আবার কোন্

দেশী কথা!" কেহ বলিতেছে, "রঙ্গিণীর বিবাহ হইয়াছিল কি না মনে পড়ে না।" আর একজন বলিতেছে,—"এই প্রথম বিবাহ বলিলেই বা ক্ষতি কি?" আর একজন বলিল,—"খুব অল্প বয়সে বিধবা হইলে আবার বিবাহ হয়।" আর একজন বলিল,—"এতদিন তো হয় নাই, এখন চক্রবর্ত্তী মহাশয় চালাইলে আর কে কি বলিবে?" এক বৃদ্ধা বলিল,—"আমি কত দিন বিধবা হইয়াছি জানি না; তা মাধবের কল্যাণে আমাদেরও হয় না কি?" এক যুবতী বিধবা বলিল,—"মরণ দেখ, আগে আমাদেরই হউক!"

সময় হইয়া আসিল সকলই প্রস্তুত, কেবল বরের আগমন বাকী। রঙ্গিণী আপনার ঘরে একাকিনী বসিয়া মনে মনে অনেক চিন্তা করিতেছেন। রঙ্গিণী ভাবিতেছেন, পিতা এখনও গুরুমহাশয়ের মত ফিরাইতে পারেন নাই। এ সামান্য কার্য্য তিনি এখনও শেষ করিতে পারিলেন না কেন? যদি না পারেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি আছে? তাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। সে বন্দী হইয়া আছে, মারি খাইয়াছে, অপমানিত হইয়াছে। আর এতক্ষণে তাহার সেই পেন্‌পেনে স্ত্রীরও নিশ্চয়ই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহার পর? তাহার পর আমি যে ভোগের আশায় মজিয়াছি, তাহা ছাড়িব না। গুরু মহাশয় আমাকে চাহে না; ঘনশ্যাম আমাকে চাহে। যে চাহে

সেই ভাল। সে তো হাতে আছে। তবে আর ভাবনা কি? ঠাকুরাণীকে এখান হইতে তফাৎ করার পর, ঘনশ্যাম তাহাকে দূর করিয়া দিবে। কিন্তু পিতা ঘনশ্যামের সহিত আমার বিবাহ দিবেন না। কাজ কি বিবাহে? বিধবার বিবাহ একটা কথার কথা! ভোগই সুখের মূল। যেমন করিয়া পারি, তাহার উপায় করিব।"

বাস্তবিক চক্রবর্ত্তী মহাশয় কোন মতেই গুরু মহাশয়কে বিবাহে সম্মত করিতে পারিলেন না। বাহির বাটীতে চারিজন বাগদি, এক জন প্রবীণ কর্ম্মচারী ও গুরু মহাশয়কে লইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বসিয়া আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাত্রের সম্মতি লাভ বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন।

প্রবীণ কর্ম্মচারী গুরু মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মহাশয় ভাল বুঝিলেন না। এ বিষয়ে সম্মত না হওয়ায়, আপনার বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এত বড় লোকের জামাতা হওয়া বড় ভাগ্যের কথা। সকল বিষয়-সম্পত্তি আপনারই হইবে, দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যাইবে, পরম সুখে জীবন কাটাইতে পারিবেন। একটা নাম মাত্র বিবাহ করিলেই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যায়। কেন আপনি অমত করিতেছেন? অমত করিয়া কোন লাভ নাই। হয় তো প্রাণ লইয়াও শেষে টানাটানি বাধিবে। কর্ত্তা রাগ করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"অকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করার অপেক্ষা সর্ব্বনাশ আর নাই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কার্য্য করিব না। আমার দুঃখ-দুর্দ্দশায় আমি বেশ সুখে আছি। ধন-সম্পত্তিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া, অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, যদি প্রাণ দিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? এ দেহ চিরস্থায়ী নহে। ইহার মমতায় পাপ কেন করিব?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ভণ্ড ধার্ম্মিক! যখন লুকাইয়া রাত্রিকালে আমার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, তখন পাপ হয় নাই? যখন আমার ধর্ম্মশীলা কন্যাকে নানারূপ পাপের ও আমোদের লোভ দেখাইয়া পাপের পথে মজাইয়াছ, তখন অধর্ম্ম হয় নাই? যখন আমার সরলা কন্যার মন মাতাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তখন পাপ হয় নাই? এখন তাহাকে বিবাহ করিলে তোমার কৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহাতে তুমি অনিচ্ছুক। ধিক্ তোমাকে!"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"মহাশয় যে সকল পাপের কথা বলিতেছেন, যদি তাহার কিছু আমি জানিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যাকুল হইতাম। আমি সে সকল ব্যাপারের কিছুই জানি না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"আমার কন্যা ও দাসী তোমার

মুখের উপর সমস্ত কথা বলিল, তথাপি তুমি তাহা মানিতেছ না? সরলা কুলবালা নিতান্ত মনঃপীড়া না পাইলে এমন কুকর্ম্মের কথা পিতার সম্মুখে ব্যক্ত করিতে পারে কি? তোমাকে এখনই রঙ্গিণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। আমি এ বিষয়ে কোন আপত্তি শুনিব না।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"আমি কখনই তাহা করিব না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বুঝিলাম, সহজে ও সরলভাবে তুমি সম্মত হইবে না। যাহাকে এখনই জামাতা করিতে হইবে, তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু দেখিতেছি, লাথির কাঁটাল কিলে পাকে না। বাগদিরা বসিয়া কি দেখিতেছিস্? এই বেটাকে জোর করিয়া বাটীর মধ্যে টানিয়া লইয়া চল্।"

তৎক্ষণাৎ যমদূতোপম সেই চারি ব্যক্তি গুরু মহাশয়ের নিকটস্থ হইল এবং তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল,--"চল ঠাকুর, কেন দুঃখ পাও?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"আমার যাইতে ইচ্ছা নাই, আমি যাইব না।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"মিষ্ট কথায় কাজ হইবার হইলে এতক্ষণ হইয়া যাইত। জোর করিয়া লইয়া যা।"

একব্যক্তি গুরু মহাশয়ের হাত ধরিয়া টানিল, কিন্তু

তাঁহাকে একটুও সরাইতে পারিল না। সে আর এক-জনকে সাহায্য করিতে বলিল। দুই জনে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাকে নড়াইতে পারিল না। তখন তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"কেবল আধ কাঠা চালের ভাত মারিতে মজবুত। একটা মানুষকে নড়াইতে পারিস্ না?"

সে আর দুজনকে সরিতে বলিয়া, আপনি প্রাণপণ শক্তিতে গুরু মহাশয়ের হস্তাকর্ষণ করিল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। তখন সে বলিল,—"তাই তো!"

পূর্ব্ব দুই ব্যক্তির একজন বলিল,—"তুই বুঝি পোন কাঠা চালের ভাত গিলিস্, তাই তোর এত জোর?"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"তোমরা কেন কষ্ট করিতেছ ভাই? যাইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

এক বাগদি বলিল,—"তোমার তো ইচ্ছা নাই; কিন্তু আমরা মালিকের হুকুম রদ করি কিসে?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"চারিটা মরদ, একটা মানুষকে ডোলাডোল করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিলি না?"

তখন অপমানিত বাগদি চতুষ্টয় গুরু মহাশয়ের উভয় বাহু ধারণ করিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিল, গুরু মহাশয় বিচলিত হইলেন না। তিনি আপনার বাহুদ্বয় একটু ঠেসিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ বাগদিরা "বাপরে" বলিয়া

হাত ছাড়িয়া দিল। একজন বলিল,—"কর্ত্তা, এ মানুষ নয়। আমরা নাচার।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"হারামজাদা বেটারা কোন কর্ম্মের নয়। গোহাল হইতে গরুর দড়া আন। হাত পা বাধিয়া ফেল। তাহার পর তোরা তুলিয়া লইয়া যা।"

একজন দড়া আনিয়া ফেলিল। গুরু মহাশয়ের শক্তি দেখিয়া বাগদিরা বিস্মিত হইয়াছে; তাঁহাকে কায়দা করিবার জন্য তাহাদের অতিশয় জেদ হইয়াছে। দড়ার পরামর্শ তাহারা অতি ভাল বলিয়া মনে করিল। দড়া আনিলে তাহারা গুরু মহাশয়কে বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তিনি কোনই আপত্তি করিলেন না; কেবল বলিলেন,—"আমি যখন কোন মতেই বিবাহ করিব না, তখন আমাকে বাঁধিয়া বিবাহ স্থানে লইয়া গিয়া কি লাভ হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বিবাহ তোমাকে করিতেই হইবে।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"কিরূপে? আমি মন্ত্র বলিব না, কোন কার্য্য করিব না। তবে বিবাহ হইবে কিরূপে?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"তা হউক, আমি কন্যাকে রীতিমত সম্প্রদান করিব, অন্যান্য অনুষ্ঠানও হইবে। তাহা হইলেই বিবাহ হইবে।"

বেশ করিয়া দড়া বাঁধা হইল। তখন এক বাগদি বলিল,—"এবার ধর ভাই সব, ঠাকুরকে তুলিয়া লইয়া চল।"

গুরু মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিবদ্ধ হস্তদ্বয়ে একটু বলপ্রয়োগ করিলেন, পদদ্বয় একটু ফাঁক করিলেন। হাত পায়ের দড়া, সামান্য সূতার মত পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"বুঝিতেছি এ লোকের গায়ে অসাধারণ শক্তি; ইহাকে জব্দ করিতেই হইবে। মারিয়া কাবু কর, তাহার পর যাহা হয় হইবে।"

বাগদিরা বলিল,—"লোকটা মন্ত্র জানে, লাঠি ইহার গায়ে লাগিবে না, মারিলে কোন ফল হইবে না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,— "না হয় না হইবে, মার বেটাকে।"

প্রহারের উদ্যোগ হইল; দুই চারি ঘা লাঠি গুরুমহাশয়ের পৃষ্ঠদেশে পড়িল। তিনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন। লাঠি থামিল না দেখিয়া, গুরু মহাশয় একজনের লাঠি ধরিয়া ফেলিলেন; তাঁহার হাত হইতে লাঠি ছাড়াইয়া লইতে সাধ্য হইল না। গুরু মহাশয় লাঠি গাছটি কাড়িয়া লইলেন। যে বাগদীর লাঠি সে তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। লাঠি গাছটা পদনিম্নে স্থাপন করিয়া গুরু মহাশয় আর এক জনের লাঠি কাড়িয়া

লইলেন। ক্রমে চারি ব্যাক্তির লাঠিই কাড়িয়া লওয়া হইল, কেহই কিছু করিতে পারিল না। তখন বাগদীরা একটু দূরে আসিয়া গুরু মহাশয়কে প্রণাম করিল এবং তাহাদের একজন বলিল,—"আমাদের কসুর মাপ কর ঠাকুর; নিশ্চয়ই তোমার পিছনে দেবতার দৃষ্টি আছে। তোমার মত ওস্তাদ দল বাঁধিলে মুলুক মারা যায়।"

বাহিরে যখন এই সকল কাণ্ড চলিতেছে, তখন অন্তঃপুরে রঙ্গিণী একাকিনী চিন্তা-মগ্না। সেই সময় তাঁহার সেই দাসী সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কাণে কাণে কি বলিল। তৎক্ষণাৎ অতি ব্যস্ততা সহ, দাসীর সঙ্গে রঙ্গিণী প্রস্থান করিলেন এবং অন্তঃপুরের দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া দেখিলেন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও নিতান্ত ব্যাকুল ভাবাপন্ন ঘনশ্যাম তথায় দণ্ডায়মান।

রঙ্গিণী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি? কাজ শেষ করিয়াছ তো?"

ঘনশ্যাম অনুচ্চ স্বরে বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে; কিছুই হইল না। কাজ শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম প্রায়; হঠাৎ বড় বাধা উপস্থিত হইয়াছে।"

"বাধা কিসের?"

"সর্ব্বনেশে বাধা। আমাকে এখনই এদেশ হইতে পালাইতে হইবে, তোমাদের অনেক বিপদ ঘটিবে। আর তোমার সহিত কখন দেখা হইবে না। সুন্দরি,

তুমি আমাকে বড়ই দয়া কর। এখন আমার পরামর্শ মত চলিবে কি? আইস, আমরা এখনই এখান হইতে পলায়ন করি।”

রঙ্গিণী বলিলেন,—“কি হইয়াছে, বল আগে।”

ঘনশ্যাম বলিল,—“তোমদের গুরু মহাশয় আর কেহ নহেন, স্বয়ং রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর, সর্ব্বস্ব দান করিয়া এখানে লুকাইয়া আছেন। সর্ব্বস্ব নষ্ট হইলেও, তাঁহার যে মান সম্ভ্রম আছে, লোকের অগাধ টাকায় তাহা হয় না, সাহসে তাহা হয় না, চেষ্টায় তাহা হয় না। কোম্পানি তাঁহার সহায়। অনেক সন্ধান করিয়া তাঁহার বড় বড় আপনার লোকেরা আজি এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি অনেক কষ্টে তাঁহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছি; কিন্তু সে উদ্ধার পাওয়ার ফল কিছু নাই। এখনই তাহারা এখানেও আসিয়া পড়িবে, আমাকে তাহারা খুন করিবে, তোমাদেরও অনেক বিপদে ফেলিবে। কিন্তু সুন্দরি, আমার যে বিপদই হউক, তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে আমি পারিব না, তাই এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি।”

রঙ্গিণী বলিলেন,—“তাহা হইলে এখানে থাকিলে আমাদের কোন আশাই মিটিবে না, আর তোমারও বিপদ ঘটিবে। এ অবস্থায় তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই উচিত বোধ করিতেছি। তবে চল যাই, এই সময়

বাটীর লোক খুব ব্যস্ত আছে, যাইবার ঠিক সময়ই এই।”

ঘনশ্যাম বলিল,—“কিন্তু প্রাণেশ্বরি, টাকা কড়ি অলঙ্কার পত্র যতদূর পার সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত নয় কি? নহিলে বিদেশে আমাদের বড় কষ্ট হইবে।”

রঙ্গিণী বলিলেন,—“ঠিক কথা। আমি সব আনিতেছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।”

ঘনশ্যাম বলিল,—“একটু কেন বলিতেছ ভাই? যদি রাজার লোকেরা এখনই আমাকে কাটিতে আইসে, তথাপি তোমাকে ছাড়িয়া এক পাও আমি সরিয়া যাইব না।” দাসীকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গিণী প্রস্থান করিলেন। ঘনশ্যাম মনে করিল, এখন টাকা কড়ি বেশী আনিতে পারিলে হয়; তাহার পরে বিদেশে গিয়া যাহা করিব, তাহা এখন আর ভাবিয়া কাজ কি?

রঙ্গিণী ও তাঁহার ঝি অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। দাসীর হাতে প্রকাণ্ড এক গাঁটরি; তাহা টাকা, নোট, সোণা, রূপা, দামী কাপড়ে পূর্ণ। রঙ্গিণী আসিয়া বলিলেন,—“সব আনিতে পারিলাম না, সময়ে কুলাইল না, ভাল ভাল অনেক জিনিষ আনিয়াছি, খুচরা কিছু কিছু বাকী আছে।”

গাঁটরি ঘনশ্যাম মাথায় করিয়া লইল এবং বলিল,—“থাক, তুমি যে আনিয়াছ, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।

তা খুচরা জিনিষগুলা পড়িয়া থাকিবে কেন? তোমার ঝি বড় বিশ্বাসী, তাহাকে তো সঙ্গে রাখিতে হইবে, সে কেন খুচরা জিনিষগুলা লইয়া ধীরে সুস্থে আসুক না।"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"সে আবার কোথায় আমাদের সহিত মিলিবে।"

ঘনশ্যাম বলিল,—"পলাশডাঙ্গায়—এখান হইতে আড়াই ক্রোশ তফাৎ, সেখানে আমি ভাল যায়গা ঠিক করিয়া আসিয়াছি।"

ঝি বলিল,—"আমি পলাশডাঙ্গা জানি, আমি সেখানে যাইতে পারিব"

রঙ্গিণী বলিলেন,—"তবে বাকী জিনিষ-পত্র যত পারিস্ লইয়া তুই আয়, আমরা আগে যাই।"

ঝি বলিল,— "আচ্ছা।"

তাহার পর সেই গভীর নিশীথে যুবতী সুন্দরী রঙ্গিণী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, পাষণ্ড ঘনশ্যামের সহিত অগ্রসর হইল এবং অচিরকাল মধ্যে অন্ধকারে মিশিয়া গেল। ঝি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনেকক্ষণ পরে রঙ্গিণীর জননী কন্যার সন্ধান করিলেন। রঙ্গিণী কোথায়ও নাই। কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল না। রঙ্গিণীর দাসীও কোন কথা বলিল না। বড়ই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। ক্রমে সংবাদ বাহিরে আসিয়া পৌছিল। গুরু মহাশয়ের নির্য্যাতন বন্ধ হইয়া

গেল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যাকুল ভাবে উন্মাদের মত বাটীর মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায়, উদ্বেগে আত্মীয়গণ ব্যথিত হইলেন।

যেখানে বিবাহের উৎসবের আয়োজন হইতেছিল, সেখানে দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুপাত, আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। আনন্দোচ্ছ্বাস সহসা হাহাকারে রূপান্তরিত হইল। রঙ্গিণীর কোনই সন্ধান হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

উষা সমাগমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে বহুলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে মহারাণী করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার পশ্চাতে নবীনকৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ, রামহরি, জরিফ ও অন্যান্য অনেক লোক। গুরু মহাশয় তখন প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র তিনি নমস্কারাদি করিলেন এবং বলিলেন,—"বোধ হয় আপনাদের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিতে আমার অধিকার নাই; কারণ আমি এখানে বন্দীরূপে রহিয়াছি।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আমরা সমস্ত ঘটনাই শুনিয়াছি। রায় বাহাদুর মহাশয়ও এখানে আসিয়াছেন। তিনি এখন আপনার গৃহে রাণী মাতার নিকট রহিয়াছেন।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"আমি এ গ্রামে আছি, এ সংবাদ আপনারা জানিলেন কিরূপে?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আপনি রাজবাটী ত্যাগ করার পর হইতে, আমরা নিরন্তর আপনার সন্ধানে ফিরিয়াছি৷ কিন্তু আপনি এতই সাবধানে চলাফেরা করিয়াছেন যে, আমরা কোন ক্রমেই আপনাকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারি নাই। আমরা সকলেই নানা দিকে আপনার নানারূপ সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতেপারি নাই।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"আপনারা এ অধমের জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আত্মীয়গণ এরূপ কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া, আমায় পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। আমার বড়ই অপরাধ হইয়াছে। আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। সম্প্রতি আমি এখানে আছি. আপনারা এ সংবাদ জানিলেন কিরূপে?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"এ সংবাদ জানিবার আমাদের কোনই উপায় ছিল না। গত কল্য স্বয়ং মহারাণী করুণাময়ী মাতা আমার নিকট এ সংবাদ পাঠাইয়াছেন এবং বহু লোক লইয়া, যেরূপে হউক, সন্ধ্যার মধ্যে এখানে উপস্থিত হইতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন মতেই এ স্থানে পৌঁছিতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে যে সময় আসিতে পারিয়াছি, তাহাতেও অনেক অসুবিধা দূর হইয়াছে। সে অনেক

কথা; এখন বলিবার সময় নহে। আপনি আর এখানে বসিয়া কেন? আসুন।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাকে বন্দী থাকিতে হইয়াছে।"

জীবন বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"কে আপনাকে বন্দী করিয়াছে? কি দোষে আপনি বন্দী হইয়াছেন? যিনি আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, তাঁহার হস্তে শাসন ক্ষমতা নাই। তাঁহার আদেশে বাধ্য হইবার কোন কারণ নাই। আপনি আসুন।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,—"তিনি অকারণে অপরাধী করিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি আমার উপকারক, আশ্রয়দাতা। তাঁহার অনুমতি না লইয়া প্রস্থান করা অনুচিত নহে কি?"

চণ্ডীচরণ বলিলেন—"বিশেষতঃ তিনি শ্বশুর; সুতরাং বাপ-খুড়ার অপেক্ষাও পূজনীয়। তাঁহার পদরজ না লইয়া যাওয়া যায় কি? এস তুমি!"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। গুরু মহাশয় বলিলেন,—"খুড়া মহাশয়, আপনাদের চরণধূলিই আমার সম্বল। আপনারা দয়া করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে একটা সংবাদ দিন, তাহার পর আমি আপনাদের চরণাশ্রয়ে গমন করি।"

রামহরি সেই বাগ্দিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোদের মুনিব কোথায় রে?"

একজন উত্তর দিল,—"বাটীর ভিতর।"

জরিফ বলিল,—"শীঘ্র খবর দে না! বেটারা লাট সাহেবের মত বসিয়া আছে। যা—"

কাহাকেও কোন সংবাদ দিতে হইল না। তখনই বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে মাধব চক্রবর্ত্তী সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি, আর কোন দিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়াই, গুরুমহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উৎকট স্বরে বলিলেন,—"তুই নিশ্চয় সব জানিস্। তোরই কৌশলে রঙ্গিণী আমার সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়াছে। তোর জন্য সে পাগল হইয়াছে। তুই তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ তাহার দ্বারা যথেষ্ট টাকা-কড়ি হস্তগত করিয়া অবস্থা ভাল করা তোর অভিপ্রায়। তাই তুই বিদেশে গিয়া স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করিবি, এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিস্। তোরই একজন লোক তাহাকে লইয়া গিয়াছে। বল্ হতভাগা, আমার কন্যা কোথায় আছে? নহিলে আজি তোকে খুন করিব।"

তাহার পর সহসা চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলি-লেন,—"এখানে এত লোক কেন? তোমরা কে? এখানে কেন আসিয়াছ?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"আপনি অন্যায় পূর্ব্বক

যাঁহার উপর উৎপীড়ন করিতেছেন, আমরা তাঁহার পরম আত্মীয়।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“তাই তো! এ বেটা সত্যই কি ভোজবিদ্যা জানে? ইহার গায়ে অসুরের বল, বিপদে বা দুঃখে নিশ্চিন্ত, থাকে অতি দীনদরিদ্রের মত; কখন ইহার একটা চেনা লোকও তো দেখি নাই। আজি হঠাৎ কি মন্ত্রবলে বেটা এত আত্মীয় জুটাইয়া ফেলিল! তা হউক, আত্মীয় মহাশয়েরা আপনারা আসিয়াছেন বলিয়াই যে এ বেটা নিস্কৃতি পাইবে, এরূপ মনে করিবেন না। এ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার সতী ধর্ম্মশীলা কন্যাকে এ বেটা পাপের পথে লইয়া গিয়াছে। শেষে তাহার দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইয়া, অন্য লোকের সহিত এক্ষণে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছে।”

জীবন বাবু বলিলেন,—“মিথ্যা কথা। সাবধানে কথা কহ। যে মহাত্মার নামে তুমি এই কুৎসা আরোপ করিতেছ, তিনি দেবতা। লোকে তোমার কথা কখনই বিশ্বাস করিবে না। ঘনশ্যাম নামে এক দুশ্চরিত্র পাষণ্ডের সহিত তোমার কন্যা চলিয়া গিয়াছে। তোমার কন্যা এত দিন মনে মনে ব্যভিচারিণী ছিল, এখন সে কার্য্যতঃ ধর্ম্মহীনা হইয়াছে। সন্ধান করিলে তুমি তাহাদের খুঁজিয়া পাইবে। তোমার শাসনের অভাবে

এবং কন্যাকে সর্ব্ববিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়ায়, এই দশা ঘটিয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহার আর হাত নাই। অকারণ মহাপুরুষের উপর দোষারোপ করিও না।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—“বেশ লোক তো তুমি! ধমকাইয়া কাজ সারিতে চাহ না কি? এই ব্যক্তির কুহকে পড়িয়া আমার কন্যা ধর্ম্মহীনা হইয়াছে। এ ব্যক্তি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও, আমি ইহার সহিত কন্যার বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলাম। বিধবা বিবাহে বেটা কোন মতেই সম্মত নহে। কিন্তু ধনের তো প্রয়োজন, কাজেই আমার সরলা কন্যাকে উপপত্নীরূপে লইয়া গিয়াছে। সকল কথারই প্রমাণ আছে।”

জীবন বাবু বলিলেন,—“কোন প্রমাণ নাই। তোমার দাসী আগা গোড়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমি তোমাকে এখনই তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। রামহরি, আমার সঙ্গের জমাদারকে ডাক তো।”

রামহরি বলিল,—“আজ্ঞে তা আজ্ঞে যাই—তা আজ্ঞে জরিফ যাউক না কেন?” তুমি যাইতে পারিবে না, জরিফ? আজ্ঞে বড় চক্‌চকে তলোয়ার—বড় মস্ত পাগড়ি—আজ্ঞে মস্ত ঢাল। তা জরিফ, যাও না, জমাদারকে ডাক না—কিসের ভয়?”

হাসিয়া জরিফ চলিয়া গেল। চণ্ডীচরণের দিকে রামহরি আর একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

জমাদার আসিল; কিন্তু একা নহে। তাহার সহিত রঙ্গিণীর দাসীও আসিল। রঙ্গিণীর দাসীর হাতে প্রকাণ্ড একটা পিতলের ঘড়া।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"ইহাকে তোমরা কোথা পাইলে? এ কেন আসিল?"

জীবন বাবু বলিলেন,—"রঙ্গিণী যখন ঘনশ্যামের সঙ্গে পলাইয়া যায়, তখন পথে আমরা তাহাদের ধরিয়াছিলাম। তাহারা যে বুদ্ধিতে যেখানে যাইতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। এখন তাহারা যেখানে আছে, তাহাও বোধ হয় আমরা বলিতে পারি। এই দাসী তাহাদের অনুসরণ করিবে কথা ছিল। তাড়াতাড়িতে যে সকল জিনিব তাহারা গুছাইয়া লইতে পারে নাই, দাসী তাহা লইয়াছে। এই ঘড়ায় তাহা আছে।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"এই দাসীই তো আমাকে বলিয়াছে, গুরু মহাশয় আমার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"বলুক। যাহা এ বলিতে চাহে, বলুক।"

ঝি বলিল,—"আর মিথ্যা বলিব না; বুঝিয়াছি আর মিথ্যা কথা চলিবে না। আমি দিদি ঠাকুরাণীর মতলবে অনেক মিথ্যা বলিয়াছি। এত শীঘ্র ধরা পড়িতে হইবে, এত সহজে আমাদের সব পরামর্শ ছিঁড়িয়া যাইবে তাহা

আমি একবারও জানিতাম না। গুরু মহাশয় যাহা বলিয়া আসিতেছেন, আর এখন এই বাবু যাহা বলিতেছেন, তাহাই সত্য। আমাকে আপনারা যাহা হয় করুন।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—“তোর কোন্ কথা ঠিক? আমি তোকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়া ছাড়িব।”

নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—“আপনি বসিয়া বসিয়া ক্রমে ক্রমে যত পারেন শিক্ষা দিবেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আপাততঃ আপনার গ্রামের যিনি শিক্ষক, তাঁহাকে এখন ছাড়িয়া দিউন।”

জীবন বাবু বলিলেন,—“ছাড়িয়া দেওয়া বা ধরিয়া রাখার কর্ত্তা উনি নহেন। আসুন গুরু মহাশয়, আমাদের কাছে আসুন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আপনি আমাদের নিকট যাহা শুনিয়াছেন তাহাই সত্য। এখনও চেষ্টা করিলে, পলাশডাঙ্গা গ্রামের চটীতে আপনার কন্যাকে দেখিতে পাইবেন। এখন ঘনশ্যাম আপনার উপজামাতা। আমরা বুঝিতেছি, পরিণামে আপনার কন্যার আরও অমঙ্গল হইবে। আপনার অবস্থা দেখিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইতেছি; কিন্তু আপনি ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আপনার আদরে, আপনার স্নেহে, আপনার বিবেচনার অভাবে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমরা এক্ষণে বিদায় হইব।”

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"আপনি কে? গুরু মহাশয়ের সহিত আপনার কি সম্বন্ধ? কেন আপনি ভোর বেলা আসিয়া ইঁহাকে লইয়া যান? আপনার সহিত সিপাহী কেন? এ সকল কথা না বলিলে আমি গুরু মহাশয়কে ছাড়িব না।"

জীবন বাবু বলিলেন,—"কোন কথাই বলিতে আমরা বাধ্য নহি।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"বলিতে আমরা বাধ্য বই কি! আপনি আমার উপবৈবাহিক হইবার চেষ্টায় ছিলেন, সুতরাং আপনার সঙ্গে কি অসৌজন্য করা সাজে? এই যে আপনাদের গুরু মহাশয়, যাঁহাকে উপজামাতারূপে পাইলেও আপনি চরিতার্থ হইতেন, ইনি রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর। একি! হা করেন কেন উপবিহাই?"

বাস্তবিক চক্রবর্ত্তী মুখ ব্যাদান করিলেন। একজন বাগদি বলিল,—"মোরা কিছুই জানি না। মোদের কসুর মাপ কর বাবা। তাতেই বলি, এ যে মানুষ নয়—দেবতা।"

চণ্ডীচরণ বলিলেন,—"চুপ কর্ বেটারা! দূর হ! উপবিহাই মহাশয়, কৃপা করিয়া হা টা একটু কমাইয়া ফেলুন। কেন না, আবার আরও হা করিতে হইবে; তাহার স্থান কোথায়? আর এই যে মহাশয়টীকে দেখিতেছেন, ইনি চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবীর

দেওয়ান জীবন বাবু! একি! আর হা করিবেন না, চোয়াল ফাটিয়া যাইবে।”

জীবন বাবু বলিলেন,—“আপনার সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়াছি। এক্ষণে বেলা অনেক হইয়া উঠিল, আমরা প্রস্থান করি।”

রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন,—“চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি এক্ষণে বিদায় হই-তেছি। আপনাকে প্রণাম করি।”

চণ্ডী বলিলেন,—“উপ-শ্বশুরকে ভাল করিয়া প্রণাম কর বাবাজি। উপ-শাশুড়িটী কোথায়? এদেশে বিধবা, সধবা, আসল, নকল সব বিবাহই চলে। আমি তোমার শ্বাশুড়িটীর একটা গতি করিলেও করিতে পারিতাম। যাই হউক, এখন আমরা বিদায় হই উপ-বিহাই। যাইবার সময় তোমার একবার কাণ মলিয়া না দিলে, কুটুম্বিতার মত কাজ হয় না।”

চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিরুত্তর। অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল বিরোধী ঘটনা ঘটিল, তাহা ভাবিয়া তিনি অবাক্। কার্য্য-কারণ কিছুই তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অপমান ও মনস্তাপ যথেষ্ট ঘটিল। তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। রাজা উমাশঙ্কর, জীবন বাবু প্রভৃতি সকলে প্রস্থান করিলেন। তখন বেলা আটটা হইয়াছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীর এই সকল ঘটনা নানারূপ

আকার ধারণ করিয়া গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যক্ত হইল যে, বনপুরের গুরু মহাশয় আর কেহ নহেন,—তিনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পরম দয়াময় রাজা উমাশঙ্কর বাহাদুর। তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া একটা দেশ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার বাক্য যেমন সুমিষ্ট, কার্য্য যেমন পবিত্র, দয়া তেমনই অসীম। সেই মহাত্মাকে রাজা বলিয়া না জানিয়াও, গ্রামের লোকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছে ও ভক্তি করিয়াছে। আজি গুরু মহাশয় রাজা ও ঠাকুরাণী রাণীকে দেখিবার জন্য দলে দলে নর-নারী তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল।

রঙ্গিণীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে পলাশডাঙ্গায় ঘনশ্যামের সহিত স্ত্রী-পুরুষরূপে বাস করিতেছে। সে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছে যে, গুরু মহাশয় কোন পাপে পাপী নহেন। সে আর ঘরে ফিরিতে চাহিল না, চক্রবর্ত্তীও তাহাকে ঘরে লইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি বুঝিয়াছেন, স্ত্রীলোকের স্বাধীন ইচ্ছা বাড়িতে দিলে সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চিত্তস্থৈর্য্যের সহায়তা করিতে পারে সত্য; কিন্তু বাসনা বিনিবৃত্তি করিবার অভ্যাস হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে, পতন অপরিহার্য্য। আর্য্যজাতির নারীগণ বাল্যকাল হইতেই লালসা ত্যাগ করিতে শিক্ষা পায়। আবশ্যক হইলে যথাকালে ব্রহ্মচর্য্য

প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান তাহাদের ভোগ-প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সহায়তা করে। তাঁহার কন্যার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বাসনানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে তিনি প্রতিঘাত করেন নাই। বরং তনয়ার বাসনা সিদ্ধির পথ হইতে কণ্টক দূর করিয়া তিনি তাহা ক্রমনিম্ন করিয়া দিয়াছেন। তাহার সমুচিত ফল ফলিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় এজন্য আর দুঃখ ও শোক করিলেন না। অনতিকাল পরে তিনি, এক দত্তক গ্রহণ করিয়া, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে আরও ভয়ানক সংবাদ আসিল। রঙ্গিণীকে হত্যা করিয়া এবং তাহার অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া ঘনশ্যাম পলায়ন করিয়াছে; অনতিকাল পরে আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে,রাজবিচারে সেই দুরাত্মার ফাঁসির ব্যবস্থা হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা ।

দ্বাদশ খণ্ড—সমাপ্তি ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তকাল।

উন্মাদিনী বিধুমুখীর অবস্থা বড়ই ভয়ানক হইয়াছে। সে আর এখন গান করে না। একস্থানে স্থির হইয়া থাকে না, মৃদুস্বরে কথা কহে না, কাহারও কোন কথা শুনে না। উন্মাদিনী অঙ্গের বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, অতিশয় চীৎকার করিয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন কোলাহল করে, কখন কখন বিকট হাস্য করে, এবং এক দণ্ডও একস্থানে স্থির থাকে না। শ্যামলাল তাহাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। তাহাকে ধরিয়া ও আটকাইয়া রাখা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছে। বিধুমুখীর রূপ গিয়াছে, যৌবন গিয়াছে, শোভা গিয়াছে। তাহার অনিন্দ্য সুন্দর বর্ণ এখন মলিনতায় আচ্ছন্ন, রোগে বিকৃত, অযত্নে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার দেহের সুগোল গঠন এখন শীর্ণ, কুৎসিত ও বিরূপ হইয়াছে; তাহার মস্তকের কেশরাশি এখন অনেক উঠিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহাও ক্ষুদ্রকায়, মলিনতাচ্ছন্ন, অপ্রিয় দর্শন হইয়াছে; তাহার কুটিল-কটাক্ষ-পূর্ণ নয়নের সে দৃষ্টি

অপগত হইয়াছে; তাহার উজ্জ্বলতা গিয়াছে; প্রখরতা নষ্ট হইয়াছে এবং মোহময়তা ধ্বংস হইয়াছে। তাহার দেহে বস্ত্র নাই বলিলেই হয়; যে সামান্যমাত্র বস্ত্রখণ্ড তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা খসিয়া পড়িলে সে ব্যাকুল হয় না, সে বস্ত্রের অভাব অনুভব করে না; তাহার লজ্জা নাই, বিলাসিতা নাই, আনন্দ নাই, সুখ নাই; তথাপি সে আছে। হায়! এই কি সেই বিলাসময়ী, লাবণ্যোজ্জ্বল কায়া, সৌন্দর্য্যসম্পদ্‌সম্পন্না বিধুমুখী!

অতি যত্নে শ্যামলাল তাহাকে আপনার সেই আশ্রমে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে বড়ই বিব্রত হইতে হইয়াছে। বিধুমুখী কথা শুনে না, ঔষধ খায় না, আহার করে না, একস্থানে থাকিতে চাহে না। তথাপি শ্যামলাল অবিরক্ত চিত্তে নিরন্তর পীড়িতার সেবা করিতেছেন। জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে হয়, অনেক কষ্টে তাহাকে ঔষধ খাওয়াইতে হয়, অনেক যত্নে তাহার শুশ্রূষা করিতে হয়।

নীলরতন বাবুর যত্নের ত্রুটি নাই। তাঁহার উদ্বেগ ও মানসিক ক্লেশের সীমা নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শ্যামলাল ও বিধুমুখীর সংবাদ লইতে কখনই বিরত নহেন। তাঁহার জামাতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, গৃহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক কোথায় গিয়াছেন, তাহার সন্ধান নাই।

দৌহিত্র বিগতজীব হইয়াছে, ইত্যাকার বিবিধ দুশ্চিন্তার মধ্যেও তিনি চিত্ত-স্থৈর্য্য রাখিয়া অন্যান্য কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হন নাই। রায় হরকুমার বাহাদুরের বুদ্ধি বিদ্যার উপর তাঁহার প্রবল বিশ্বাস আছে, সে রায় বাহাদুর এখনও কাশী ফিরিয়া আইসেন নাই। ইহা একটা আশ্বাসের কথা। আর তিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার জামাতার অনুগত লোকজন এবং মহারাণী করুণাময়ী দেবীর দেওয়ান প্রভৃতি লোকেরা রাজার সন্ধানে আছেন। তিনি এই সকল ব্যক্তির আয়াসের সফলতার আশায় আশান্বিত।

নীলরতন বাবুর নিয়োজিত ডাক্তার আসিয়া নিয়মিতরূপে বিধুমুখীকে দেখিয়া যান, তাঁহার লোক ঔষধ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিয়া দেয়, তিনি স্বয়ং সতত সন্ধান লন এবং আবশ্যক মত অর্থাদি প্রদান করেন।

বিধুমুখীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ। আহার অভাবে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; বিধুমুখী শয্যা গ্রহণ করিল; উঠিয়া চলা ফেরা তাহার অসাধ্য হইল। তথাপি সে উঠিবার ও ছুটিবার চেষ্টা করে; তথাপি সে শুইয়া শুইয়াও অকারণ হাত নাড়ে, পা নাচায়, মাথা দোলায়। দুর্ব্বল হওয়ায় তাহার অনেক অত্যাচার বন্ধ হইল বটে; কিন্তু চীৎকার করা, হাস্য করা, রোদন করা বন্ধ হইল না।

শ্যামলাল বুঝিলেন, তাঁহার এ সেবা-কার্য্যের শেষ হইয়া আসিতেছে। তিনি একদিন নীলরতন বাবুকে সেই কথা বলিলেন। নীলরতন বাবু বলিলেন, এখনও কোন কথা বলা যায় না। অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতেছে বটে; কিন্তু এখনও অন্যদিকে ফিরিতে না পারে এমন নহে। আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। শ্যামলাল বুঝিলেন, রোগীর অবস্থা আরও মন্দ। তিনি ডাক্তারকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার বলিলেন,—কি আর বলিব? জীবনের কোন আশা নাই। আর দুই তিন দিনেই সব শেষ হইবে।"

যাহা কখন হয় নাই, তাহা হইল। শ্যামলাল আপনার জন্য কখন কাঁদেন নাই; পরের দুঃখে কখন এক ফোটা চক্ষুর জল ফেলেন নাই; তাঁহার চরণ ধরিয়া কত সুন্দরী নয়নজল ঢালিয়াছে। তাঁহার প্রাণ তাহাতেও গলে নাই। আজি তাঁহার নয়ন জলভারাকুল হইল। পাষাণে অমৃতধারা বহিল; মরুস্থলে সুশীতল সলিল পরিদৃষ্ট হইল। কেন এরূপ হইল? শ্যামলাল জীবনে কাহাকেও আপনার বলিয়া মনে করেন নাই, জীবনে কাহাকেও ভাল বাসেন নাই, কাহারও ভালবাসা পান নাই, আপনার তুচ্ছ ভোগসুখ ভিন্ন আর কিছুই বুঝেন নাই। তাই তাঁহার প্রাণ কাহারও জন্য কাঁদিতে শিখে নাই। বিধুমুখী ঘাড়ে পড়িয়াছে, দায়গ্রস্ত হইয়া শ্যামলাল তাহার

সেবা করিতেছেন, সে তাঁহারই জন্য উন্মাদিনী হইয়াছে। সে তাঁহার নিকট অপরাধ-জনিত অনুতাপে মৃতকল্প হইয়াছে, সে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, সে তাঁহারই অনাদরে ধর্ম্মহীনা, ইত্যাদি চিন্তা হইতে বিধুমুখীর আরোগ্য কামনা জন্মিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই কঠোর শিলা একটু বিগলিত হইয়াছে।

ডাক্তার চলিয়া গেলে শ্যামলাল পীড়িতার নিকট বসিলেন এবং অতি কোমল ভাবে তাহার দেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এইরূপ হাত বুলাইয়াই তিনি হয়তো তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন।

বিধুমুখী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"আঃ! তুমি কে? কেন জ্বালাতন কর? বাঃ বাঃ লাথি মার—মার—আবার মার।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"বিধুমুখী, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি তোমাকে জ্বালাতন করিতেছি না, তোমার গায়ে হাত বুলাইতেছি।"

বিধুমুখী বাধা দিয়া বলিলেন,—"ওঃ বড় শক্ত তোমার পা! উঁহু, আর মারিও না—আমার বড় লাগিতেছে—ক্ষমা কর।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"চুপ কর। কেহ তোমাকে মারিতেছে না। তোমাকে মারিবে কেন? সকলেই তোমাকে যত্ন করিতেছে, কত আদর করিতেছে।"

পাগলিনী সে কথা শুনিল না। সে ভয়ানক হাস্য করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"তুমি আসিয়াছ? গুরুদেব! প্রণাম করি। নরকে তুমি কেন? নরকের শোভা ফুটিয়া উঠিল। ঐ রাণী, ঐ দেবী, আহা! কি সুগন্ধ।"

উন্মাদিনী চুপ করিল। যেন কি দূরের বস্তু দৃষ্টি-সংযত করিয়া মনঃসংযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল। এইরূপে পরদিন কাটিয়া গেল। তাহার পরদিন বিধু-মুখীর অবস্থা বড় মন্দ হইল। প্রাতঃকাল হইতেই তাহার কণ্ঠস্বর সংক্ষুব্ধ হইল এবং তাহার অস্থিরতা কমিয়া গেল। শ্যামলাল রোগ শোক বড় দেখেন নাই এবং কখনও পীড়িতের সেবাও করেন নাই। তিনি এ পরিবর্ত্তন বড়ই শুভসূচক বলিয়া মনে করিলেন এবং ডাক্তার আসিলে, তাঁহাকেও সেইরূপ বলিলেন।

ডাক্তার রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"আজি রোগীর অবস্থা বড় মন্দ। নাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ। রোগীর কথা বন্ধ হইয়াছে এবং তিনি স্থির হইয়া আছেন। এ দুইটী আপনি শুভলক্ষণ বলিয়া মনে করিতেছেন, কিন্তু এ দুইটী বড় দুর্লক্ষণ, রোগীর অতিশয় দুর্ব্বলতা হইয়াছে, সেই জন্যই স্বরভঙ্গ ঘটিয়াছে এবং অঙ্গ-চালনা বন্ধ হইয়াছে। আজি কি হয় বলা যায় না।"

শ্যামলাল কিছু বলিলেন না। কিন্তু তিনি হৃদয় মধ্যে

এক অননুভূতপূর্ব্ব তীব্র যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে তিনি হৃদয়ের শোক নিবারণ করিয়া রহিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন, হয়তো ডাক্তারের বুঝিবার ভুল হইয়াছে। এমন ভুল তো মানুষের হওয়া অসম্ভব নহে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর, তখন অনভিজ্ঞ শ্যামলালও বুঝিলেন, পীড়িতার অবস্থা বাস্তবিকই অতিশয় মন্দ হইয়াছে, তাহার আর জীবনের আশা নাই। তখন শ্যামলালের চক্ষু দিয়া জল বহিতেছে। তিনি বলিলেন,—"কেন বিধুমুখী, কেন তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছ? তুমি আমার নিকট যে আদর চাহ, তাহাই আমি দিব; তুমি আমাকে যাহা করিতে বল, তাহাই আমি করিব। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।"

সহসা বিধুমুখীর আবার ক্ষীণস্বরে বাক্য কথনের শক্তি জন্মিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটে। বিধুমুখীর বাক্য উন্মাদপ্রলাপ নহে। অতি মধুর স্বরে সে বলিল,—"মরণে এত সুখ! আমি মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমার কোলে আমার মাথা! তুমি আমাকে আদর যত্ন করিতেছ, আমার জন্য তোমার চক্ষুতে জল! বড় লজ্জার কথা! কিন্তু বড় সুখ! হায়! এ সুখভোগ আমার আর অদৃষ্টে নাই।"

তখন শ্যামলালের সেই ক্ষুদ্র আবাসের দ্বারে বড়ই

কলরব উত্থিত হইল। চন্দ্রমাল্লার মহারাণী করুণাময়ী দেবী কাশী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিয়াছে। কাশীতে সেজন্য একটা ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। দানাদি ব্যাপারের বাহুল্য হেতু চারিদিকে মহারাণীর নাম ঘোষিত হইতেছে। মহারাণীর নানাবিধ সমারোহেরও সীমা নাই। সেই মহারাণী বহু অস্ত্রধারী ও অন্যান্য লোক সঙ্গে লইয়া শ্যামলালের দ্বারে উপস্থিত। লোকেরা মহারাণীর আদেশে বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তিনি গম্ভীর ও ধীরভাবে একাকিনী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সামান্য স্থান সহসা যেন সর্ব্বশোভাময় হইল; সেই মলিন ক্ষুদ্র নিকেতন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্যামলাল সেই দেবীকে দর্শন করিয়া অবাক্ হইলেন। ক্ষণেকের নিমিত্ত হৃদয়ের যাতনা ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার অঙ্কস্থিতা মরণাপন্না নারীর কথা তাঁহার মনে হইল না।

বিধুমুখী কিয়ৎকাল মাত্র মহারাণীকে দেখিয়া বলি-লেন,—"মা আসিয়াছ? এই মরণকালে তোমার কথা কতবারই ভাবিতেছি। আসিয়াছ যদি কৃপা করিয়া, একটু চরণধূলা দেও মা, আমার আর শক্তি নাই।"

তখন মহারাণী আপনার করে স্বকীয় চরণধূলা উঠা-ইয়া বিধুমুখীর মস্তকে প্রদান করিলেন। আর বলিলেন,

—"মা, পতিপদ চিন্তা কর, তাহাতেই সকল দুঃখ জ্বালার শান্তি হইবে। নারীর আর দেবতা নাই, আর গতি নাই।"

বিধুমুখী বলিল,—"তাহাতেও বুঝি আমার অধিকার নাই। আপনি সকলই জানেন। আর কি বলিব?"

মহারাণী বলিলেন,—"সব জানি, সব শুনিয়াছি। সত্যই মা তোমার পাপের সীমা নাই। নারীর এক ভিন্ন দুই স্বামী হইতে পারে না। নারীর দেহ কেবল স্বামীরই সামগ্রী। তিনি যদি ইহা না লন, লইতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলেও, পরকে দিবার কোন অধিকার থাকিতে পারে না। কার্য্যে দূরের কথা; মনে মনেও অন্য কাহাকে স্বামীর স্থানে বসাইবার কল্পনা করিলেও মহাপাপ হয়। তুমি মা, সেই পাপ পূর্ণমাত্রায় অনুষ্ঠান করিয়াছ। তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

বিধুমুখী বলিল,—"আমি তাহা বুঝিয়াছি মা; এই জন্যই পতিপদ ভাবনায় আমার অধিকার নাই বলিয়াছি। জানি না, বুঝিতে পারিতেছি না; আমার কি হইবে।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"আমার বোধ হয় তোমার খুবই ভাল হইবে। যাঁহার নিকট তুমি অপরাধী তোমার সেই স্বামী দেবতা দেখিতেছি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য।"

বিধুমুখী বলিল,—"তিনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন

সত্য ; কিন্তু তাঁহার কৃপাও আমার লজ্জার কারণ হই- য়াছে। এত পাপের উপর সদয় ব্যবহার লাভ করিয়া আমি মরমে মরিয়া যাইতেছি। তিনি আমাকে নিরন্তর ঘৃণা করিলে আমার হয়তো এত যাতনা হইত না। আমার স্বামী পরম করুণাময়—আমি দেখিতেছি তিনি সর্ব্বগুণময়—সর্ব্ব শোভাময়—সর্ব্ব ধর্ম্মময়—সর্ব্ব পূজনীয় পরম দেবতা। আমার দেহমনপ্রাণ যেন তাঁহার চরণে মিশিয়া যাইতেছে।”

করুণাময়ী বলিলেন,—“তোমার অন্তকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অন্তকালে পতির পদে আত্মসমর্পণ করা নারীর ধর্ম্ম। তুমি অবিচলিত চিত্তে সেই ধর্ম্ম পালন করিতে থাক। তাহা হইলে ভগবান্ তোমাকে দয়া করিতে পারেন।”

বিধুমুখী নয়ন মুদিয়া রহিল। শ্যামলাল বলিলেন,— “মা, আপনি কোন্ দেবতা ? ভাগ্যবতী বিধুমুখী আপ- নাকে জানেন, আপনাকে দেখিয়াছেন ; আমি অভাগা জীবনে কখনও আপনাকে দেখি নাই।”

করুণাময়ী বলিলেন,—“বাবা, আমি দেবতা নহি, সামান্য মানুষ। তুমি মহাপুরুষ ঘনানন্দ স্বামীর উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ। তুমি শোক দুঃখ ত্যাগ কর, তোমার পত্নীকে তুমি সরল মনে ক্ষমা কর। পাপের জ্বালায় সে জীবনে নরকভোগ করিয়া অনন্তধামে চলি-

তেছে। তোমার ক্ষমা হইলে তাহার পরকালে ভাল হইতে পারে।"

শ্যামলাল বলিলেন,—"আমার স্ত্রী অপরাধ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমিই প্রকারান্তরে তাহার কারণ, আমি মহাপাপী। বিধুমুখীর তুলনায় আমার পাপ অসীম, বিধুমুখী সামান্য পাপে অসহ্য জ্বালা ভোগ করিতেছে। জানি না আমার অদৃষ্টে কি আছে। আমি সরল ও সন্তুষ্ট মনে বিধুমুখীকে ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু আমাকে বিধুমুখী ক্ষমা করিবেন কি?"

বিধুমুখী চক্ষু মেলিয়া বলিলেন,—"তোমাকে ক্ষমা! তুমি যে দেবতা। দেবতার কি পাপ হয়, মা, আমি আর কথা কহিতে পারি না। সম্মুখে কি দেখিতেছি? কাহারা ওরা?"

করুণাময়ী বলিলেন,—"কিছুই দেখিয়া কাজ নাই; নয়ন মুদিয়া মনে মনে কেবল স্বামীকেই দেখ, ভয় কি?"

বিধুমুখী নয়ন মুদিল। করুণাময়ী বলিলেন,—"বাবা, তুমি রোদন করিও না। তোমার বিধুমুখীকে তুমি আবার দেখিতে পাইবে।"

সহসা বিধুমুখীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল,—"মা, মা, আমি যাই। দেবতা, স্বামী, তুমি জন্মান্তরে চরণে রাখিও,—স্বামী গুরু, আঃ—যাই।"

আর কথা বিধুমুখী বলিল না। করুণাময়ী দেখিলেন,

যন্ত্রণা-পীড়িত বিধুমুখীর জীবন শেষ হইল। শ্যামলাল সেই নারীর মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"আর কাঁদিও না। এ জীবনই আমাদের শেষ নহে। এক্ষণে বিধুমুখীর এই দেহ সম্বন্ধে তোমার অনেক কার্য্য আছে, তাহা স্মরণ করিয়া চিত্ত স্থির কর।"

সাবধানে মৃতার মস্তক ভূতলে স্থাপন করিয়া শ্যামলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মহারাণীর আদেশে কয়েক জন লোক আসিয়া তখনকার ব্যবস্থা স্থির করিল। শ্যামলাল কোমরে গামছা বাঁধিয়া তাহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাতীরে বিধুমুখীর দেহ নীত হইল, যথারীতি সৎকার সমাপ্ত হইল। এ সংসার হইতে তাহার সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুরুশিষ্য।

ঘনানন্দ স্বামীর কঠিন পীড়া হইয়াছে। এ পীড়ায় তাঁহার জীবন রক্ষা হইবে না বলিয়া সকলেই অনুমান করিয়াছেন, বহুসংখ্যক ইংরাজ, বাঙ্গালী ও পশ্চিম প্রদেশ-বাসী পদস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে সমস্ত দিন দেখিতে অসিতে-ছেন। তারযোগে সংবাদ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছে এবং সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার শরীরের অবস্থা প্রতিদিন প্রচারিত হইতেছে। বিদেশের ভক্তগণ সংবাদ পত্রে তাঁহার সংবাদ পাঠ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়া-ছেন। কাশীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রতিদিন বিদেশস্থ ব্যক্তি গণের নিকট হইতে ঘনানন্দ স্বামীর স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক পত্র ও টেলিগ্রাম পাইতেছেন। কাশীর জজ, মাজিষ্ট্রেট এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর নিয়ত তাঁহার সংবাদ লইতেছেন। স্বামী এ পীড়ার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন না এবং এই রোগেই তাঁহার দেহান্ত হইবে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছেন।

বারাণসী ধামের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানেই স্বামী শিষ্যদ্বয়-

সহ বাস করিতেছিলেন, কিন্তু ধনশালী, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্য হেতু তাঁহাকে কাশীনরেশের এক প্রকাণ্ড ভবনে আসিতে হইয়াছে। ভবন গঙ্গাতীরে অবস্থিত, বহ্বায়ত এবং অন্য লোকের দ্বারা অনধিকৃত। ডাক্তার সাহেব, কবিরাজ, হকিম সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া যান। যিনি যে ঔষধ দেন, তাহাই তিনি সেবন করেন এবং যে যাহা অনুরোধ করে তিনি তাহাই পালন করেন। কাহাকেও তিনি মনঃ-ক্ষুন্ন করিতেছেন না, যে হিতৈষী তাঁহার জন্য যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তিনি আপত্তি না করিয়া সেই ব্যবস্থা পালন করিতেছেন। যে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে তাহাকেই তিনি সম্মুখে আনাইয়া দেখা দিতেছেন; যে তাঁহার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহারই সহিত তিনি আলাপ করিতেছেন।

তাঁহার কি পীড়া হইয়াছে, তাহা কেহ জানে না। ডাক্তার কবিরাজ কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, ঘনানন্দ স্বামীর শ্বাস যন্ত্র অতিশয় দুর্ব্বল এবং উত্তরোত্তর অধিকতর দুর্ব্বল হইতেছে তাঁহার আহারে অতিশয় অপ্রবৃত্তি এবং দেহে শোণিতের অতিশয় অল্পতা ঘটিয়াছে, দেহের সর্ব্বত্র একটা বিজাতীয় জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার ও কবিরাজ কেহই এ সকল ব্যাধি অসাধ্য বলিয়া মনে করিতেছেন না। নিয়মিত ঔষধ ও পথ্যাদি সেবনে তিনি সহজেই সুস্থ হইবেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস

করিতেছেন। ঘনানন্দ কাহারও ঔষধ সেবনে বা ব্যবস্থানুরূপ পথ্য গ্রহণে আপত্তি বা ঔদাস্য করিতেছেন না, অনুরাগী ভক্তগণ যখন যাহা বিধেয় বলিয়া মনে করিতেছেন, সন্ন্যাসী তাহাই পালন করিতেছেন, কিন্তু তিনি মৃদু হাস্যসহকারে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছেন যে, তাঁহার দেহ ত্যাগ করার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং অচিরে তাঁহার উৎক্রান্তি ঘটিবে। মহাপুরুষের এই বাক্য শত চিকিৎসকের বাক্যাপেক্ষা বলবান বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন এবং শীঘ্রই যে তিনি মহাপ্রস্থান করিবেন তদ্বিষয়ে অনেকেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

উত্তম ভবনে বাস, যথোপযুক্ত ঔষধ সেবন, নিয়মিত পথ্য গ্রহণ, সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা পালন চলিতে লাগিল, চিকিৎসকেরা বলিতে লাগিলেন, ঠাকুর ভাল হইতেছেন, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ হইতেছে, শরীরে রক্ত সঞ্চয় হইতেছে, এবং তিনি শীঘ্রই রোগ মুক্ত হইবেন, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিতেছেন, তাঁহার দেহান্ত ঘটিবার আর বিলম্ব নাই, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর কালে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। চিকিৎসকের বিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়াও সন্ন্যাসীর বাক্য সকলে বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ করিল এবং শিষ্য ও একান্ত আত্মীয়গণ নিতান্ত ভয় চকিতভাবে সেই দুর্দ্দিন গণিতে লাগিল, সে দিনের আর পাঁচটী দিন মাত্র বাকী।

দর্শনার্থী, পদরজঃ গ্রহণার্থী এবং ভক্তি প্রদর্শনার্থী লোকের সংখ্যা দিন দিন ভয়ানক বাড়িতে লাগিল। কাশীনরেশ এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ লোক সমাগম কমাইবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু ঘনানন্দ বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি অনুমাত্র উত্ত্যক্ত বা ক্লিষ্ট হইতেছেন না, সুতরাং লোকদিগকে মনঃ পীড়া দিবার কোনই আবশ্যকতা নাই।

বহু লোকের মধ্যে দূর হইতে অতি সুশ্রী, বলিষ্ঠ, ও পরিণত কলেবর এক ব্রাহ্মণ যুবা ভূতলে মস্তক স্থাপন করিয়া ঘনানন্দকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। সেই যুবা রাজাবাহাদুর উমাশঙ্কর। মহাপুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেকের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। কাশীতে উমাশঙ্কর এক সময়ে সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল। যাহারা চিনিতে পারিল, তাহারা সম্ভ্রম স্তম্ভিত ভাবে মস্তক নত করিল। যাহারা চিনিতে পারিল না, তাহারা পার্শ্বস্থ লোকের নিকট এই নবাগত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসু হইল। তখন সকলেই বুঝিল, এই ব্যক্তি সন্ন্যাসীর প্রিয় শিষ্য। ভাগ্যবলে ইনি বিপুল ধনশালী হইয়া বঙ্গদেশে রাজা হইয়াছিলেন এবং সমস্ত ধন ব্যয় করিয়া ভারতকে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন আবার ইনি দরিদ্র। তখন সেই লোকসমূহ

সরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা উমাশঙ্করের নিমিত্ত পথ করিয়া দিল। যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই সমবেত লোক সমূহ "জয় রাজা উমাশঙ্করের জয়।" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল। উমাশঙ্কর নত বদনে করজোড়ে নিতান্ত বিনীত ভাবে অগ্রসর হইয়া ঘনানন্দের সমীপস্থ হইলেন এবং তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রণাম করিলেন।

মহাপুরুষ বলিলেন,—"তুমি কখন আসিয়াছ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এই আসিতেছি। লোক মুখে শুনিলাম ভগবান্ দেহ রক্ষার আয়োজন করিতেছেন, এ সংবাদে ব্যাকুলতার কোন কারণ না থাকিলেও, পাছে এ সময়ে একবার সাক্ষাৎ না ঘটে, এই ভয়ে বড় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"ভাল করিয়াছ। তোমাকে অনেক প্রয়োজনীয় ভার গ্রহণ করিতে হইবে, আপাততঃ মা অন্নপূর্ণা কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তিনিও পিত্রালয় গমনের পূর্ব্বেই আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার সহিত এখানে আসিয়াছেন, এখানে বড়ই জনতা; সুতরাং নিকটে আসার সুবিধা না হওয়ায় নীচের এক কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তাঁহাকে আমার পূর্ণ হৃদয়ের

আশীর্ব্বাদ জানাইবে, এ বেলা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তুমি নীলরতন বাবুর বাটীতে যাও। অদ্য রাত্রি কালে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। তখন বিস্তারিত বৃত্তান্ত শুনিব ও বলিব। রায় বাহাদুর প্রভৃতি আত্মীয়গণ কোথায়?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"একটু পিছাইয়া পড়িয়াছেন। এখনই আসিবেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহারা অতিশয় ব্যাকুল আছেন। বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মা আসিয়াছেন কি?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আসিয়াছেন, শুনিয়াছি, কিন্তু আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বহু দিন মাতৃ চরণ দর্শনে বঞ্চিত আছি। অনেক আবিলতায় পড়িয়াছি। অনেক পঙ্ক গায়ে মাখিয়াছি, অনেক সুখ দুঃখের চিত্র দেখিয়াছি, এক্ষণে বাপ মার ছেলে বাপ মার কোলে মাথা রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছে। পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছেন, মা কি করিবেন জানি না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কি করিবেন তাহা এখন ভাবিয়া কাজ নাই। আমি এই মাত্র বলিতে পারি, তোমার বিষয়-ভোগের এখনও শেষ হয় নাই। তোমাকে পুনরায় বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে হইবে।"

উমাশঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বলিলেন,—

"আবার যন্ত্রণা! দয়াময়! ইহাই কি ভগবানের ইচ্ছা! তিনি অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইবে। সে বিষয়ের চিন্তা কেন? তুমি এখন যাও, নীলরতন বাবু, তাঁহার স্ত্রী ও ভগ্নী তোমাদের জন্য বড়ই চিন্তাকুল আছেন। তুমি অবিলম্বে মা অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের নিকট যাও।"

উমাশঙ্কর পুনরায় সন্ন্যাসীর চরণে মস্তকস্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বৎস! তোমার দৃষ্টান্তে জগৎ ধন্য হউক্।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পতি-পত্নী।

আজি সন্ধ্যার পর ঘনানন্দ স্বামীর সেই ভবনে বড় সমারোহ। ভবন আজি আলোকমালায় সজ্জিত, বিবিধ বর্ণের মনোহর পতাকায় সুশোভিত এবং পত্র ও পুষ্পদামে পরিবৃত। ভবনদ্বারে কাশীর সুবিখ্যাত রোসনচৌকী বাজিতেছে এবং অনেক সুরঞ্জিত পরিচ্ছদধারী সশস্ত্র রক্ষী ফিরিতেছে। আজি চন্দ্রমালার মহারাণী করুণাময়ী দেবী ঘনানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। তাঁহার বাসনায় এই সকল আয়োজন হইয়াছে।

কক্ষ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আসনে ঘনানন্দ অত্যুচ্চ বেদীর উপর মৃগচর্ম্মে আসীন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে আমাদের সুপরিচিত অনেক নরনারী। তাঁহার একদিকে মহারাণীর দেওয়ান জীবন বাবু, রায় হরকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, রাজা উমাশঙ্কর, নবীনকৃষ্ণ, শ্যামলাল, রামহরি, নীলরতন বাবু, চণ্ডীচরণ, জরিফ এবং স্বামীর শিষ্যদ্বয়। অপর দিকে রাণী অন্নপূর্ণা, সুহাসিনী, নীলরতন বাবুর পত্নী ও ভগ্নী, ভুব, দাসী প্রভৃতি নারীগণ। সকলেই

সেই মহিমাময়ী মহারাণীকে দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত।

দুই একটী প্রসঙ্গের আলোচনার পর রায় বাহাদুর বলিলেন,—"শ্যামলাল বাবু সম্প্রতি যে মানসিক কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা প্রভুর অবিদিত নাই। এই ঘটনার পর তাঁহার আকার প্রকারের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তিনি চিন্তাকুল হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শ্যামলাল বাবুর অনিষ্ট কিছুই হয় নাই। ইচ্ছাময়ের রাজ্যে যাহা ঘটে, তাহাতেই শুভ ফল হয়। শ্যামলাল বাবুর এই ক্লেশ তাঁহার চিত্তশুদ্ধির সহায় হইবে, শোকে তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইবে এবং সংসারের অনিত্যতা বোধ তাহাকে জ্ঞানের পথে লইয়া যাইবে। শ্যামলাল, তুমি সুপথে বিচরণ করিতে শিখিয়াছ। রাজা উমাশঙ্কর তোমার গুরু। তিনি সতত বিহিত পথ দেখাইয়া দিয়া তোমার কল্যাণ সাধন করিবেন। তুমি কদাচ তাঁহার উপদেশ অবহেলা করিও না।

গম্ভীর শ্যামলাল ভূলুণ্ঠিত হইয়া ঘনানন্দ, উমাশঙ্কর ও উপস্থিত তাবৎ নরনারীকে প্রণাম করিলেন।

হরকুমার বলিলেন,—"শ্যামলাল আমি তোমার অতীত জীবনের সহিত সংস্পৃষ্ট কোন কোন ব্যক্তির বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি। সারদা দাসী এই নীলরতন বাবুর

নিকট হইতে প্রবঞ্চনা করিয়া কিছু টাকা লইয়া পলায়ন করে। সেই টাকাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। দেশে কোন লোক তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আর হরিচরণ আমাকে প্রহার করা এবং বিধুমুখীকে হরণ করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহার দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইয়াছে।”

শ্যামলাল বলিলেন,—“আমি তাহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আর কাহারও কোন কথা শুনিতে বাসনা নাই।”

হরকুমার বলিলেন,—“প্রভুর অবিদিত নাই বোধ হয়, আমাদের সমস্ত সম্পত্তি এমন কি অলঙ্কারাদিও চন্দ্রমালার মহারাণীর পক্ষ হইতে এই জীবনবাবু ক্রয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদের সহিত আশাতীত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং শেষে রাজা ও রাণীর সাংসারিক কার্য্যে এবং অন্যান্য নানাবিধ পারিবারিক ব্যাপারে ইনি আমাদের সহিত অশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা চন্দ্রমালার মহারাণীকে কখন দেখি নাই। আজি সেই পুণ্যময়ীকে দেখিয়া চরিতার্থ হইব। দেওয়ানজী তিনি কত রাত্রিতে আসিবেন কথা আছে?”

জীবনবাবু বলিলেন,—“তাঁহার আসিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।”

তখনই প্রবেশদ্বারে দামামা বাদিত হইল। ঘনানন্দ বলিলেন,—"বোধ হয় মহারাণী আসিতেছেন।"

উজ্জ্বল আলোকমালায় আলোকিত কক্ষ আরও আলোকিত হইল। অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে কক্ষ পুরিয়া গেল। দূর হইতে বিমানচারী বিহঙ্গমগীতির ন্যায় সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল। মহারাণী করুণাময়ী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হীরক-খচিত মহামূল্য অলঙ্কার রাশি সমাচ্ছন্ন। তাঁহার মস্তকে মাণিক্য পরিবৃত মুকুট জ্বলিতেছে। স্বর্ণসূত্র নির্ম্মিত হীরকমালা গ্রথিত অপূর্ব্ব বস্ত্রে তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত। সেই বর্ষীয়সী নবীনা যুবতীর ন্যায় লাবণ্যোজ্জ্বলকায়া এবং তাঁহার গতি ও ভঙ্গী যৌবনের মাধুরিমাময়। করুণাময়ী কক্ষাগত হইলেন ; কক্ষ শোভায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুন্দরী ভূতলে মস্তক স্থাপন করিলেন, এবং তাহার পর তত্রত্য কিঞ্চিৎ ধূলি গ্রহণ করিয়া মস্তকে, রসনায় ও হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। সেই চর্ম্মাসীন সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তিনি ধীর ও মন্থর পাদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যুগকরা, প্রেমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন আর্দ্র। সন্ন্যাসীর আসনের অনেক নিকটে আসিয়া তিনি আবার একবার পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহার পর অঞ্চলাগ্র গলদেশে স্থাপন করিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন

"দেবরাজ! দেবরাজ, আজি এই আসন্ন মৃত্যুকালে এ নশ্বর জীবনের এই শেষ সময়েও কি তুমি আমাকে চিনিবে না? আমাকে চরণ প্রান্তে স্থান দিবে না?"

মহারাণীর নয়ন নিঃসৃত অশ্রুধারায় তাঁহার কুসুম সুকুমার গণ্ডস্থল ভাসিতে লাগিল। ঘনানন্দ বলিলেন,—করুণা, তুমি রাজনন্দিনী হইয়াও কেন এ সন্ন্যাসীর নিমিত্ত সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া জীবন কাটাইলে?

করুণাময়ী বলিলেন,—"দেবরাজ, দেবরাজ, কেন তুমি স্বর্গের দেবতা হইয়াও ভাগ্যবতীকে চরণপঙ্কজে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইলে? তুমি যাহাই কর, তুমি জীবনে মরণে আমার স্বামী। যে দিন তোমাকে পিতা জামাতৃ-পদে বরণ করিবার নিমিত্ত গৃহে আনিয়াছেন। সেই দিন তুমি আমার স্বামী হইয়াছ; যে দিন অন্তরালে থাকিয়া দূর হইতে তোমাকে দেখিয়া স্বামীজ্ঞানে প্রণাম করিয়াছি, সেই দিন তুমি আমার স্বামী হইয়াছ। নিষ্ঠুর, চিরদিনই তুমি চরণাশ্রিত ভক্তের প্রতি এইরূপ বাম। নির্দ্দয়, চিরকালই তুমি এইরূপে ভক্তের নিকট ধরা দিতে দিতে পলাইয়া যাও। যে তোমাকে কিছুতেই ছাড়ে না, যে তোমার জন্য জলে বা অগ্নিতে, গহন বনে বা দুর্গম গিরিশৃঙ্গে গমন করিতে ভয় পায় না, সেই তোমাকে ধরিতে পারে। পালাও নিষ্ঠুর দেবতা—নির্দ্দয় মহা-পুরুষ পালাও। আর কোথায় পলাইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যোগেশ্বরী! আমি জানি তুমি বিষয়াবর্ত্তে পড়িয়াও সিদ্ধির পথে আমার অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছ। ধন্য তুমি! যাহারা তোমাকে দেখিতে পায় তাহারাও ধন্য! তোমাকে ফাঁকি দিতে কে পারে? স্বয়ং পরম পুরুষও তোমার প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ, প্রার্থনা করি তোমার কৃপায় যেন বঞ্চিত না হই!"

যোগশ্বরী বলিলেন,—"দয়াময়! গুণময়, এত দয়ার কথা বলিও না, এত প্রেমের কথা শুনাইও না। তোমার জয় হউক। তুমি সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ, তোমাকে যদি প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া থাকি তাহা হইলে বাস্তবিকই আমি ধন্য হইয়াছি। সত্য কথা যদি বলিয়া থাক, যদি চিরাভ্যস্ত বঞ্চনা-স্বভাব ত্যাগ করিয়া থাক তাহা হইলে দয়াময় হরি, আমাকে আমার কর্ত্তব্য পালনে অধিকার দেও। জীবনের মধ্যে একবার—একবার মাত্র আমাকে চরণ সেবা করিতে দাও।"

সন্ন্যাসীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মহারাণী করুণাময়ী সেই আস্তীর্ণ মৃগচর্ম্মের উপর ঘনানন্দের বামদেশে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহা আপন অঙ্কে উঠাইয়া লইলেন। শোভার আর সীমা থাকিল না। সেই চর্ম্মাসীন বিভুতি-বিলেপিত-কলেবর সন্ন্যাসীর, বামে সেই সর্ব্বালঙ্কারাচ্ছন্নকায়া সুন্দরী। দর্শকেরা প্রত্যক্ষ

হরগৌরী দর্শন করিতেছেন মনে করিয়া পুলকিত কলেবর হইলেন। নারীগণ হুলুধ্বনি দিলেন। বাহিরে দামামা রোসনচৌকী বাজিয়া উঠিল। আনন্দে বসুন্ধরাপূর্ণ হইল।

ঘনানন্দ বলিলেন,"—ভগবতি, তোমার এই নিষ্কাম প্রেম জগতে সুপবিত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। তোমার এই লালসাশূন্য প্রণয়, এই আকাঙ্ক্ষাবিহীন একপ্রাণতা, এই দূর হইতে সম্মিলন, প্রেমের এই ভোগবিহীন উপাদেয়তা, হৃদয়ের এই অসাধারণ একাগ্রতা, মনের এই প্রবল তেজস্বিতা এ সকলই অলৌকিক! সত্যই আমি ধন্য হইলাম। যাঁহারা তোমার এই প্রেমলীলা দর্শন করিলেন, তাঁহারাও ধন্য হইলেন।"

ধীরে ধীরে উমাশঙ্কর সম্মুখে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিলেন এবং অধোবদনে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"দেখ দেবি তোমার পুত্র তোমাকে প্রণাম করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"বুঝিয়াছি মা, যিনি মা করুণাময়ী তিনিই মা যোগেশ্বরী। এই করুণাসিন্ধু আমার উদ্ভব স্থান, এই দেবদেবী আমার জনকজননী। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া এমন সৌভাগ্যোদয় কাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"বৎস, তুমি দরিদ্র হইয়া গিয়াছ। আমি তোমার সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়াছি। আমার কি অবিবেচনা ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কেন মা, এমন নিষ্করুণ কথা বলিতেছ ? তুমি যোগেশ্বরী রূপে আমাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ, করুণাময়ীরূপে আমার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছ। আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। সম্পত্তির আরর্জ্জনায় আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সে দায় হইতে তোমার করুণায় আমি উদ্ধার পাইয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"উদ্ধার পাইবে কিরূপে ? তুমি শুন নাই কি বাবা, ঠাকুর দেহত্যাগ করিতেছেন ?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"সে কঠোর সংবাদ আমি শ্রবণ করিয়াছি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তাহা হইলে আর তোমার উদ্ধার কোথায় ? তোমার বিষয় ভোগ এখনও অসম্পূর্ণ আছে। তোমাকে পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কেন মা, এরূপ নিষ্করুণ আদেশ করিতেছেন ?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, লোকে তাহার উপর অনেক কর্ত্তব্যের ভার প্রদান করে। তুমি সংসারের কঠোর পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ

হইয়াছ। প্রভূত ধন তোমার চরণ তলে ছিল, কিন্তু তুমি তাহা অনর্থক ভোগে ব্যয় কর নাই। স্বার্থ চিন্তা বিস্মৃত হইয়া তুমি বিষয় ব্যাপার পরিচালন করিয়াছ; ধর্ম্ম সাধনার্থ তুমি ধন ব্যয় করিয়াছ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করিয়া তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ; ধনমদ তোমাকে নিদ্রাকালেও অভিভূত করিতে পারে নাই; বিষয় ব্যাপারে মত্ত হইয়া তুমি কদাপি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হও নাই; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া পরম শত্রুকেও তুমি দুর্ব্বাক্য দ্বারা মর্ম্মপীড়া দেও নাই; কাহারও কপর্দ্দকমাত্র অকারণ গ্রহণ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই; নিতান্ত দুরবস্থাতেও তুমি একটু মাত্র চলচিত্ত হও নাই; স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তুমি অতি দীনভাবে জীবন পাত করিতে কাতর হও নাই; কোন কঠোর বিপদেও তোমাকে একতিলও ব্যথিত করিতে পারে নাই; নিতান্ত দুরবস্থাতেও তুমি পরোপকার সাধনে ক্ষান্ত হও নাই; নিতান্ত দরিদ্র দশায় পরমা সুন্দরী কামিনী রূপযৌবন ও ধনসম্পত্তি লইয়া তোমার চরণতলে লুণ্ঠিতা হইয়াছে; তুমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহ নাই; এবং সম্পদে ও বিপদে কখনই তুমি কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা কর নাই। এ সকলই তোমার অতুল প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। তুমি যেরূপ মহাপুরুষের পুত্র, তাহার অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে তোমার পিতা গৌরবান্বিত হইবেন। বৎস!

আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও—সর্ব্ব সুখের অধিকারী হও—সর্ব্বথা পিতার যোগ্য পুত্র হও।”

উমাশঙ্কর সাশ্রু নয়নে বলিতেন,—“মাতার এই আশীর্ব্বাদে ধন্য হইলাম। আমি কখনই জানিতাম না যে, আমি আপনাদের সন্তোষজনক কোন কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হইয়াছি।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“তোমার সহিত আমি আর কথা কহিতে পারি না। ঠাকুর তোমার চরণ ক্ষণেক ছাড়িয়া যাই। রাগ করিও না। আমার পুত্রবধুকে তোমার নিকট লইয়া আসি। মাকে তুমি এতক্ষণ ডাক নাই, তোমার কি অন্যায়!”

তাহার পর সেই লোকাতীত মহিমাময়ী নারী হাসিতে হাসিতে মহিলা মণ্ডলীর মধ্যগত হইয়া অন্নপূর্ণা ও সুহাসিনীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং সন্ন্যাসীর সমক্ষে তাঁহাদের আনিয়া বলিলেন,—“মা অন্নপূর্ণা, মা সুহাসিনী, ঠাকুরকে প্রণাম কর।”

তাঁহারা গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিলেন। যোগেশ্বরী বলিলেন,—“মা অন্নপূর্ণা, তুমি ভিখারিণী হইয়াছ। বড় গৌরবের পরিচয় দিয়া আসিয়াছ, তোমার ন্যায় সঙ্গিনী না পাইলে উমাশঙ্কর কঠোর সংসার ব্যাপারে এত অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। তুমি বড়ই লক্ষ্মী মেয়ে মা, আর মা সুহাস, তোমার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র, পরম শত্রুও

তোমার নিন্দা করিতে জানে না। তুমি পরম সুখের অধিকারিণী হইবে মা।”

এই সময় শ্যামলাল একটু অগ্রসর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—“মা সুহাসিনী, আমি অধম বেশ্যাপুত্র শ্যামলাল, ধনমদে মত্ত হইয়া আপনার চরণে অশেষ অপরাধ করিয়াছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমার অতীত। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতে সাহস করি না, আপনার নিকটে গিয়া চরণ ধূলা গ্রহণ করিতেও আমার সাহস নাই, আমি দূর হইতে আপনার চরণে বার বার প্রণাম করিতেছি।”

কিয়ৎকাল অধোমুখে চিন্তা করিয়া সুহাসিনী বলিলেন,—“আপনার কৃত কোন অপরাধের কথা আমার আর মনে নাই। কেবল এই মনে আছে, আপনার ভয়ে দেশত্যাগী হইয়া আমি বসুন্ধরার গৌরব স্বরূপ এই ভাই পাইয়াছি; আর লক্ষ্মী স্বরূপা এই শোভাময়ী ভাতৃবধূ পাইয়াছি, আপনার কৃপায় আমার মহোপকার হইয়াছে, আপনার যদি কোন দোষ হইয়া থাকে আমি হৃষ্টচিত্তে তাহা ক্ষমা করিতেছি।”

হরকুমার বাহাদুর বলিলেন,—“শ্যামলাল, তোমার হৃদয় বড়ই উন্নত হইয়াছে, দীনতাই হৃদয়োন্নতির পরিচায়ক, এ সম্বন্ধে যদি কিছু বলিতে হয় তুমি নবীন কৃষ্ণকে বল, আমি জানি তাঁহারা উভয়েই তোমার জন্য দুঃখিত, তোমার প্রতি কাহারও বিরাগ নাই।”

যোগেশ্বরী দেবী আদরে অন্নপূর্ণার হস্ত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা এতদিন আনন্দে কাটিয়াছে তো? দুঃখের কোন ছায়াও তো তোমাকে স্পর্শ করে নাই?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—"ভাগ্যবলে যে দেবতার আমি দাসী হইয়াছি, তাহাতে দুঃখ দূরে থাকুক অসীম আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু মা, এই অনন্ত সুখের মধ্যে একই ঘটনা হৃদয়ে বড় দাগ দিয়া গিয়াছে।"

অন্নপূর্ণা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অধোমুখ হইলেন, বাস্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে সুহাসিনী বলিলেন,—"মা দাদার এক সোণার পুতুল ছেলে হইয়াছিল, সে আর নাই।"

সুহাসিনী অঞ্চলে নয়নাবৃত করিলেন, অন্নপূর্ণা কাঁদিতে লাগিলেন, সকলের নয়নই অল্পাধিক পরিমাণে জলভারাকুল হইল।

ঘনানন্দ বলিলেন,—"সে ভুবনমোহন শিশুকে আমি ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ছেলের এরূপ পরিণাম হইবে, ইহা আমি একবারও মনে করি নাই।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"নাতি কোলে লইবার লোভ সংবরণ করিতে পার নাই, যোগাশন ত্যাগ করিয়া এ জন্য বঙ্গদেশে ছুটিয়াছিলে, আমাকে তাহার ভাগ দিতে পার নাই নিষ্ঠুর, তুমি যে শিশুকে কোলে লইয়াছ, তাহার এ দুর্দ্দৈব ঘটে কেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কাহাকে ফাঁকি দিতে চাও?

ঘটে কেন, তাহা আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর, তুমি ঘটাইলে কে তাহার অন্যথা করিতে পারে?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দাঁড়াও তোমরা, আমি এই বুড়া দুষ্টকে জব্দ করিতেছি, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব, তোমরা একটু অপেক্ষা কর।"

যোগেশ্বরী দেবী প্রস্থান করিলেন এবং পার্শ্বস্থ এক রুদ্ধ দ্বার প্রকোষ্ঠদ্বারে করাঘাত করিলেন, দ্বার খুলিয়া তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিবিধ অলঙ্কারাদি শোভিত এক সুকুমার শিশু ক্রোড়ে লইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, সকলেই অবাক্, শিশু নিকটস্থ হইয়া "পিটি পিটি" "মা মা" "বাবা বাবা" শব্দ করিয়া হাত দুলাইতে দুলাইতে চীৎকার করিতে লাগিল, তখনই অন্নপূর্ণা "আমার সেই খোকা" বলিয়া চীৎকার শব্দে যোগেশ্বরীর চরণতলে আছড়াইয়া পড়িলেন। সুহাসিনী আনন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে হাত বাড়াইয়া খোকাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

লুপ্তোদ্ধার।

যাহা কেহ স্বপ্নেও মনে ভাবে নাই, তাহা ঘটিল। যে খোকা সর্ব্বসমক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কৃতান্তের কবল গ্রস্ত হইয়াছিল তাহাকে অবার পাওয়া গেল, আনন্দের সীমা থাকিল না। খোকা অনেকক্ষণ অনেকের কোলে কোলে আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইল, আনন্দোচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইলে, যোগেশ্বরী ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন,—"কেমন ঠাকুর, আমাকে ফাঁকি দিয়া নাতি কোলে করিতে ছুটিয়া ছিলে; এবার আমি তোমাকে আর আমার নাতির গায়ে হাত দিতেও দিব না।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তুমি না পার কি? যমালয় গত জীবকে যে ফিরাইয়া আনিতে পারে, তাহার ক্ষমতা অসাধারণ।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"ছিঃ ছিঃ! ও বয়সে আর নিজের প্রশংসা নিজে করিও না। জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানের কাজ করিও না। মরা বাঁচান তোমারই কাজ। নয় কি বিহাই মহাশয়?"

হরকুমার বলিলেন,—“এ দেব-লীলার মধ্যে আমি কি স্বাক্ষ্য দিব? তবে এ কথা আমাকে বলিতেই হইবে যে, আমি মরিয়া গিয়াছিলাম, অস্ত্রাঘাতে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, প্রভুর যত্নে আমি জীবন লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার কমণ্ডলুর জলে আমার ক্ষত সকল সারিয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই তাহা দৈব-শক্তির কার্য্য।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“দেখ ঠাকুর। তোমার এই কার্য্যই যথার্থ অসাধারণ, আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে আশ্চর্য্য কাণ্ড কিছুই নাই। যখন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সকলে অবধারণ করেন, তখন আমার শিষ্য এই জীবনকৃষ্ণ সৎকারার্থ সেই মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান করেন; অদূরে আমার এক ধাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল, সে শিশুকে কোলে লইয়া চলিয়া আইসে, দ্রব্য-গুণ-প্রভাবে শিশুর জীবন রক্ষা হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“তোমার পক্ষে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে ইহার সকলই আশ্চর্য্য। সে যাহা হউক, এরূপ করিয়া শিশু-হরণ করার উদ্দেশ্য কি?”

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—“এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ঠাকুর? তুমি বলিতেছ উমাশঙ্করের সম্পূর্ণ পরীক্ষা হইবে। তোমার প্রিয় পুত্র পুত্রত্ব পদবী লাভ

করিয়া, বালক উমাশঙ্কর কতদূর দৃঢ়তা অভ্যাস করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ ও জগতে তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তোমার অভিপ্রায়। একমাত্র প্রিয় পুত্র নাশ না হইলে, সে দৃষ্টান্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় কই? এ সকলই তুমি জান; তথাপি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহাতে আমার অভিপ্রায় কি?"

ঘনানন্দ একটু হাস্য করিলেন। যোগেশ্বরী বলিলেন,—"কিন্তু তোমার সহিত বাজে কথার আমার সময় নাই। তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই; তুমি যেখানে যাইবে, তোমার দাসী ছায়ার ন্যায় সেখানেই তোমার অনুগামিনী হইবে। কিন্তু যাহাদের সঙ্গ আমাদের আশু ছাড়িতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে কথা শেষ করাই এখন প্রয়োজন।"

উমাশঙ্কর সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি কথা বলিতেছেন মা? আপনি কৃপা করিয়া এ সকল প্রহেলিকা পরিত্যাগ করুন।"

যোগেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন'—"সন্তানের আবদার মা কবে শুনে না বাবা? এ সকল কথা এখন থাকুক। বিহাই মহাশয়, আপনি অগ্রসর হউন। আপনাকে অনেক বিষয় বুঝিয়া লইতে হইবে।"

হরকুমার অগ্রসর হইয়া করজোড়ে বলিলেন,—"বুঝিয়া লইবার দিন আমার ফুরাইয়াছে। এ সময়ে

যদি আপনাদের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব। আমাকে কি বুঝিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দিন ফুরাইয়াছে মনে করিয়া প্রস্তুত হওয়া সকলেরই উচিত। আপনার এখন বুঝাইয়া দিবার দিন নিকট হইয়া আসিতেছে। যে বুঝিয়া লইতে জানে, সেই বুঝাইয়া দিতে জানে। সুতরাং আপনাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। রাজা উমাশঙ্করের যে সকল বিষয় আমি ক্রয় করিয়াছিলাম, তাহার কথা বোধ হয় আপনার মনে আছে?"

"আছে।"

"আমার যে সকল স্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহার সংবাদ আপনি কিছু কিছু জানেন বোধ হয়?"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"জানি।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"আমি এক দানপত্র দ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি রাজা উমাশঙ্করকে দান করিয়াছি। ইহাতে আমার পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত এবং উমাশঙ্করের দরুণ খরিদা স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিরই উল্লেখ আছে। দানপত্র রেজষ্টরী করা হইয়াছে। জীবনকৃষ্ণ, সেই দলিল খানি রায় বাহাদুর মহাশয়ের হস্তে দেও।"

তৎক্ষণাৎ জীবন বাবু পার্শ্বস্থ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ

করিয়া একটা পেট্টিকা আনয়ন করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে একখানি রেজষ্টরী করা দলিল বাহির করিয়া, হরকুমার বাহাদুরের হস্তে প্রদান করিলেন।

রাজা উমাশঙ্কর কাতরভাবে মহারাণীর চরণ সমীপে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"মা তো কখন সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর হয় না। আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিতেছেন কেন? মা, মা, আমি আপনার চরণে ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে পুনরায় বিষয়-কূপে ডুবাইয়া দিবেন না।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"এজন্য ভয়ের কোন কারণ নাই বাবা। বিষয় তোমার অধীনে থাকিবে, তুমি কখনই বিষয়ের অধীন হইবে না। তোমার দ্বারা বিষয়ের যেরূপ সদ্ব্যবহার হইবে, বোধ করি এ জগতে আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি বিষয়-সমুদ্রে না ডুবিয়া, তাহার উপর ভাসিয়া বেড়াইতে পারিবে, ইহা আমরা জানি। তোমার হস্তে বিষয় ন্যস্ত হইলে সংসারের অশেষ ইষ্ট সাধিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিষয়-ব্যবহার বিষয়ে তুমিই যথোপযুক্ত সৎপাত্র। অতএব বৎস, এ গুরুভার তোমাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে, বা আপনার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে আমার

কথনই সাধ্য নাই। কিন্তু দেবি, আপনি ভাবিয়া দেখুন; উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিলে, আমি চরিতার্থ হইব।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“তোমার দ্বারা জগতের মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে। অনেক কার্য্যই সম্পত্তি-সাধ্য। অতএব বিষয়-সম্পত্তি স্বতই তোমাকে আশ্রয় করিবে। কেমন বিহাই মহাশয়, দলিল দেখিয়া লইতেছেন তো? স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি, উভয় স্থানের বাড়ী, গাড়ি, হাতী, ঘোড়া, আসবাব, তৈজস ইত্যাদি সকল পদার্থ ধরা হইয়াছে, কোন ভুল হয় নাই তো?”

হরকুমার বলিলেন,—“দেখিয়া লইবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথা হইতেছে, আমাকে এত করিয়া বুঝিয়া লইতে আজ্ঞা করিতেছেন কেন? আবার কি এই বয়সে আমাকে এই কঠোর কর্ম্মের দায়ে ফেলি-বেন স্থির করিয়াছেন?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“না, আপনাকে নিয়ত এ ভার বহন করিতে হইবে না। তবে একবার মাত্র প্রথমে সঙ্গে গিয়া উভয় স্থানের বিষয়-ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। এবার জীবনকৃষ্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। আমি তাঁহাকে অনেক সম্পত্তি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণে

অসম্মত। রাজা উমাশঙ্করের নিকটে থাকিয়া কাজ করাই তাঁহার অভিপ্রায়।”

হরকুমার বলিলেন,—“অতি উত্তম ব্যবস্থা। জীবন বাবু অতি মহাশয় লোক। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতাও অদ্ভুত। আপনার যিনি শিষ্য, তিনি সর্ব্বগুণে গুণবান্ হইবেন্, তাহার আর সন্দেহ কি? তাহা হইলে রাজা উমাশঙ্করের আয় প্রায় বার্ষিক ষোল লক্ষ টাকায় দাঁড়াইতেছে।”

মহারাণী বলিলেন,—“ঐ রূপই হইবে। আমার এখনও কথার শেষ হয় নাই। মা অন্নপূর্ণা, কর্ত্তব্যানুরোধে, লোক শিক্ষার নিমিত্ত, আমি তোমার সহিত অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি। তন্মধ্যে পুত্র-হরণ প্রধান নিষ্ঠুরতা। দ্বিতীয় নিষ্ঠুরতা তোমার সমস্ত অলঙ্কার গ্রহণ। তোমার সন্তান তোমার ক্রোড়ে শোভা পাইতেছে। এখন তোমার অলঙ্কারগুলি লইয়া আবার অঙ্গে দেও মা।”

অন্নপূর্ণা বলিলেন,—“অলঙ্কারের অভাবে একদিনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি মা, আপনি যদি আমাকে অলঙ্কারে সাজাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, আমি তাহাতে কি বলিব?”

জীবন বাবু তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ রুদ্ধ-দ্বার প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে কয়েকটী সুন্দর বাক্স আনিলেন। রাণীর সেই

বাক্স, তন্মধ্যে রাণীর সেই সকল অলঙ্কার। ভব ও দাসী তাহা সরাইয়া আনিল।

যোগেশ্বরী তাহার পর স্বকীয় দেহ হইতে একে একে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। সমস্ত খোলা হইলে, তিনি বলিলেন,—"জীবনকৃষ্ণ বাক্স আনাও।"

সেই রুদ্ধ দ্বার প্রকোষ্ঠ হইতে জীবনকৃষ্ণ তিনটা উত্তম বাক্স আনিলেন। অলঙ্কার সমস্ত স্বহস্তে তন্মধ্যে স্থাপিত করিয়া, মহারাণী বলিলেন,—"মা সুহাস, আমি তোমাকে আমার এই অলঙ্কারগুলি দান করিতেছি। তুমি আমার কন্যা, সুতরাং আমার দানে ও তোমার গ্রহণে অধিকার আছে, তুমি এ গুলি লও মা!"

সুহাসিনী বলিলেন,—"অলঙ্কারে আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আপনার আজ্ঞা পালন করিতে আমরা বাধ্য। দাদা, মায় এত সকল অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিলে আমার পাপ হইবে না কি?"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"না। বরং মাতার ব্যবহৃত বস্তু অঙ্গে থাকিলে অশেষ কল্যাণ হইবে। তবে সকল ভূষণই অগ্রে মস্তকে ধারণ করিয়া পরে যথাস্থানে ধারণ করিও।"

তাহার পর যোগেশ্বরী দেবী বলিলেন,—"এক্ষণে জীবনকৃষ্ণ, টাকা লইয়া আইস।"

সেই রুদ্ধ দ্বার প্রকোষ্ঠ হইতে একটী বাকস আনীত হইল। তাহার মধ্যে নোট বোঝাই। যোগেশ্বরী বলিলেন,—"নবীনকৃষ্ণ, তুমি আমার জামাতা। তোমাকে সম্পত্তি-দানে আমার অধিকার আছে। আমি তোমাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিতেছি, তুমি ইহার দ্বারা সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভোগ করিবে, ইহাই আমার অনুরোধ।"

তৎক্ষণাৎ একশত খণ্ড হাজার টাকার নোট প্রদত্ত হইল। নবীনকৃষ্ণ বলিলেন,—"মা আমি যাজক ব্রাহ্মণ; আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী সম্পত্তি আছে। আর রাজ-সংসার হইতেও আমি যথেষ্ট সাহায্য পাই। এত ধনে আমার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তবে আপনি স্বেচ্ছায় দিতেছেন, কাজেই আমাকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"ভবসুন্দরীকে পাঁচ হাজার টাকা দেও। ভব, তুমি নানা প্রকারে আমাদের হিত করিয়াছ। এরূপ উপকারী লোক বড়ই দুর্লভ।"

ভব গলায় কাপড় দিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিয়া টাকা উঠাইয়া লইল।

তাহার পর দেবী বলিলেন,—"রামহরিকে দশ হাজার টাকা দেও।"

রামহরি অগ্রসর হইয়া বড়ই চীৎকার করিয়া বলিল,—"না মা, আমাকে টাকা দিও না। আমাকে

এখনই লোকে বড় মানুষ বলে; আমার কুড়ি গোলা ধান, এবার আবার পাঁচ গোলা বাড়িবে। আমি টাকা লইয়া কি করিব? তোমার টাকা তুলিয়া রাখ।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“তা হউক, তুমি এই টাকা দিয়া দাসীর অলঙ্কার গড়াইয়া দিও।”

রামহরি বলিল,—“সেকি! মাগী এত অলঙ্কার পরিবে কখন? উঠান ঝাঁইট দিবে, গোবর চটকাইবে, ধান সিদ্ধ করিবে, ঢেঁকি পাড়িবে, তবে গহনা পরিবে কখন? না না, ওসব হবে না।”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“তুমি টাকা রাখিয়া দেও, যদি কখন আবশ্যক হয়, তখন ব্যবহার করিও।”

রামহরি বলিল,—“কি জ্বালা গা! টাকা লইয়া কি শেষে বিপদে পড়িব। যদি নেহাৎ না ছাড় তবে ঐ বাবা-ঠাকুরের কাছে টাকা জমা করিয়া দেও।”

রামহরি হাত দিয়া রায় বাহাদুরকে দেখাইয়া দিল। অগত্যা হরকুমার টাকা তুলিয়া লইলেন।

তাহার পর যোগেশ্বরী বলিলেন,—“জরিফ, তুমি বড় বিশ্বস্ত ও অনুগত লোক, তোমার মত উপকারী বন্ধু বড় কম পাওয়া যায়। আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।”

জরিফ বলিল,—“আমি মুসলমান, ঠাকুর দেবতা মানিতাম না। কিছু দিন হইতে আমার বিশ্বাস

হইয়াছে, হিঁদুর ঠাকুর দেবতা সত্য, আর মানুষও সত্য। রাজাকে আর দেওয়ান জি সাহেবকে দেখিয়া অনেক সময় মনে ভাবিয়াছি, মানুষও হয় তো, দেবতা হয়। এখন আপনাদের দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছি মা, মানুষের মধ্যেই দেবতা আছে। মা, আমার স্ত্রী পুত্র নাই। রাজা আমার ছেলে, রাজা আমার মুনিব। টাকায় আমার কোন দরকার নাই। তবে আপনি বলিতেছেন, কথা না শুনিলে পাপ হইবে। আমাকে একশত টাকা দেন, আমি কাশীতে খয়রাৎ করব।"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"তুমি এই পাঁচ হাজার টাকাই ইচ্ছা করিলে খয়রাৎ করিতে পার।"

জরিফ আর কথা কহিল না, টাকা তুলিয়া লইল। যোগেশ্বরী বলিলেন,—"এক্ষণে রাজার চণ্ডী খুড়া, আপনি আমাদের বিহাই ; বলুন আপনি কি চাহেন ?"

চণ্ডী কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া যুগ্ম করে বলিলেন—"ঠাকুরাণি, আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমার সকল খেদ দূর হইয়াছে। রাজা নাতিকে যমে লইয়াছিল, সেদিনকার কথা মনে হইলে এখনও বুক্ ফাটিয়া যায়। আমার সে দুঃখ আজি দূর হইয়াছে। যে দিন আমার দয়াল রাজা গরিব হইয়া বাড়ী হইতে প্রস্থান করেন, সে দিনকার কথা মনে হইলে পাষাণও ফাটিয়া যায় ; আজি আমার সেই রাজা ভাইপো রাজরাজেশ্বর। আপনার

দয়ায়, আমার সকল জ্বালা ঘুচিয়াছে। তবে আমি আর চাহিব কি? এখন চাহি, যেন কখন আমাকে হরকুমার দাদার কাছ ছাড়া হইতে না হয়। আমি আর গুলি খাই না; আফিং খাইতাম, দাদা যে দিন মরিয়াছিলেন, সেই দিন খাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; তাহার পর হইতে আর খাই না। আমি চুরি করিতাম, অনেক দিন আর করি নাই। রাজা বাবাজি, আমাকে দয়া করেন; দাদাও আমাকে ভাল বাসেন। আমি আর এখন বড় মন্দ লোক নহি। আপনারা এইটি করুন, যেন দাদা আমাকে তাড়াইয়া না দেন।"

হরকুমার বলিলেন,—"কেন ভায়া তুমি এ আশঙ্কা করিতেছ? আমি এ জীবনে কখনই তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

চণ্ডীচরণ উভয় হস্ত তুলিয়া বলিল,—"দাদা, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি সুখে থাক।"

মহারাণী বলিলেন,—"আপনি কিঞ্চিৎ অর্থগ্রহণ করুন।"

চণ্ডীচরণ ব্যস্ততা সহ বলিলেন,—"না না—খাজাঞ্চিখানায় আমার আড়াই শত টাকা আছে। তাহারই কি করিব, তাহাই ভাবিয়া পাই না। আর টাকার কাজ নাই।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"আপনার ভাইপো-ভাইঝি আছে। তাহাদের জন্য টাকার প্রয়োজন হইবে।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"তা হইতে পারে; কিন্তু দাদার ব্যবহার স্মরণ করিলে, আর তাহাদের নাম করিতে ইচ্ছা করে না। তা দাদা, আপনি কি বলেন?"

হরকুমার বলিলেন,—"তোমার দাদা যেমনই কেন হউন না, তোমার ভাইপো-ভাইঝি কি দোষ করিয়াছে? তাহাদের জন্য তুমি অর্থ লইতে পার।"

চণ্ডী বলিল,—"তবে আর কি বলিব? দাদার যখন মত, তখন টাকা লই।"

তাহার পর মহারাণী বলিলেন,—"জীবনকৃষ্ণ! তোমার তহবিলে আর কত টাকা আছে?"

"পঁচিশ হাজার।"

করুণাময়ী বলিলেন,—"বিহাই মহাশয়, আপনার কোন উপকার করিতে বোধ হয় আমার ক্ষমতা নাই। কিন্তু আপনার নিকট একটী উপকার প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা আছে। যে দিন ঠাকুর দেহ রক্ষা করিবেন, আপনি সেই দিন এই পঁচিশ হাজার টাকা দান উৎসবাদি ব্যাপারে ব্যয় করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

রায় বাহাদুর বলিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

মহারাণী বলিলেন,—"আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার সকল বিষয়-সম্পত্তি বোধ হয় নিঃশেষ হইয়াছে। এক্ষণে ভিখারিণীর সাজ ধারণ করিব।"

করুণাময়ী প্রস্থান করিয়া সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ

করিলেন। তাহার পর এক স্থূল গেরুয়াশাটী পরিধান করিয়া, হস্তে শাঁখা পরিয়া, সীমন্তে মোটা সিন্দুর রেখা বিন্যাস করিয়া, তিনি বাহিরে আসিলেন। সে অবস্থায় তাঁহার কি অপূর্ব্ব শোভা হইল! যে মহার্হ বস্ত্র তাঁহার অঙ্গে ছিল, তাহা তিনি অন্নপূর্ণাকে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, —"এ জগতে আমার কার্য্যের শেষ হইয়াছে। আর আমার কাহাকেও কোন কথা বলিবার নাই। আমি এক্ষণে কায়মনোবাক্যে স্বামীসেবা করিব। তোমরা সকলে অদ্য স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। যাঁহার ইচ্ছা হইবে, কল্য আসিয়া আবার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

সকলে প্রণাম করিলেন। বিদায়কালে ঘনানন্দ বলিলেন,—"উমাশঙ্কর, তোমার সহিত আমার অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে; এখন থাকুক। নীলরতন বাবু, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,সকলই সুমঙ্গলে পরিণত হইবে। আপনার চিন্তাকুল পত্নী ও ভগ্নী বোধ হয় এখন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। শ্যামলাল, তুমি অর্থের প্রয়াসী নহ। আমাদিগের দ্বারা তোমার কি উপকার হইতে পারে?

শ্যামলাল বলিলেন,—"এক অর্থের আমি প্রয়াসী। আপনারা যুগল মূর্ত্তিতে আসন গ্রহণ করুন। আমি সেই অবস্থা দেখিয়া আপনাদের চরণ রজঃ মস্তকে ধারণ করি।"

তাহাই হইল। ঘনানন্দ ও যোগেশ্বরী দেহে দেহ মিশাইয়া উপবেশন করিলেন। সকলে, "জয় সচ্চিদানন্দ" রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্যামলালকে সকলে ধন্যবাদ দিলেন। সেই অবস্থায় প্রণাম করিয়া সকলে বিদায় হইলেন।

বাহিরে বাদ্য বাজিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেব-যুগল।

ঘনানন্দ স্বামীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিয়াছে। চিকিৎসকেরা সাবধানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র নির্দ্দোষ হইয়াছে, এবং শরীরে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চয় হইয়াছে, গাত্রদাহ দূর হইয়াছে। তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এ অবস্থায় মহাপুরুষের তিরোধান ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঘনানন্দ স্বামী স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আগামী বৈশাখী পুর্ণিমার দিন, বেলা আড়াই প্রহরের সময় তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। এ বাক্যের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি নাই; সুতরাং দর্শনার্থী নর-নারীর সংখ্যা কমিল না, বরং ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বিদেশ হইতে রেল যোগেও লোক আসিতে লাগিল।

প্রচার হইয়া গেল, যে চন্দ্রমালার প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী মহারাণী করুণাময়ী দেবী মহাত্মা ঘনানন্দের সহধর্ম্মিণী। তাঁহাদেব জীবনকাল কিরূপভাবে কাটিয়াছে এবং কিরূপ ভাবে তাঁহাদের এই সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাও

লোকের অবিদিত রহিল না। লোকের কৌতূহল বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল এবং এই পুণ্যব্রত মহাপুরুষ ও ধর্ম্মময়ী মহারাণীকে যুগল মূর্ত্তিতে দেখিবার নিমিত্ত লোকে আরও আগ্রহান্বিত হইল।

যোগেশ্বরী নিরন্তর কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করিতেছেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঔদাস্ত নাই; সেই মহীয়সী মহিলা, অবিরত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন; যখন যে কার্য্যের প্রয়োজন তাহাই স্বয়ং সম্পাদান করিতেছেন। শিষ্যদ্বয় অদূরে বসিয়া আছে মাত্র। লোকে দূর হইতে এই অলৌকিক যুগলকে দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইতেছে।

গভীর রাত্রিতে ভবন জনশূন্য হইলে, রাজা উমাশঙ্কর, রায় হরকুমার বাহাদুর ও জীবনকৃষ্ণ বাবু, ঘনানন্দ স্বামী এবং যোগেশ্বরী দেবীর সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দূর হইতে প্রণাম করিলে, ঘনানন্দ তাঁহাদিগকে নিকটে আসিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা নিকটস্থ হইলে, ঘনানন্দ বলিলেন,—"তোমরা তিন জনে আসিয়া ভালই করিয়াছ। তোমাদিগকে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

সকলেই সন্ন্যাসীর বাক্য শ্রবণার্থ অধোমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন,—"কেন আমি এ দেহ ত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছি, তাহা

কাহাকেও ভাল করিয়া বলা হয় নাই। অন্য লোক হয় তো সকল কথা বুঝিতে পারিবে না। আমার এই দেহ অভীষ্ট কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিলে এই দেহ আরও অনেক দিন রাখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহাতে কোনই ইষ্ট নাই; কেননা যে কার্য্য করিতে আমি বাধ্য, এ দেহ দ্বারা তাহার সমাপ্তি হইবে না; কেবল কালক্ষয় ঘটিবে মাত্র।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"তাহার ভুল নাই: কিন্তু আমি নিবেদন করিতেছি, শাস্ত্রীয় বিধান ক্রমে একবার চেষ্টা করিলে হইত না?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"শাস্ত্রীয় প্রণালী ও উপায়-সকলই অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই আমার অন্ত্রের এক সুদূরাংশে ক্লেদ জমিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা দূর করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন এবং সে জন্য চেষ্টা করিবার সময় ক্রিয়ামার্গ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ক্রিয়া ত্যাগ করা এ অবস্থায় অসম্ভব। আহারাদি ত্যাগ করিয়া দেখিয়াছি; ঔষধির রস সেবন করিয়াছি। ফল পাই নাই। দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যাপন করার অপেক্ষা, দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করাই সৎপরামর্শ বলিয়া বুঝিয়াছি।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি যাহা জানি তাহাতে বুঝিয়াছি, আর·সামান্য ক্রিয়া মাত্র আপনার আবশ্যক।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"তুমি ঠিক বুঝিয়াছ বটে; কিন্তু সে সামান্য ক্রিয়া সাধনও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। এই ক্লিষ্ট দেহে দীর্ঘকাল প্রাপ্তির আশা নাই; অথচ সুনিয়মে কার্য্য সম্পাদনেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব এ দেহ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ আমার একবার আমূল ধারাবাহিকরূপে ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্যও নবীন দেহ আবশ্যক।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"অতঃপর আমরা কি করিব?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাহা করিতেছ তাহাই করিবে। কদাচ ক্রিয়া ত্যাগী হইও না। পর পর অনেক দূর—সীমা পর্য্যন্ত তোমাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তুমি সেই অভ্যাস সমান রাখিবে। এবং পর সাধনা চালাইতে থাকিবে। কদাচ তাহা হইতে বিচ্যুত বা বিরত হইবে না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আবার মা আমার কাঁধে গুরুতর বিষয়-ভার অর্পণ করিলেন। ইহাতে হয়তো সাধনার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কিছু না। তোমার মা এই বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়াও, চমৎকার সাধনা করিয়াছেন এবং কোন কোন বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উচ্চ স্থানে আরোহণ করিয়াছেন। প্রবল বাসনা থাকিলে কিছুতেই ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে না।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"এক্ষণে কত দিনে কোথায় আবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এখনও স্থির করি নাই। তবে তোমার গৃহে, মা অন্নপূর্ণার গর্ভে আসিবার ইচ্ছা আছে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কল্যই তো বৈশাখী পূর্ণিমা।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"হাঁ, কল্য আড়াই প্রহরের সময়ই শেষ করিয়া দিব। চিকিৎসকেরা এ সম্বন্ধে বড় হাস্যজনক অজ্ঞতা দেখাইতেছেন। সকল বায়ু প্রাণে মিশাইয়া ব্রহ্মনাড়ী পথে প্রেরণ করাই মৃত্যু। যান্ত্রিক গুরুতর বিকার উপস্থিত হইলে তাহা স্বতঃ ঘটে; ইচ্ছাতেও তাহা করা যাইতে পারে। সাধনার দ্বারা পঞ্চ বায়ুর উপর আধিপত্য থাকিলে, যখন ইচ্ছা তখনই তদ্ভাবতের একীকরণ এবং ইচ্ছামত পথে প্রেরণ করা সহজ ও অনায়াস সাধ্য। এ কথা তাঁহারা জানেন না; যান্ত্রিক কোন বিশেষ বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া তাঁহারা আমার এ প্রস্তাব নিতান্ত অসম্মত ও অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেছেন।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"মানব সমাজ প্রচলিত বিজ্ঞান শাস্ত্রে এরূপ প্রাণত্যাগের কোন প্রণালী লিখিত নাই; কাজেই প্রচলিত বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ইহা অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু সে কথা যাউক। তাহার পর এই পবিত্র দেহের কি গতি হইবে?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"যাহা ইচ্ছা করায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি, ইহা আপাততঃ ভূগর্ভে প্রোথিত করাই সৎপরামর্শ। তুমি ইহা পেটিকাবদ্ধ করিবে। যে যে দ্রব্য দেহের সহিত দেওয়া আবশ্যক, তাহা তুমি জান। সুতরাং তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আমার যে যে শিষ্য যে যে দেশে আছে, তাহার কেহই তোমার ন্যায় উন্নত নহে। আবশ্যক হইলে তাহাদের তুমি উপদেশ প্রদান করিবে। আমার এই শিষ্যদ্বয়কে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তুমি ইহাদের ব্যবস্থা করিবে।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"যে আজ্ঞা। মা, একবারও একটীও কথা কহিতেছেন না কেন?"

যোগেশ্বরী বলিলেন,—"দুঃখ করিও না বাবা, ইহ-সংসারে আমার এক কার্য্য ব্যতীত সকল কার্য্যের সমাপ্তি হইয়াছে। যাহার কার্য্য নাই, তাহার কথাও নাই। এখন ব্রহ্ম স্বরূপ এই পতিদেবতার সেবা ভিন্ন আমার আর কার্য্য নাই।"

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমার প্রতি আর কি আজ্ঞা করিবেন?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"আর একটা কথা। কাশীর যে স্থানে আমার আসন রহিয়াছে, সে স্থানটি অতি যত্নে তুমি রক্ষা করিবে। সে স্থানের অনেক তেজ ও শক্তি

জন্মিয়াছে। লোকে যেন আমার আসন অপবিত্র না করে, কোন প্রকারে যেন তাহা কলুষিত না হয়। আর আমার কোন কথা নাই। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সদ্‌গতি হউক। কল্য আড়াই প্রহরের পূর্ব্বে আসিবে। আমি বেলা এক প্রহরের পর বাক্য ত্যাগ করিব। যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে আসিবে।”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“আমরা এ সকল গভীর তত্ত্ব বুঝি না। আমাদের কি গতি হইবে ভগবন্‌?”

ঘনানন্দ হাসিয়া বলিলেন,—“আপনি অগতির গতি। আপনার আবার গতি কি?”

রায়বাহাদুর বলিলেন,—“আমাদের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে। প্রভুর তিরোধান সংবাদে রাজা নির্ব্বিকার। তিনি বলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? তিনি আবার আপনার সহিত সাক্ষাতের ভরসা করেন। কিন্তু আমাদের কোন ভরসাই নাই; আমরা কি করিব?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“আপনি পরম সাধু পুণ্যবান্‌ মহাত্মা। আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া মুক্তির নিমিত্ত, ছুটিতেছি তাহা ছাড়া যে আর পথ নাই, এমন নহে। আপনি সংসারে যে পথে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাও অতি প্রকৃষ্ট মার্গ। স্বার্থ-চিন্তাবিরহিত সৎকার্য্য জ্ঞানলাভের পরম উপায়। আপনি যাবজ্জীবন তাহাই

করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞান আপনা হইতে আসিয়া মহাশয়কে আশ্রয় করিয়াছে। এই জ্ঞানই মুক্তির উপায়। আপনি মুক্তির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। আপনার কোন চিন্তা নাই। তবে বলিতেছেন, দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে। আসিতে পারে; তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জীবনস্রোত সমান চলিতেছে। এই দেহ লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভাব এবং কিছু দিন পরে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এই দেহের জড়তা ও অকর্ম্মণ্যতা রূপ মৃত্যু এ জীবনের সীমা নহে। এরূপ জন্ম আপনার আমার বহুবার হইয়াছে, আবার বহুবার হইতে পারে। সেজন্য কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নাই। দেহের ক্ষয় হয় বলিয়া জীবনেরও যে ক্ষয় হয় এরূপ মীমাংসা করিবার কোন কারণ নাই। দেহ যায়, আত্মা যান না, দেহের ক্ষয় হয়, কিন্তু কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। আপনার কর্ম্মফল আবার আপনার নূতন দেহ ঘটাইয়া, নূতন কার্য্য ক্ষেত্রে আনিয়া নূতন পথ দেখাইয়া নাকে দড়ি দিয়া চালাইতে থাকিবে। জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এ বন্ধনের দায় হইতে অব্যাহতি নাই। অর্জ্জিত জ্ঞান ধ্বংস হয় না; তাহা ভগবানের জমাখরচে ঠিক জমা হইয়া থাকে। জন্মান্তরে সেই জ্ঞান অতি সহজেই আপনাকে আশ্রয় করিবে। সে জন্মের অর্জ্জিত জ্ঞান পূর্ব্ব সঞ্চিত জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপে তাহার

ক্রমোন্নতি, পরিপুষ্টি ও পূর্ণতা ঘটিবে। সুতরাং হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। ফলতঃ কামনা বিহীন কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির উপায় এবং চিত্তশুদ্ধি জ্ঞান লাভের উপায়।”

হরকুমার বলিলেন,—“বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সতত জ্ঞান চর্চ্চা করি নাই। কর্ম্ম করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহা সকাম কি নিষ্কাম তাহা মনে করিয়াও করি নাই। কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাহা সম্পন্ন করিয়াছি; জানি না তাহা কি?”

ঘনানন্দ বলিলেন,—“ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্মের একটা লক্ষণ। কর্ম্ম উপস্থিত হইলেই তাহা সম্পাদন করি, ফলাফল চিন্তা করি না। এই ভাবই প্রশস্ত। আর যে বিষয়কার্য্যের কথা বলিতেছেন, লোকে তাহাকে ধর্ম্ম সাধনার অন্তরায় বলিয়া মনে করে। কিন্তু সকল সময় তাহা ঠিক নহে। যেখানে সাধক সবল হৃদয় ও জ্ঞানমার্গগামী, সেখানে বিষয় সম্পত্তি তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের সহায় হইয়া থাকে। বিষয় সম্পত্তি অনেক দয়া প্রকাশ, লোকাহিতসাধন, সৎবৃত্তির উন্মেষ করিবার অবসর উপস্থিত করে এবং জ্ঞানোন্নাতির বিবিধ অভিনব কার্য্য ক্ষেত্র দেখাইয়া দেয়। কিন্তু দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্পত্তি কেবল অনর্থেরই মূল এবং অধিকতর অধোগতির উপায়। আমার বিশ্বাস

উমাশঙ্কর ধনসম্পত্তির পথদিয়া অতি সত্বর জ্ঞানের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবেন। আর এই যোগেশ্বরী দেবী এই ধনসম্পত্তি পরিবৃত থাকিয়াও জ্ঞানমার্গের অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আপনি মহাশয়পুরুষ, আপনার এই ব্যাকুলতাই আপনাকে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে লইয়া যাইবে।”

হরকুমার বলিলেন,—“জানি না কি হইবে। ভরসা কেবল আপনার চরণ যুগল।”

তিনি ভক্তিভাবে মহাপুরুষকে প্রণাম করিলেন। জীবন বাবু বলিলেন,—“মা যত কথা বলিয়াছেন, যত উপদেশ দিয়াছেন, যত আজ্ঞা করিয়াছেন, সকলই আমি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। আমার প্রতি আর কোন নূতন আদেশ করিবেন কি?”

যোগেশ্বরী বলিলেন,—“না বাবা, সকল কার্য্যের অবসান হইয়াছে। সুতরাং বলিবার কথা আর নাই। কেবল এই মাত্র বলিতেছি, তুমি উমাশঙ্করের সহিত মিলিয়া বিষয় ব্যাপারের সাধনা করিতে করিতে ধর্ম্ম সাধনায় ঔদাস্য করিও না। রাজর্ষি জনক ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন, যে ইচ্ছা থাকিলে বিষয় সম্পত্তি ধর্ম্মচর্চ্চার প্রতিকূলতা করিতে পারে না, বরং তাহার সহায়তা করে। আমি বিশ্বাস করি, তোমাদেরও জীবন সেইরূপ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে।”

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"আমি ইচ্ছা করিতেছি, অতঃপর আর স্থানান্তরে যাইব না। এই স্থানেই আপনাদের পাদপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বসিয়া থাকি, ইহাই আমার বাসনা।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"অনাবশ্যক, এ সব নয়নে দর্শন করিয়া কি হইবে বাবা? তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা দর্শন কর—দর্শনের বিরাম হইবে না, শক্তির অভাব হইবে না, বিচ্ছেদ বা পার্থক্য উপস্থিত হইবে না, কোন ব্যবধান থাকিবে না। তোমরা সকলেই এক্ষণে প্রস্থান কর; কল্য যথাসময়ে উপস্থিত হইও।"

তখন রাজা, রায় বাহাদুর, জীবন বাবু ও শিষ্যদ্বয় ভক্তি সহকারে সেই দেবদম্পতীকে প্রণাম করিলেন এবং নীরবে সেই পবিত্র স্থান ইহাতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তিরোধান।

পরদিন প্রত্যুষে ঘনানন্দ স্বামী ও যোগেশ্বরী দেবী তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগণ্য নরনারী হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাদের অনুগমন করিল। তাঁহাদের সম্মুখে, বহুদূরে থাকিয়া, রাজা উমাশঙ্কর স্বকীয় উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা গন্তব্য পথ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় উভয় পার্শ্ব হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং রায় হরকুমার বাহাদুর ও জীবনকৃষ্ণ সুদূরে অগ্রে অগ্রে স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা খই ও কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। ঘনানন্দ প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে এবং প্রণত নরনারীকে বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ লাবণ্যময়, বলশালী, এবং যুবাপুরুষের ন্যায় ক্ষিপ্রকারী। কিন্তু যোগেশ্বরী দেবী যেন পাষাণগঠিত মূর্ত্তি। তাঁহার চরণদ্বয় যেন তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে; তিনি যেন নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়। তাঁহার

মুখে বাক্য নাই, অধরে হাস্য নাই, নয়নে দৃষ্টি নাই এবং তাঁহার দেহে যেন জীবন নাই। তাঁহাদের পশ্চাতে কিঞ্চিদ্দূরে শ্যামলাল, নীলরতন বাবু, জরিফ, রামহরি ও চণ্ডীচরণ চলিতে লাগিলেন। পশ্চাতের লোকেরা গোল করিয়া ও আগ্রহযুক্ত হইয়া একেবারে দেবদম্পতীর গায়ের উপর গিয়া না পড়ে, এই সাবধানতার অনুরোধে তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলে দশাশ্বমেধে উপনীত হইলেন।

কাশীতে সে দিন যেন একটা যুগপ্রলয় উপস্থিত। লোকে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়াছে, আহারের ব্যবস্থা করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, কর্ত্তব্যপালনে বিস্মৃত হইয়াছে, সামাজিক শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়াছে। যেন কোন অনৈসর্গিক কারণে সকলেই ব্যাকুল। সকল দিক হইতে দশাশ্বমেধের অভিমুখে লোক ধাবিত হইতেছে। বেলা এক প্রহরের মধ্যেই সকল পথ, সকল মুক্ত স্থান, সকল ভবনের ছাত, সকল বৃক্ষ জনপূর্ণ হইয়া গেল। সম্মুখস্থ ভাগীরথী বক্ষ নৌকায় আচ্ছন্ন। প্রত্যেক নৌকা মনুষ্য পরিপূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টীপাত করা যায়, সেই দিকেই অগণ্য নৃমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টীগোচর হয় না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কয়েকজন পদস্থ ইংরাজও সে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন।

এক নির্দ্দিষ্ট বেদীর উপর ঘনানন্দ আসীন। তাঁহার

বামপার্শ্বে শোভাময়ী যোগেশ্বরী আসীনা। উভয়ের দেহে দেহ সংলগ্ন এবং একের বাহু অপরের কণ্ঠে বেষ্টিত। বড়ই অপূর্ব্ব দৃশ্য! সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ও নারী যেন বিশ্বের সকল শোভা আহরণ করিয়া সেই মঞ্চপৃষ্ঠে সমাসীন। উভয় পার্শ্বে শিষ্যদ্বয় করজোড়ে দণ্ডায়মান। সম্মুখে গললগ্নী কৃতবাস রাজা উমাশঙ্কর যুগ্মকরে দণ্ডায়মান। সমাগত লোকেরা যাহাতে অতি নিকটে আসিতে না পায়, পুলিস প্রহরীরা তাহার ব্যবস্থায় নিযুক্ত। প্রচণ্ড তপনদেব যেন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রবিকরে যেন চারিদিক ঝলসিতে লাগিল। একজন রাজা, সন্ন্যাসী দম্পতীর দেহে সৌরকরপাত নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে মকমলের এক প্রকাণ্ড ছাতা আনিলেন। রাজা উমাশঙ্কর বলিলেন,—"রৌদ্র নিবারণে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহা নিবারণ করিবার কোন প্রয়োজনও নাই।" ছাতাধরা হইল না।

রাজা উমাশঙ্করের যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিয়া লইয়াছিলেন। দশাশ্বমেধে আগমনের অনতিকাল পরে সন্ন্যাসী মৌন হইলেন। দেবী যোগেশ্বরী পূর্ব্ব রাত্রিতে দর্শকগণকে বিদায় করার পর হইতে বাক্য ও কার্য্যত্যাগ করিয়াছেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর দেহ যেন কুঞ্চিত হইতে লাগিল। যোগেশ্বরী দেবী তখন

স্পন্দরহিত এবং তাঁহার দেহ যেন চেতনাশূন্য। সন্ন্যাসীর নাসারন্ধ্রদ্বয় স্ফীত হইল। তাঁহার দেহে তখন যে কোন প্রকার বিস্ময়জনক ক্রিয়া চলিতেছে, ইহা সন্নিহিত দর্শকেরা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ ক্রিয়া কিয়ৎকাল চলার পর সন্ন্যাসীর মেরুদণ্ড ও গ্রীবা সম্পূর্ণ ঋজু হইয়া উঠিল এবং তাঁহার বক্ষস্থল অতি দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। দেবী যোগেশ্বরী তখনও নিশ্চেষ্ট ও স্পন্দরহিত, এমন কি তাঁহার হৃৎযন্ত্র স্পন্দিত হইতেছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। সহসা তাঁহার সমস্ত শরীর—চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত তাবৎ অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। অতি অল্পক্ষণ পরে তাঁহার সেই পুণ্য-প্রদীপ্ত কলেবর সন্ন্যাসীর দেহে ঢলিয়া পড়িল; তাঁহার মস্তক সন্ন্যাসীর বক্ষের উপর আশ্রয় পাইল।

বেলা আড়াই প্রহর হইয়া আসিল। সহসা রাজা উমাশঙ্কর ব্যস্তভাবে বেদীর উপর উঠিয়া পড়িলেন এবং এই দেব দম্পতীকে স্পর্শ না করিয়া, তাঁহাদের অতি নিকটে বসিয়া রহিলেন। তদনন্তর তিনি অবিচলিত ভাবে সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দৃষ্টিসংযত করিয়া রাখিলেন। তখনই তিনি অত্যুচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জয় সচ্চিদানন্দ হরি!"

তখন দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া অগণ্য কণ্ঠে শব্দ উঠিল, "জয় সচ্চিদানন্দ হরি!"

সন্ন্যাসীর দেহ সম্মুখে একটু নত হইতেছে দেখিয়া, রাজা উমাশঙ্কর তৎক্ষণাৎ সতর্কতা ও দক্ষতার সহিত তাহা উভয় বাহুর দ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন এবং উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"ভাইসব, মহাপুরুষ এ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আর মা ঠাকুরাণীর তিরোধান কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে ঘটিয়াছে।"

সকল লোক অবাক্। রাজা উমাশঙ্কর এবং অন্যান্য কোন কোন লোক দেখিতে পাইয়াছিলেন, উৎক্রান্তির সময় মহাপুরুষের মস্তকের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটী জ্যোতির্ম্ময় শিখা ক্রমে ক্রমে নির্গত হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে সূর্য্যকিরণের সহিত মিশিয়াছিল। সেই শিখা নির্গম নিরুদ্ধ হইবামাত্র সন্ন্যাসীর দেহ সন্মুখে হেলিয়া পড়িতেছিল।

ডাক্তার সাহেব ও অন্যান্য অনেক চিকিৎসক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলিলেন,—"রাজা বাহাদুর বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম। স্বচক্ষে না দেখিলে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আপনি কৃপা করিয়া মহাত্মার দেহ আমাকে একবার স্পর্শ করিতে দিবেন কি ?

উমাশঙ্কর বলিলেন,—"কোন আপত্তি নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে এ দেহ স্পর্শ করিতে পারেন। আর যাঁহার যাঁহার ইচ্ছা সকলেই এক্ষণে মহাপুরুষকে স্পর্শ করিতে পারেন।"

প্রথমে ডাক্তার সাহেব অগ্রসর হইয়া বিবিধ প্রকারে ঘনানন্দের ও যোগেশ্বরী দেবীর পরিত্যক্ত দেহ পরীক্ষা করিলেন। শেষে সবিস্ময়ে বলিলেন,—“অতি আশ্চর্য্য ভাবে এ দুই দেহ প্রাণহীন হইয়াছে। বিজ্ঞান এ তথ্য অবধারণে অক্ষম। নিশ্চয়ই এ দেহদ্বয়ের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছে।

ডাক্তার সাহেব প্রস্থান করিলেন। যে রাজা ছাতা আনাইয়াছিলেন। উমাশঙ্করের ব্যবস্থা ক্রমে সন্ন্যাসীর একজন শিষ্য এক্ষণে তাহা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং সযত্নে সেই পবিত্র কলেবর যুগলের উপর তাহা ধারণ করিতে বলিলেন। তাহার পর রাজা উমাশঙ্কর সাবধানে সেই দুই শবকে সেই বেদীর উপর পাশাপাসী করিয়া শয়ন করাইলেন। অনবরত চারিদিক হইতে হরিধ্বনি হইতে লাগিল। অনেক লোক বেদীর নিকটস্থ হইয়া এই দেব-যুগলকে প্রণাম করিল এবং অনেকে উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া সেই বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজা উমাশঙ্কর, নীলরতন বাবু, হরকুমার বাহাদুর, সন্ন্যাসীর শিষ্যদ্বয় এবং আরও অনেক লোক এই দুই বিগত জীব কলেবর এক মনোহর শয্যা-চ্ছাদিত রজত পালঙ্কে স্থাপন করিলেন, এবং সেই পালঙ্ক বহন করিয়া এক নিভৃত স্থানস্থিত ভবনে লইয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা।

("যোগেশ্বরীর" অনুসরণ)

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩০৯ সাল।

PRINTED BY K. B. DE, AT THE HARASUNDARA PRESS.
98, HARRISON ROAD
AND
PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJI.
201, CORNWALIS STREET,
CALCUTTA.

অন্নপূর্ণা।

প্রথম খণ্ড—সংসার।